তামীম রায়হান

দীর্ঘ ৬২৪ বছর ধরে তিন মহাদেশজুড়ে বিস্তৃত উসমানি সাম্রাজ্যের
ইতিহাস ও সুলতানদের জীবনসংগ্রামের ধারাবাহিক ফিরিস্তি

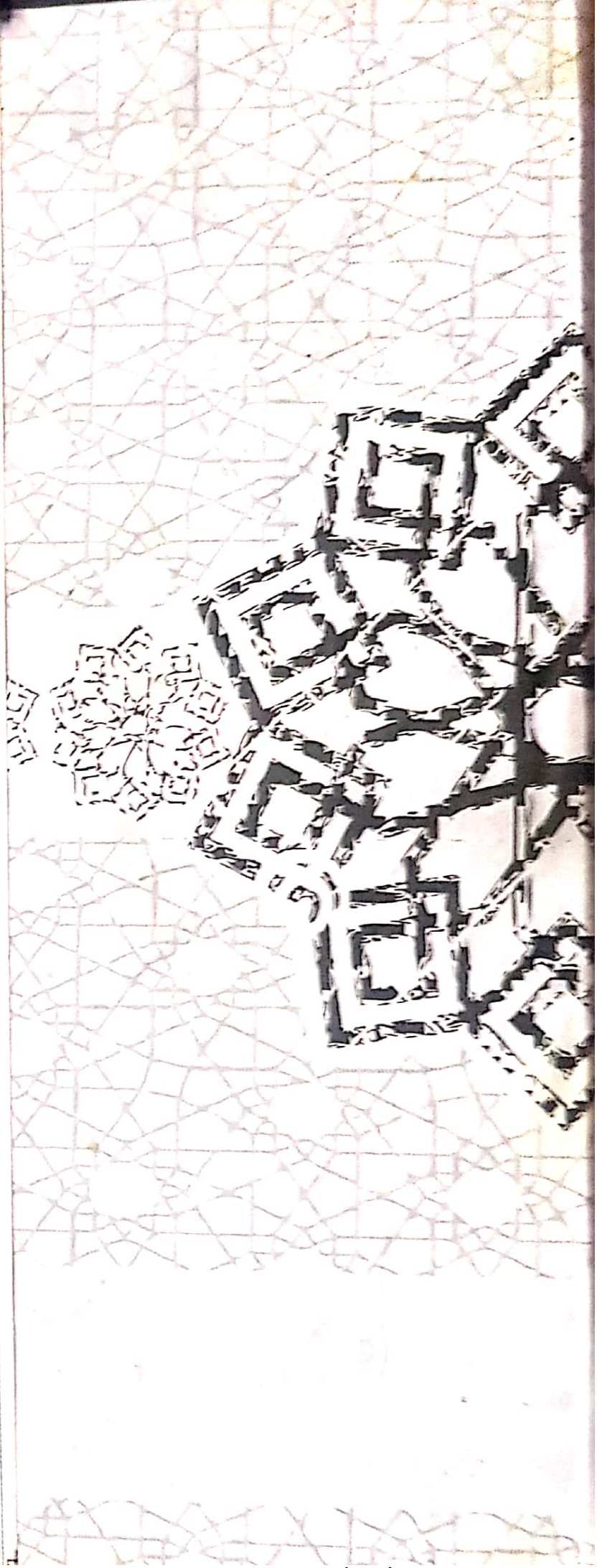
সুলতান কাহিনি



Scanned with CamScanner

বই পরিচিতি

বাংলাভাষায় উসমানি সাম্রাজ্য সম্পর্কে প্রকাশিত বইপত্রের সংখ্যা এখনও হাতেগোনা। মুসলিম বিশ্বের সর্বশেষ এই ধারাবাহিক শাসনব্যবস্থার শাসক ও এর রীতিনীতি সম্পর্কে তাই জানার সুযোগ একেবারেই সীমাবদ্ধ।
এই সীমাবদ্ধতা থেকেই বইটির জন্ম। উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতানদের সম্পর্কে এতে যেসব তথ্য ও ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে, এর বেশিরভাগ হয়তো আজো বাংলাভাষী পাঠকের অজানা। এছাড়া এই সাম্রাজ্যের পরিধি ও ব্যাপ্তি এবং সেকালের সামাজিক ও নাগরিক জীবনের বহুমুখী আলোচনা এতে স্থান পেয়েছে।
সুলতানদের ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বৈচিত্রময় নানা ঘটনা তুলে ধরার পাশাপাশি এই বইয়ে উসমানি সাম্রাজ্যের সুদীর্ঘ ইতিহাস থেকে চুম্বক অংশগুলো পাঠকের সামনে বর্ণনা করেছেন লেখক। ফলে একদিকে এটি যেমন ইতিহাসের তথ্যসম্বলিত বই হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ, অন্যদিকে এটি ঐতিহাসিক গল্প ও ঘটনার একটি সুখপাঠ্য সংকলনও।
উসামনি সাম্রাজ্য সম্পর্কে যারা কিছুই জানেন না কিংবা যারা কমবেশি কিছু জানেন, সবার কাছেই ভালো লাগবে বইটি, এটি কেবল প্রত্যাশা নয়, বিশ্বাসও।



Scanned with CamScanner

দীর্ঘ ৬২৪ বছর ধরে তিন মহাদেশজুড়ে বিস্তৃত উসমানি সাম্রাজ্যের তথ্য
ও সুলতানদের জীবনসংগ্রামের ধারাবাহিক ফিরিস্তি

সুলতান কাহিনি

তামীম রায়হান

নবপ্রকাশ
ইসলামী টাওয়ার, দোকান : ২০
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯ ৭৪ ৮৮ ৮৪ ৪১

Scanned with CamScanner

সুলতান কাহিনি

তামীম রায়হান

প্রকাশক : নবপ্রকাশ
প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০১৭
প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রচ্ছদ : সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

মূল্য: ৩৮০ (তিনশ আশি) টাকা মাত্র
Price: BDT 380.00 | US $ 12.00

SULTAN KAHINI
By Tamim Raihan

noboprokash.com | noboprokash@gmail.com | fb/noboprokash
E-store: rokomari.com/noboprokash
ISBN: 978-984-92655-5-9

Scanned with CamScanner

উৎসর্গ

আমার অনুজ

ডা. মোয়াজ আবরার (হামিম)

আমাদের পরিবার-সাম্রাজ্যের সুলতান আমার বাবা ডা. মো. গোলাম হোসাইন খান। সম্প্রতি এমবিবিএস উত্তীর্ণ হয়ে বাবার পেশাগত উত্তরাধিকারী হয়েছে মোয়াজ।

তাকে অভিনন্দন...

Scanned with CamScanner

তামীম রায়হানের অন্যান্য বইঃ

ইতিহাসের হাসি-কান্না
শাহজাদা
তবুও আমরা মুসলমান

Scanned with CamScanner

ভূমিকা

মুসলিম ইতিহাস তো বটেই, পৃথিবীর ইতিহাসে বংশানুক্রমিক শাসনব্যবস্থার সর্বশেষ এবং সবচে দীর্ঘ ধারাবাহিকটি ছিল উসমানি সাম্রাজ্য। দীর্ঘ ৬২৪ বছর ধরে তিন মহাদেশজুড়ে বিস্তৃত এই সাম্রাজ্যের বিলুপ্তির মধ্য দিয়ে শেষ হয় খেলাফতি শাসন বা মুসলিম সালতানাতের অধ্যায়।

উসমানিধারা সমাপ্তির পর এখনো ১০০ বছর পেরোয়নি, অথচ এ সম্পর্কে বাংলাভাষী পাঠকেরা খুব বেশি অবগত নন। কারণ, উসমানি সাম্রাজ্য ও এর সুলতানদের ইতিহাস সম্পর্কে লেখালেখি তুর্কি ভাষায় মোটামুটি হলেও ইংরেজি ও আরবিতে সেই তুলনায় অপ্রতুল। বরং এ দুই ভাষায় যা কিছু লেখালেখি হয়েছে এবং হচ্ছে, এগুলোর বেশির ভাগই একপেশে ও পক্ষপাতদুষ্ট।

আরব ও তুর্কি ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ যেমন কেবলই উসমানিদের প্রশংসা ও গুণগানে লিপ্ত, তেমনিভাবে ইংরেজদের বেশির ভাগ গবেষক উসমানিদের ত্রুটি অনুসন্ধানে ব্যস্ত। আর এ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় উসমানিদের সম্পর্কে হাতে গোনা যে কয়েকটি বইপত্র লেখা হয়েছে, এর অধিকাংশই ইউরোপীয়দের লেখা থেকে অনূদিত। ফলে উসমানিদের সামগ্রিক চিত্র এসব বই পড়ে পাঠকের সামনে ফুটে ওঠে, এমন দাবি পুরোপুরি সার্থক নয়।

ব্যস্ততার অবসরে ইতিহাস পড়তে আমার ভালো লাগে। খেলাফতে রাশেদা, উমাইয়া ও আব্বাসিদের সম্পর্কে কমবেশি পড়েছি। কিন্তু উসমানিদের সম্পর্কে জানার আগ্রহে যখন বইপত্রের পাতা উল্টিয়েছি, তখন কেবলই যুদ্ধবিগ্রহের সমরবর্ণনা দেখে আগ্রহ হারিয়েছি। গত এক বছরের বেশি সময় ধরে ইন্টারনেটে অনুসন্ধান এবং কাতারের বেশ কয়েকটি গ্রন্থাগারে খুঁজে বেশ কিছু বই সংগ্রহ করি, যেগুলো একটু ভিন্ন আঙ্গিকে উসমানি শাসনকাল সম্পর্কে রচিত।

Scanned with CamScanner

রাজ্য দখল ও যুদ্ধবিগ্রহের রক্তাক্ত ইতিহাস এড়িয়ে অন্যান্য বিষয়ে বেশ কিছু বই পড়ার সুযোগে উসমানি সুলতানদের জীবন ও কর্ম এবং তাঁদের বৈচিত্র্যময় চরিত্র সম্পর্কে অনেক তথ্য ও ঘটনা জানার সুযোগ হয়েছে আমার। উসমানি সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, ভৌগোলিক সীমানা-পরিধি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির ঘটনাবহুল ইতিহাস আমাকে বারবার মুগ্ধ করেছে। এসব থেকে তথ্য ও উপাত্ত নিয়ে আমি নিজের মতো করে এই বই লিখেছি এবং পাঠকের হাতে তুলে দিচ্ছি।

ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় উসমানি সাম্রাজ্য সম্পর্কে বইটি পড়ে পাঠক উসমানিদের সম্পর্কে একটি নির্মোহ চিত্র পাবেন বলে আমি আশা করি। বইটি পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য বন্ধু সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর ও আসাদউল্লাহ খান বারবার আমাকে পীড়াদায়ক তাড়া দিয়েছে। সুতরাং, বইটি প্রকাশের এ শুভক্ষণে এরা দুজন আমার আনন্দের ভাগীদার।

উসমানি সাম্রাজ্যের ঘটনাবহুল অতীত থেকে এর সদরে আজমদের নিয়ে আলাদা বই হতে পারে, এই সাম্রাজ্যের শাহজাদাদের নিয়ে আলাদা বই হতে পারে, এমনকি শুধু হারেমের নারীদের নিয়েও ভিন্ন গ্রন্থ লেখার সুযোগ রয়েছে।

আমার এই বই পড়ে কেউ যদি উসমানি সাম্রাজ্য সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং আরও বেশি গবেষণা ও লেখালেখিতে হাত দেন, তবেই আমার চেষ্টা কাজে লেগেছে বলে ভাববো। সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ।

তামীম রায়হান

দোহা, কাতার

tamimraihan@yahoo.com

মার্চ ২০১৭

Scanned with CamScanner

সূচিপত্র

উসমানি সুলতানদের নাম এবং তাঁদের শাসনকাল	১২
উসমানি সাম্রাজ্যের সূর্যোদয়	১৭
আরতুগরুল ও তাঁর সঙ্গীরা	১৯
সুলতান উসমান বিন আরতুগরুল	২১
সুলতান উরখান বিন উসমান	২৪
সুলতান প্রথম মুরাদ	২৬
বীর সুলতান প্রথম বায়েজিদ	২৯
চার ভাইয়ের দ্বন্দ্ব ও ষড়যন্ত্র অরক্ষিত উসমানি সাম্রাজ্য	৪০
কীর্তিমান সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ	৪৫
মহানায়ক সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহ	৫৪
সাধক সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদ	৬৫
দুঃখী শাহজাদার ফেরারি জীবন	৭০
বিজেতা সুলতান প্রথম সেলিম	৭৬
মহামতি সুলতান সুলায়মান	৮৩
দুর্বলচিত্তের তিন সুলতান	৯৬
নবিপ্রেমিক সুলতান প্রথম আহমদ	১০০
প্রতিবন্ধী সুলতান মুস্তফা	১০২
কীর্তিমান সুলতান চতুর্থ মুরাদ	১০৫
নারীলোভী সুলতান ইবরাহিম	১১২
উসমানি সাম্রাজ্যের লৌহমানবী	১১৭
শিকারী সুলতান চতুর্থ মুহাম্মদ	১২১
সুলতান দ্বিতীয় সুলায়মান	১২৩
বহুভাষী সুলতান দ্বিতীয় আহমদ	১২৫
পরাজিত সুলতান দ্বিতীয় মুস্তফা	১২৬
লিলিপ্রেমী সুলতান তৃতীয় আহমদ	১২৯
জনপ্রিয় সুলতান প্রথম মাহমুদ	১৩৪
ভিতু সুলতান তৃতীয় উসমান	১৩৫
সুলতান তৃতীয় মুস্তফা	১৩৭
সুলতান প্রথম আব্দুল হামিদ	১৩৮
সুলতান তৃতীয় সেলিম	১৪০
সুলতান চতুর্থ মুস্তফা	১৪৩
আধুনিক সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ	১৪৬
হৃদয়বান সুলতান প্রথম আব্দুল মজিদ	১৪৯

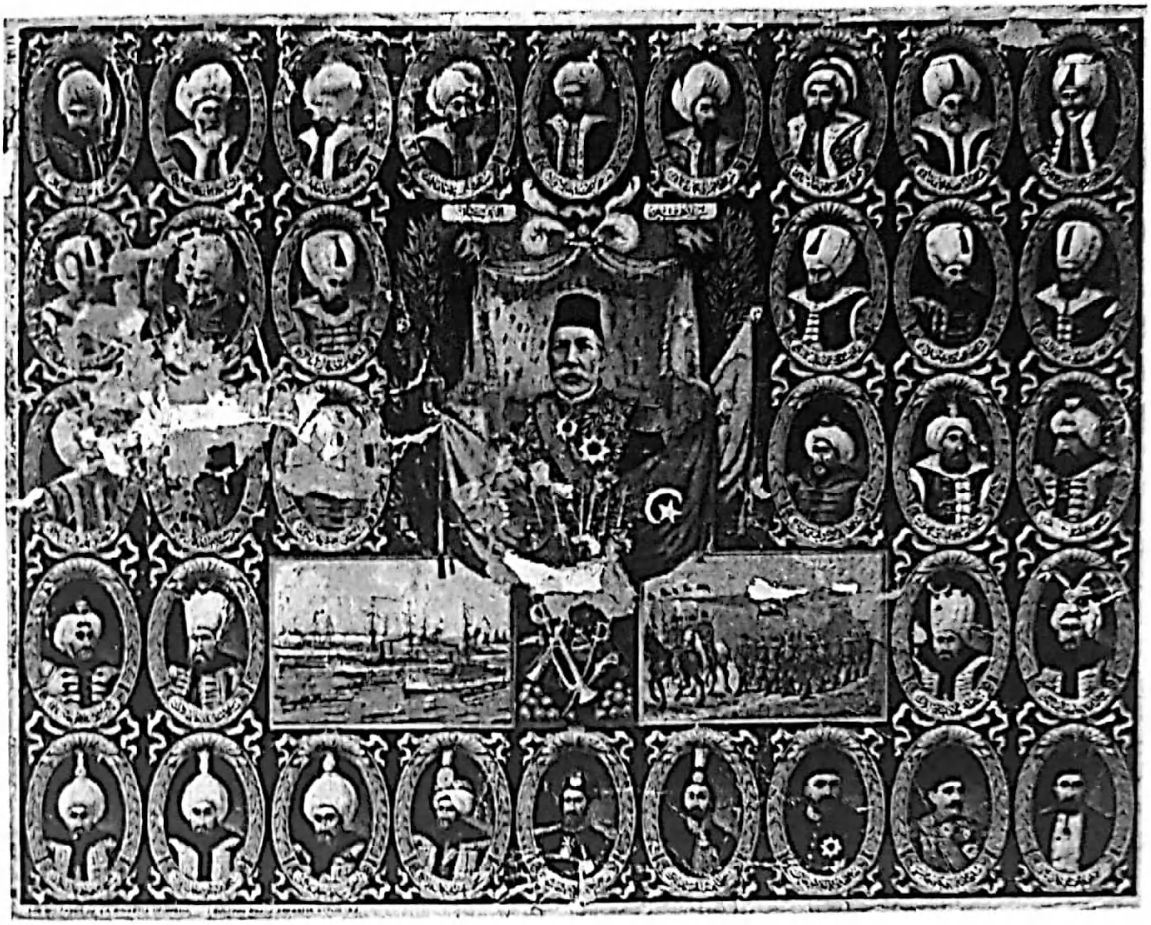
Scanned with CamScanner

সুলতান আব্দুল আজিজ	১৫৪
অসুস্থ সুলতান পঞ্চম মুরাদ	১৫৭
দুর্ভাগা সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ	১৫৮
সুলতান পঞ্চম মুহাম্মদ রাশাদ	১৬২
সুলতান ষষ্ঠ মুহাম্মদ ওয়াহিদুদ্দীন	১৬৪
সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল মজিদ	১৬৬
উসমানি সাম্রাজ্যের সূর্যাস্ত	১৬৮
উসমানি সাম্রাজ্য পতনের তিন খলনায়ক	১৭৭
মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক	১৭৮
আব্বাসি খেলাফতের সমাপ্তি ও উসমানি খেলাফতের সূচনা	১৮৭
উসমানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল	১৯০
একনজরে উসমানি সাম্রাজ্য	১৯২
উসমানি সাম্রাজ্যে ছদরে আজম	১৯৮
উসমানি সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনী	২০৫
উসমানি সুলতানদের স্বভাব-চরিত্র	২১২
উসমানি সুলতানদের বৈচিত্র্যময় অধ্যায়	২১৭
উসমানি সাম্রাজ্যে সামাজিক শিষ্টাচার	২২১
উসমানি সাম্রাজ্যে যা কিছু প্রথম	২২৬
উসমানি সুলতানদের মৃত্যু	২২৯
উসমানি সুলতানদের হজ	২৩৫
উসমানি সুলতানদের পারিবারিক হত্যাপ্রথা	২৩৮
উসমানি সুলতানদের মায়েরা	২৪১
উসমানি সাম্রাজ্যে জীবের প্রতি দয়া	২৪৪
উসমানি সাম্রাজ্যে নিষিদ্ধ কিছু বিষয়	২৪৫
উসমানি সুলতানদের বর্তমান প্রজন্ম	২৪৭
উসমানি সাম্রাজ্যে প্রথম বাইসাইকেল	২৫০
দামেস্ক থেকে মদিনা পর্যন্ত রেলপথ	২৫১
উসমানি সাম্রাজ্যে সংবাদপত্র প্রকাশনা	২৫৪
উসমানি সাম্রাজ্যে পরিবেশ সুরক্ষা	২৫৭
উসমানি সুলতানদের বিয়েশাদি	২৫৯
হারেম কাহিনি	২৬১
'ধরো আমি খেয়েছি মসজিদ'	২৬৬
উসমানি সাম্রাজ্যের ভালো-মন্দ	২৬৮
শেষ কথা	২৭৫
গ্রন্থপঞ্জি	২৭৭

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



উসমানি সুলতানদের নাম এবং তাঁদের শাসনকাল

৬২৪ বছরের সুদীর্ঘ সময়ে উসমানি সাম্রাজ্যের শাসনভার যাঁদের হাতে ন্যস্ত হয়েছিল, তাঁদের মোটামুটি তিন উপাধিতে ভাগ করা যেতে পারেঃ আমির, সুলতান ও খলিফা।

আমির হিসেবে উসমানি সাম্রাজ্য শাসন করেছেন তিনজন শাসক। তাঁরা হলেন আমির প্রথম উসমান (প্রতিষ্ঠাতা), আমির উরখান ও আমির প্রথম মুরাদ।

সুলতান হিসেবে উসমানি সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার হয়েছেন যথাক্রমে সুলতান প্রথম বায়েজিদ, সুলতান প্রথম মুহাম্মদ, সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ, সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহ, সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদ।

Scanned with CamScanner

খলিফা উপাধি ধারণ করে উসমানি সাম্রাজ্যের অধিপতি হিসেবে মুসলিম বিশ্ব শাসন করেছেন খলিফা প্রথম সেলিম থেকে শুরু করে সর্বশেষ খলিফা দ্বিতীয় আব্দুল মজিদ পর্যন্ত সব সুলতান।

উসমানি রাজ্যের শুরু থেকে সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত যেসব ব্যক্তি এর অধিপতি হিসেবে সমাসীন হয়েছেন, একনজরে তাঁদের নাম ও শাসনকাল তুলে ধরা হচ্ছে :

১. সুলতান প্রথম উসমান বিন আরতুগরুল (১২৯৯-১৩২৬ সাল, ৬৯৮-৭২৬ হিজরি)। ১২৯৯ সালের ২৭ জুলাই তিনি সেলজুকি শাসন থেকে তাঁর অধীন রাজ্যের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ছিলেন উসমানি সাম্রাজ্যের জনক ও প্রতিষ্ঠাতা সুলতান।

২. সুলতান উরখান বিন উসমান (১৩২৬-১৩৬২ সাল, ৭২৬-৭৬৩ হিজরি)। উসমানি সেনাবাহিনীর গোড়াপত্তন হয় তাঁর হাতে। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সুলতান হিসেবে পিতার রেখে যাওয়া নতুন সাম্রাজ্যের বিস্তার ও প্রশাসনিক বিন্যাসে ব্যস্ত ছিলেন।

৩. সুলতান প্রথম মুরাদ বিন উরখান বিন উসমান (১৩৬২-১৩৮৯ সাল, ৭৬৩-৭৯১ হিজরি)।

৪. সুলতান প্রথম বায়েজিদ রিন মুরাদ বিন উরখান (১৩৮৯-১৪০৩ সাল, ৭৯১-৮০৪ হিজরি)।

৫. সুলতান প্রথম মুহাম্মদ বিন বায়েজিদ বিন মুরাদ বিন উরখান (১৪০৩/১৪১৩-১৪২১ সাল, ৮০৪/৮১৬-৮২৪ হিজরি)।

৬. সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ বিন মুহাম্মদ বিন বায়েজিদ বিন মুরাদ (১৪২১-১৪৪৪ সাল, ৮২৪-৮৪৮ হিজরি)। স্বেচ্ছায় পুত্রের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছিলেন সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ। পরে সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে সেনাবাহিনীর বিদ্রোহ দমনে তিনি দ্বিতীয় মেয়াদে আবারও ক্ষমতার হাল ধরেন ১৪৪৬ থেকে ১৪৫১ সাল পর্যন্ত।

৭. সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ (আলফাতেহ) মুরাদ বিন মুহাম্মদ রিন বায়েজিদ। পিতার আদেশে তিনি প্রথমবার ক্ষমতায় বসেন ১৪৪৪ থেকে ১৪৪৮ সাল পর্যন্ত। পরে দ্বিতীয়বার তাঁর পিতা আবারও তাঁর হাতে ক্ষমতার ভার হস্তান্তর করলে তিনি সুলতান হিসেবে অধিষ্ঠিত হন ১৪৫১ থেকে ১৪৮১ সাল পর্যন্ত। উসমানি সাম্রাজ্যের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি আলোচিত সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহ ১৪৫৩ সালে

Scanned with CamScanner

বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল শহর জয় করেন। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয় মুসলমানদের হাতে।

৮. সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদ বিন মুহাম্মদ আলফাতেহ বিন মুরাদ (১৪৮১-১৫১২ সাল, ৮৮৬-৯১৮ হিজরি)।

৯. সুলতান প্রথম সেলিম বিন বায়েজিদ বিন মুহাম্মদ আলফাতেহ (১৫১২-১৫২০ সাল, ৯১৮-৯২৬ হিজরি)। উসমানি সুলতানদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম খলিফা উপাধি ধারণ করেন। ৯২৩ হিজরি তথা ১৫১৭ সালে মিসরের তৎকালীন আব্বাসি খলিফা তাঁর হাতে খেলাফতের দায়িত্বভার হস্তান্তর করেন।

১০. সুলতান প্রথম সুলায়মান (আলকানুনি) বিন প্রথম সেলিম বিন বায়েজিদ (১৫২০-১৫৬৬ সাল, ৯২৬-৯৭৪ হিজরি)। তাঁর শাসনামলে উসমানি সাম্রাজ্য শৌর্যবীর্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তিতে যে অবস্থানে পৌঁছেছিল, তা অন্য কোনো সুলতানের শাসনামলে ঘটেনি।

১১. সুলতান দ্বিতীয় সেলিম বিন সুলায়মান (আলকানুনি) বিন প্রথম সেলিম (১৫৬৬-১৫৭৪ সাল, ৯৭৪-৯৮২ হিজরি)। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব ও পরিচালনায় তাঁর প্রবল অনীহা ও অনাগ্রহ ছিল। এখান থেকে শুরু হয় উসমানি সাম্রাজ্যের স্থবিরতার প্রাথমিক পর্ব।

১২. সুলতান তৃতীয় মুরাদ বিন দ্বিতীয় সেলিম বিন সুলায়মান (আলকানুনি) (১৫৭৪-১৫৯৫ সাল, ৯৮২-১০০৩ হিজরি)।

১৩. সুলতান তৃতীয় মুহাম্মদ বিন তৃতীয় মুরাদ বিন দ্বিতীয় সেলিম (১৫৯৫-১৬০৩ সাল, ১০০৩-১০১২ হিজরি)। পিতা ও দাদার ঐতিহ্য ভেঙে তিনি আবারও যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া শুরু করেন।

১৪. সুলতান প্রথম আহমদ বিন তৃতীয় মুহাম্মদ বিন তৃতীয় মুরাদ (১৬০৩-১৬১৭ সাল, ১০১২-১০২৬ হিজরি)।

১৫. সুলতান প্রথম মুস্তফা বিন তৃতীয় মুহাম্মদ বিন তৃতীয় মুরাদ (১৬১৭-১৬১৮ সাল, প্রথমবার এবং ১৬২২-১৬২৩ সাল, দ্বিতীয়বার)। মস্তিষ্কে সমস্যার কারণে প্রথমবার তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এবং তাঁর ভাতিজাকে বসানো হয়। কিন্তু সেনাবাহিনীর হাতে তাঁর ভাতিজা নিহত হওয়ার পর আবারও তাঁকে ক্ষমতায় বসানো হয় এবং এবারও মস্তিষ্ক বিকৃতির অভিযোগে তাঁকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে বন্দী করে রাখা হয়।

Scanned with CamScanner

১৬. সুলতান দ্বিতীয় উসমান বিন প্রথম আহমদ বিন তৃতীয় মুহাম্মদ (১৬১৮-১৬২২ সাল, ১০২৭-১০৩১ হিজরি)। উসমানি সেনাবাহিনীর হাতে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন এবং এর এক দিন পর তাঁকে হত্যা করা হয়।

১৭. সুলতান চতুর্থ মুরাদ বিন প্রথম আহমদ বিন তৃতীয় মুহাম্মদ (১৬২৩-১৬৪০ সাল, ১০৩২-১০৪৯ হিজরি)। সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা কঠিনভাবে দমন করেন এবং বেশ কিছু রাজ্য শত্রুর হাত থেকে পুনরুদ্ধার করেন।

১৮. সুলতান ইবরাহিম বিন প্রথম আহমদ বিন তৃতীয় মুহাম্মদ (১৬৪০-১৬৪৮ সাল, ১০৪৯-১০৫৮ হিজরি)। তৎকালীন শায়খুল ইসলামের নেতৃত্বে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। এরপর ছদরে আজমের হুকুমে তাঁকে হত্যা করা হয়।

১৯. সুলতান চতুর্থ মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম বিন প্রথম আহমদ (১৬৪৮-১৬৮৭ সাল, ১০৫৮-১০৯৯ হিজরি)। যুদ্ধে উসমানিদের পরাজয়ের পর তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়।

২০. সুলতান দ্বিতীয় সুলায়মান বিন ইবরাহিম বিন প্রথম আহমদ (১৬৮৭-১৬৯১ সাল, ১০৯৯-১১০২ হিজরি)।

২১. সুলতান দ্বিতীয় আহমদ বিন ইবরাহিম বিন প্রথম আহমদ (১৬৯১-১৬৯৫ সাল, ১১০২-১১০৬ হিজরি)।

২২. সুলতান দ্বিতীয় মুস্তফা বিন চতুর্থ মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম (১৬৯৫-১৭০৩ সাল, ১১০৬-১১১৫ হিজরি)। সেনাবাহিনীর হাতে ক্ষমতাচ্যুত হন তিনি।

২৩. সুলতান তৃতীয় আহমদ বিন চতুর্থ মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম (১৭০৩-১৭৩০ সাল, ১১১৫-১১৪৩ হিজরি)।

২৪. সুলতান প্রথম মাহমুদ বিন দ্বিতীয় মুস্তফা বিন চতুর্থ মুহাম্মদ (১৭৩০-১৭৫৪ সাল, ১১৪৩-১১৬৮ হিজরি)।

২৫. সুলতান তৃতীয় উসমান বিন তৃতীয় আহমদ বিন চতুর্থ মুহাম্মদ (১৭৫৪-১৭৫৭ সাল, ১১৬৮-১১৭১ হিজরি)।

২৬. সুলতান তৃতীয় মুস্তফা বিন তৃতীয় আহমদ বিন চতুর্থ মুহাম্মদ (১৭৫৭-১৭৭৪ সাল, ১১৭১-১১৮৭ হিজরি)।

২৭. সুলতান প্রথম আব্দুল হামিদ বিন তৃতীয় আহমদ বিন চতুর্থ মুহাম্মদ (১৭৭৪-১৭৮৯ সাল, ১১৮৭-১২০৩ হিজরি)।

Scanned with CamScanner

২৮. সুলতান তৃতীয় সেলিম বিন তৃতীয় মুস্তফা বিন আহমদ (১৭৮৯-১৮০৭ সাল, ১২০৩-১২২২ হিজরি)। সেনাবাহিনীর হাতে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার এক বছর পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

২৯. সুলতান চতুর্থ মুস্তফা বিন প্রথম আব্দুল হামিদ (১৮০৭-১৮০৮ সাল, ১২২২-১২২৩ হিজরি)। সেনাবাহিনীর হাতে ক্ষমতাচ্যুত হন তিনি।

৩০. সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ বিন প্রথম আব্দুল হামিদ (১৮০৮-১৮৩৯ সাল, ১২২৩-১২৫৫ হিজরি)। কঠিন হাতে তিনি সেনাবাহিনীর বিশৃঙ্খলা দমন করেন।

৩১. সুলতান প্রথম আব্দুল মজিদ বিন দ্বিতীয় মাহমুদ (১৮৩৯-১৮৬১ সাল, ১২৫৫-১২৭৭ হিজরি)।

৩২. সুলতান আব্দুল আজিজ বিন দ্বিতীয় মাহমুদ (১৮৬১-১৮৭৬ সাল, ১২৭৭-১২৯৩ হিজরি)।

৩৩. সুলতান পঞ্চম মুরাদ বিন প্রথম আব্দুল মজিদ (মে ১৮৭৬-আগস্ট ১৮৭৬ সাল, জমাদিউল আউয়াল ১২৯৩-শাবান ১২৯৩ হিজরি)। মস্তিষ্ক বিকৃতির অভিযোগে তাঁকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

৩৪. সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ বিন প্রথম আব্দুল মজিদ (১৮৭৬-১৯০৯ সাল, ১২৯৩-১৩২৭ হিজরি)। সাম্রাজ্যে সংবিধান প্রবর্তন করেন এবং সুলতানি শাসন রক্ষায় সর্বশেষ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। ১৯০৯ সালে এক বিপ্লবে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় তাঁকে।

৩৫. সুলতান পঞ্চম মুহাম্মদ রাশাদ বিন প্রথম আব্দুল মজিদ (১৯০৯-১৯১৮ সাল, ১৩২৭-১৩৩৬ হিজরি)। প্রতীকী অর্থে তিনি ক্ষমতায় ছিলেন। তবে তাঁর রাষ্ট্রীয় কোনো কার্যক্ষমতা ছিল না।

৩৬. সুলতান ষষ্ঠ মুহাম্মদ ওয়াহিদউদ্দিন বিন প্রথম আব্দুল মজিদ (১৯১৮-১৯২২ সাল, ১৩৩৬-১৩৪১ হিজরি)। উসমানি সাম্রাজ্যের পতনের সাক্ষী তিনি।

৩৭. সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল মজিদ বিন আব্দুল আজিজ (১৯২২-১৯২৪ সাল, ১৩৪১-১৩৪২ হিজরি)। তুরস্কের সংসদ তাঁকে ধর্মীয় পদবি হিসেবে খলিফা উপাধি দেয়। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে কোনো রাষ্ট্রীয় বা ধর্মীয় প্রভাব তাঁর ছিল না। পরে আনুষ্ঠানিকভাবে খেলাফত বিলুপ্ত ঘোষণা করে তাঁকে নির্বাসনে পাঠানো হয়। ২০ বছর নির্বাসিত থাকার পর প্যারিসে তাঁর মৃত্যু হয়।

Scanned with CamScanner



উসমানি সাম্রাজ্যের সূর্যোদয়

মরুচারী তুর্কি ঘোড়সওয়ার

১২০০ সাল। আশ্রয় ও জীবিকার তাগিদে দেশ-দেশান্তরে ছুটে বেড়ায় একদল ঘোড়সওয়ার। এরা সবাই 'কাবি' অথবা 'কাতি' গোত্রের ভাই-বেরাদর। বহুকাল ধরে কাবি গোত্রের লোকেরা পূর্ব থেকে পশ্চিমে দেশান্তরী হতো। কখনো কখনো তারা পশ্চিম এশিয়ার সমতলভূমি থেকে এশিয়া মাইনর বা ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে ঘুরে বেড়াত। সঙ্গে থাকত কিছু অস্ত্রশস্ত্র এবং তাঁবু ও খাবারদাবার। এদের আসল ও মূল বংশ 'ওগোজ', যা তুর্কিদের অতি প্রাচীন বংশতালিকার অন্যতম একটি অংশ।

সেলজুকি শাসনামলে ইরানের মাহান অঞ্চলে ছিল তাদের আদি আবাস। সেখানকার শাসনকর্তা ছিলেন সুলায়মান শাহ। একসময় এই শান্ত নগরীতে মঙ্গোলদের উৎপাত শুরু হলো। লেগে গেল যুদ্ধবিগ্রহ। যোগ হলো অভাব ও

Scanned with CamScanner

দুর্ভিক্ষ। এসব দেখে জীবন বাঁচাতে নিজেদের মাতৃভূমি ছেড়ে অজানার উদ্দেশে পা বাড়ায় ঘোড়সওয়ারদের এই দল।

আর্মেনীয় রাজ্যের একটি মরুভূমি সাময়িক আবাসস্থল হয় তাদের। কিন্তু এখানে এসেও শান্তি মেলে না তাদের। যুদ্ধ লেগে আছে কারামানের সেলজুকি সুলতান আলাউদ্দিন ও তাঁর শত্রুদের মধ্যে। এই অঞ্চলে থাকতে হলে কোনো একটি পক্ষকে বেছে নিতে হবে তাদের।

ঘোড়সওয়ার দলের নেতা কুন্দুজ আব বিরদমান দুই পক্ষের পরিচয় জেনে শেষে সুলতান আলাউদ্দিনের পক্ষ বেছে নিলেন। আশপাশে কোথাও যুদ্ধ হলে তিনি সুলতানকে দলবল নিয়ে সাহায্য করেন। যুদ্ধ শেষে কিছু বিনিময় নিয়ে ফিরে আসেন। (বেশ কিছু ঐতিহাসিক গ্রন্থে এই কুন্দুজ আবকে সুলায়মান শাহ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আমার কাছে তা নির্ভরযোগ্য মনে হয়নি।)

একে একে এভাবে কেটে গেল সাতটি বছর। যুদ্ধবিগ্রহের এই জীবন আর ভালো লাগে না কুন্দুজ আব ও তাঁর সঙ্গীদের। কিছুকাল পর ১২০৭ সালে দলবল নিয়ে কুন্দুজ আব রওনা হলেন আরও সামনের দিকে। অনিশ্চিত জীবন ছেড়ে একটু শান্তি ও সমৃদ্ধির স্বপ্নে তাঁদের গন্তব্যস্থল আখলাত পেরিয়ে মারদিন বা আরও দূরে।

যাত্রাপথে পড়ল ফোরাত নদী। আরও সামনে যেতে হলে নদী পার হয়ে যেতে হবে ওপারে। সঙ্গীদের নিয়ে কুন্দুজ নদীতে নেমে পড়লেন। মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ানো এই দলনেতার কাছে ফোরাতের রূপ অচেনা ছিল। ফলে পার হতে গিয়ে যায়দিন শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে ২৫০ কিলোমিটার দূরে জাবের দুর্গের কাছে এক জায়গায় পানিতে ডুবে মারা গেলেন তিনি।

কুন্দুজ আবের সঙ্গে থাকা তাঁর চার পুত্র পিতার মৃত্যুতে অসহায় হয়ে পড়েন। দলের সঙ্গীরাও নেতার মৃত্যুতে শোকাহত। এমন বিপদে কুন্দুজ আবের পুত্ররা নিজেদের মতো করে সিদ্ধান্ত নিলেন। সেঙ্কুরতেগিন ও কোনতোগদি কিছু সঙ্গীসহ রওনা হলেন পূর্ব দিকে, নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে। বাকি দুই পুত্র আরতুগরুল ও দোন্দার ফিরে এলেন আগের মরুভূমিতে, সেই চেনা জায়গায়।

কুন্দুজ আবকে সমাহিত করা হলো ফোরাত নদীর কাছে, আজও যা তুর্কিদের কাছে মাজার হিসেবে পরিচিত।

Scanned with CamScanner

আরতুগরুল ও তাঁর সঙ্গীরা

পিতার মৃত্যুতে ফোরাত নদী পার হতে পারেননি আরতুগরুল ও তাঁর সঙ্গীরা। বরং পারস্যের পথে সবাইকে নিয়ে ফিরছেন বিষণ্ন আরতুগরুল। পথে এক পাহাড়ের পাদদেশে যাত্রাবিরতি করা হলো।

পরদিন সকালে পাহাড় থেকে খানিক দূরে সমতল থেকে যুদ্ধের আওয়াজ শুনতে পেলেন আরতুগরুল। সঙ্গীদের নিরাপদ দূরত্বে রেখে তিনি দেখতে পেলেন, অদূরে যুদ্ধ চলছে দুটি সশস্ত্র গোষ্ঠীর মধ্যে। সকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলল যুদ্ধ।

আরতুগরুলের সঙ্গে তখন কয়েক শ ঘোড়সওয়ারের দল। কিছু অস্ত্রশস্ত্রও আছে তাঁদের সঙ্গে। রাত পেরিয়ে ভোর হলো। সকাল থেকে আবারও যুদ্ধ শুরু হলো। নিরাপদ দূরত্বে থেকে যুদ্ধের দৃশ্য দেখছেন আরতুগরুল। কোনটি কার পক্ষে বা কেন এই যুদ্ধ, বিস্তারিত কিছু জানা নেই তাঁর।

ধীরে ধীরে তলোয়ারের ঝনঝন শব্দ এবং ঘোড়ার অস্থির চিৎকারে পরিবেশ ভয়ংকর হয়ে উঠছে। ধূলিঝড়ে সবকিছু অস্পষ্ট। আরতুগরুল দেখতে পেলেন, যুদ্ধে ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে একটি পক্ষ। অন্য পক্ষ তখন প্রবল উত্তেজনায় হামলে পড়ছে। আরতুগরুল সিদ্ধান্ত নিলেন, নীরব বসে না থেকে দুর্বল দলটিকে সাহায্য করা দরকার।

প্রয়োজনীয় অস্ত্র এবং ঘোড়সওয়ার সঙ্গীদের নিয়ে যুদ্ধের মাঠে দুর্বল দলটির পক্ষে যোগ দিলেন আরতুগরুল। জয়ের কাছাকাছি চলে যাওয়া বাহিনীকে তিনি এবং তাঁর দল পরাজয়ের ঘোরে ফেলে দিলেন। মুহূর্তে উদ্দীপনা ফিরে পেল দুর্বল পক্ষের সৈন্যরা। তারা পূর্ণোদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুপক্ষের ওপর। কিছুক্ষণের মধ্যে পাল্টে গেল যুদ্ধের হিসাব-নিকাশ। পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে থাকা সৈন্যদের আক্রমণে রণাঙ্গন ছেড়ে পালাতে বাধ্য হলো অন্য দলটি।

যুদ্ধ শেষে আরতুগরুল জানতে পারলেন, যে বাহিনীর পক্ষে লড়াই করে তিনি জয় ছিনিয়ে এনেছেন, সেটি সেলজুকি সুলতান আলাউদ্দিনের সেনাদল।

Scanned with CamScanner

সুলতান আলাউদ্দিন সেলজুকি সুলতান মালিক শাহের মৃত্যুর পর নিজের প্রদেশ ও অঞ্চলের সীমানা প্রসারে অভিযান চালাচ্ছিলেন। এই যুদ্ধ ছিল সেটিরই অংশ। কিছু ঐতিহাসিক দাবি করেন, এই যুদ্ধে অন্য পক্ষটি ছিল বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের একটি সেনাদল।

বলে রাখা ভালো, ১০৯২ সালের ১৮ নভেম্বর সেলজুকি সুলতানের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মূলত সেলজুকি সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। এ সময়ে বিভিন্ন প্রদেশের আমিররা নিজ নিজ অঞ্চলে নিজেদের সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন। আনাতোলিয়ায় গড়ে ওঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ১০টি অঞ্চল। পরবর্তী সময়ে এসব অঞ্চল উসমানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

যুদ্ধে নিশ্চিত পরাজয় থেকে রক্ষা করায় সুলতান আলাউদ্দিন আরতুগরুল ও তাঁর দলকে পুরস্কৃত করলেন। তিনি ওই অঞ্চলে বসতভূমি হিসেবে কিছু জায়গাজমি লিখে দিয়ে মন জয় করলেন তাঁদের। সঙ্গে কিছু অর্থকড়ি উপহার হিসেবে দিলেন। এর বিনিময়ে ভবিষ্যতে অন্যান্য অভিযানগুলোতে তাঁর দলের সহায়তার প্রতিশ্রুতি চাইলেন আলাউদ্দিন।

সুলতানের এমন অভ্যর্থনা ও সম্মানে আরতুগরুল প্রীত হলেন। সঙ্গীদের নিয়ে তিনি সেখানে থেকে যেতে মনস্থির করলেন। এক নতুন জীবন শুরু করলেন আরতুগরুল ও তাঁর সঙ্গীরা।

দিনে দিনে সুলতান আলাউদ্দিনের কাছে কদর বাড়তে থাকল আরতুগরুল ও তাঁর দলটির। কোথাও যুদ্ধ ও অভিযানের খবর এলে সুলতান ডেকে পাঠান তাঁদের। প্রতিটি জয়ের পর আরও বেশি ভূসম্পত্তি দিয়ে পুরস্কৃত করেন এই তুর্কি ঘোড়সওয়ারদের।

১২৮৮ সালে ৯০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন আরতুগরুল। সোগোত অঞ্চলে তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তিন পুত্র রেখে যান আরতুগরুল। তাঁরা হলেন উসমান, সাওজি ও কুন্দুজ।

Scanned with CamScanner

সুলতান উসমান বিন আরতুগরুল

সুলতান আলাউদ্দিনের নির্দেশে আরতুগরুলের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র উসমানকে পিতার স্থলাভিষিক্ত ঘোষণা করা হয়। কারণ, অন্য ভাইদের চেয়ে উসমান ছিলেন যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী এবং মেধা ও প্রজ্ঞায় প্রতিভাবান। নিজেকে তিনি পিতার যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে বারবার প্রমাণিত করেছেন।

উসমান যখন তাঁর পিতার উত্তরাধিকারী হিসেবে ভূসম্পত্তির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তখন এই পরিবারের আয়ত্তে ছিল ৪ হাজার ৮০০ বর্গকিলোমিটার অঞ্চল।

পিতার মতো পুত্র উসমানও সুলতান আলাউদ্দিনকে বিভিন্ন যুদ্ধে সাহায্য করতে লাগলেন। নতুন নতুন দুর্গ ও অঞ্চল সুলতান আলাউদ্দিনের করায়ত্ত হলে পুরস্কার ও প্রতিদানে সমৃদ্ধ হতে থাকে উসমানের সম্পত্তি। পিতা আরতুগরুলের রেখে যাওয়া জায়গা-জমি তখন ধীরে ধীরে বিস্তৃত হচ্ছে আশপাশের অঞ্চলে।

১২৮৯ সনে কোনিয়ার পার্শ্ববর্তী আক্ষিসুন অঞ্চল জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন উসমান ও তাঁর যুদ্ধবাজ সঙ্গীরা। এতে খুশি হয়ে সুলতান আলাউদ্দিন উসমানকে 'বেগ' উপাধিতে সম্মানিত করেন। একই সঙ্গে বেশ কিছু নতুন অঞ্চল তাঁকে দান করেন।

পাশাপাশি এসব অঞ্চলে উসমানের নামে মুদ্রা প্রচলন এবং জুমার খুতবায় উসমানের নাম উচ্চারণের অনুমতিও দেন সুলতান আলাউদ্দিন। পিতা আরতুগরুলের রেখে যাওয়া সহায়-সম্পত্তি তত দিনে উসমানের দক্ষ নেতৃত্বে অনেক গুণ বেড়েছে, আগের চেয়েও অনেক দূর বিস্তৃত হয়েছে তাঁদের ভূমি ও সীমানা।

১৩০০ সাল। উসমানি সাম্রাজ্যের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। তাতারদের আক্রমণে তখন লণ্ডভণ্ড এশিয়া অঞ্চল। দুর্বার গতিতে এগোতে থাকা তাতারদের অভিযানে নিহত হন সুলতান আলাউদ্দিন। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, সুলতান আলাউদ্দিন নিহত হয়েছেন তাঁর পুত্র গিয়াসউদ্দিনের হাতে।

Scanned with CamScanner

সুলতান আলাউদ্দিনের মৃত্যুতে একদিকে যেমন সেলজুক সাম্রাজ্যের অধ্যায় শেষ হলো, অন্যদিকে এই সুযোগ দারুণভাবে কাজে লাগালেন বুদ্ধিমান উসমান বেগ। নিজের আয়ত্তাধীন অঞ্চলে তিনি নিজেকে 'বাদশাহ' (সুলতান) ঘোষণা করলেন। শাসনকাজ পরিচালনায় ইরেনিশেহরকে রাজধানী হিসেবে নির্বাচন করেন তিনি। এরপর এখান থেকে রাজ্যের পরিধি আরও ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা শুরু করলেন সঙ্গীদের সঙ্গে।

ধীরে ধীরে আশপাশের এজমিদ ও এজনিকসহ অন্যান্য অঞ্চল নিজের দখলে নিতে সশস্ত্র অভিযান শুরু করেন সুলতান উসমান বেগ। এ সময় তাঁর বাহিনী এবং দখলকৃত অঞ্চলের পরিচয় বোঝাতে তিনি একটি পতাকা তৈরি করেন, যা পরে তুরস্কের পতাকা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

উসমান বেগ কি জানতেন, যে রাজ্যজয়ের সূচনা তিনি করে গেলেন, তা কালে কালে রূপ নেবে তাঁরই নামে গঠিত এক মহা সাম্রাজ্যে। তিন মহাদেশজুড়ে যা স্থায়ী হবে সুদীর্ঘ ৬২৪ বছর! রচিত হবে এক নতুন ইতিহাস, জয়-পরাজয় ও উত্থান-পতনের এক বিস্ময়কর আখ্যান!

সুলতান উসমান এ সময় এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে শাসকদের কাছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রস্তাব পাঠান। তিনি জানিয়ে দেন, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করলে জিজিয়া (কর) আদায় করে তাঁর অধীনে থাকতে হবে। তুর্কির এই অচেনা শাসকের এমন প্রস্তাবে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে। উসমান বেগকে ঠেকাতে মঙ্গোলদের সাহায্য চেয়ে সামরিক প্রস্তুতি শুরু হয় সেসব অঞ্চলে।

সুলতান উসমান ও তাঁর সঙ্গীদের দুর্দান্ত সাহস এবং দুরন্ত কৌশলে পৃথিবীর ইতিহাসে যাত্রা শুরু করল এক নতুন সাম্রাজ্য। এর নামকরণ করা হলো সালতানাতে উসমানি বা উসমানি সাম্রাজ্য। তত দিনে উসমান বেগের সেনাবাহিনী এবং সঙ্গীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছড়িয়ে পড়তে থাকে এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে।

দিনে দিনে বয়সের ভারে দুর্বল হয়ে পড়েন সুলতান উসমান বেগ। এ সময় তিনি তাঁর পুত্র উরখান খানকে নিজের উত্তরাধিকারী হিসেবে ঘোষণা করেন।

উসমান বেগ যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন ৩০ বছর বয়সী তরুণ উরখান খান পিতার নির্দেশে সেনাদল নিয়ে বিভিন্ন শহর জয় করে বোর্সা শহর অভিমুখে অভিযানে ব্যস্ত। এর আগে ১৩২৪ সাল থেকে পুত্র উরখান খানকে নতুন রাজ্য পরিচালনার বিভিন্ন কাজে নিয়োগ দেন উসমান বেগ।

Scanned with CamScanner

বোর্সা শহর জয়ের লক্ষ্যে উরখান খান যখন ব্যস্ত সময় পার করছেন, তখন খবর আসে, পিতা সুলতান উসমান বেগ ডেকে পাঠিয়েছেন তাঁকে। পিতার ডাকে সৈন্যদের রেখে ছুটে যান উরখান।

উসমান বেগ তখন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। পিতার এই অসহায়ত্ব দেখে কেঁদে ওঠেন উরখান। মৃত্যুপথযাত্রী পিতার শিয়রে বসে তিনি বললেন, 'হে মহান পিতা! আপনার হাতে কত বীর বাহাদুর পরাস্ত হয়েছে–দূর-দূরান্তের কত অঞ্চল আপনি জয় করেছেন, অথচ আজ এই কী অবস্থা আপনার!!'

পুত্রের মাথায় কাঁপা কাঁপা হাত রাখেন উসমান বেগ। প্রশস্ত হাসির আভা ছড়িয়ে প্রশান্ত নয়নে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অস্থির হওয়ার কিছু নেই, আগে ও পেছনের সবাইকে যেতে হয় এ পথে। আমার পর তুমি এই নতুন রাজ্যের হাল ধরবে, এই খুশি বুকে নিয়ে আমি যাত্রা করছি ওপারে...' কথা শেষ করতে পারলেন না তিনি। নীরব, নিথর হয়ে পড়ে থাকল তাঁর দেহ। ৭২৬ হিজরির ২১ রমজান সেদিন।

মৃত্যুকালে উসমান বেগের বয়স হয়েছিল ৬৭-৭০ বছর। জীবনের শেষ ২৭ বছর তিনি দক্ষ হাতে শাসন করছেন তাঁর নতুন রাজ্য। পিতার কাছ থেকে ৪ হাজার ৮০০ বর্গকিলোমিটারের যে অঞ্চল পেয়েছিলেন তিনি, নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতায় এর আয়তন ছড়িয়ে দিয়েছেন ১৬ হাজার বর্গকিলোমিটার পর্যন্ত।

বোর্সা শহরে এক দুর্গের পাশে যথাযথ সম্মানে পিতাকে দাফন করেন উসমানি সাম্রাজ্যের নতুন কর্ণধার সুলতান উরখান। কেউ কেউ লিখেছেন, উসমান বেগের অসিয়ত অনুযায়ী তাঁর লাশ প্রথমে দাফন করা হয় সোগোত শহরে। আড়াই বছর পর উরখান খান পিতার লাশ তুলে বোর্সায় নিয়ে যান এবং সেখানে দাফন করেন।

উসমান বেগ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১২৫৮ সালে সোগোত শহরে। তাঁর মায়ের নাম হালিমা খাতুন। পিতা আরতুগরুলের মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল ২৪ বছর। ১২৮০ সালে উসমান বেগ বিয়ে করেন মালখাতুনকে। সেলজুকি সাম্রাজ্যের মন্ত্রী উমর আব্দুল আজিজ বেগ ছিলেন উসমান বেগের শ্বশুর। এরপর ১২৮৯ সালে উসমান বেগ দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে বিয়ে করেন রাবেয়া বালাখাতুনকে। রাবেয়ার পিতা ছিলেন সেকালের আলেম শেখ আদাহ বালি।

Scanned with CamScanner

সুলতান উরখান বিন উসমান

উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা উসমান বেগের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আনুষ্ঠানিকভাবে বসেন সুলতান উরখান। উসমান বেগের বড় পুত্র আলাউদ্দিন বিনা প্রশ্নে মেনে নেন ছোট ভাইয়ের নেতৃত্ব। কারণ, সামরিক সাফল্যে আলাউদ্দিনের চেয়ে উরখান নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন।

বোর্সা শহর জয়ের জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ের অবরোধ আরোপের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজ পুরোদমে শুরু করেন সুলতান উরখান। বড় ভাই আলাউদ্দিন তখন অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলায় মনোযোগ দেন।

১২৮১ সালে অথবা কারও কারও মতে, ১২৮৮ সালে সোগোত অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন সুলতান উরখান। ১৩২৪ সালে ৩৬ অথবা ৪৩ বছর বয়সে তিনি পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়ে উসমানি সাম্রাজ্যের শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করেন।

প্রায় ১০ বছরের অবরোধ শেষে ১৩২৬ সালে গুরুত্বপূর্ণ শহর বোর্সা জয় করেন সুলতান উরখান। কৌশলগত দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের কারণে এই শহরকে রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করেন তিনি।

এ সময় নতুন রাজ্যের সুরক্ষা ও যুদ্ধের প্রয়োজনে সুলতান উরখান স্থায়ী সেনাবাহিনী গঠনের কাজ শুরু করেন। জাইশে ইঙ্কেশারি (জানেসারি বাহিনী) নামের এই বাহিনী উসমানি সাম্রাজ্যের জয় ও সীমানাবিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল যুগ যুগ ধরে।

সামরিক প্রতিভা ও দক্ষতায় সুলতান উরখান ছিলেন অসীম সাহস ও প্রচণ্ড বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। অল্প কদিনে তাঁর কৌশলী নেতৃত্বের সুনাম ও প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের অন্যান্য অঞ্চলে।

বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের তখন ক্রান্তিকাল। ১৩৫৫ সালে বাইজেন্টাইন সম্রাট পঞ্চম ইউহান্না তাঁর শত্রুদের দমনে সহযোগিতা চাইলেন সুলতান উরখানের। এ সময় তিনি বুঝতে পারলেন, বাইজেন্টাইনের সময় শেষ হয়ে এসেছে। সম্রাট এই সাহায্যের বিনিময়ে সুলতানের সঙ্গে নিজের কন্যাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। সুলতান তাঁকে সাহায্যের জন্য একদল সৈন্য পাঠান।

Scanned with CamScanner

কিছুকাল পর সুলতান উরখান তাঁর পুত্র সুলায়মানকে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল জয়ের প্রস্তুতিমূলক পর্যবেক্ষণ ও অভিযানে পাঠান। তখন থেকে শুরু হয় বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য বিজয়ের পরিকল্পনা। ধীরে ধীরে বাইজেন্টাইন সীমান্তের আশপাশে উসমানি বাহিনীর তৎপরতা শুরু হয়।

সুলতান উরখানের আমলে এজনিক শহর জয়ের পর সেখানে প্রতিষ্ঠা করা হয় উসমানি রাজ্যের প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ঐতিহাসিকদের দাবি, সুলতান উরখানের আমলে তুর্কি ভাষাকে উসমানি রাজ্যের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলায়মানকে পরবর্তী উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেন সুলতান উরখান। শাহজাদা সুলায়মান তখন একদল সৈন্য নিয়ে কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পথ সুগম করতে আশপাশের বিভিন্ন দুর্গ ও ছোট ছোট অঞ্চলে অভিযান চালাচ্ছিলেন।

১৩৫৭ বা ১৩৫৯ সালে এক যুদ্ধে ঘোড়া থেকে পড়ে মৃত্যু হয় উসমানি সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ কর্ণধার শাহজাদা সুলায়মানের। ফলে সুলতান উরখানের উত্তরাধিকারী হিসেবে নাম ঘোষণা করা হয় আরেক পুত্র শাহজাদা মুরাদ বিন উরখানের।

৪৪ বছর বয়সে ১৩৬০ সালে মৃত্যুবরণ করেন সুলতান উরখান। বোর্সা শহরে তাঁকে দাফন করা হয়। দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে উসমানি সাম্রাজ্যের সিংহাসনে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি এর ভিতকে শক্তিশালী করে দেন। পাশাপাশি এ সময়ে তিনি এশিয়ায় বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অধীনে থাকা সব কটি অঞ্চল দখল করে নেন।

Scanned with CamScanner

সুলতান প্রথম মুরাদ

সুলতান উরখানের মৃত্যুর পর ক্রমবর্ধমান উসমানি সাম্রাজ্যের সিংহাসনে সমাসীন হন তাঁর পুত্র সুলতান প্রথম মুরাদ বিন উরখান। তাঁর বয়স তখন ৩৫ বছর। উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতানদের মধ্যে সর্বপ্রথম সুলতান হিসেবে তিনি কনস্টান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল) শহর অবরোধ করেন।

১৩২৬ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কারামান অঞ্চলের রাজধানী আঙ্কারা জয়ের মধ্য দিয়ে সুলতান মুরাদ উসমানি সাম্রাজ্যের বিস্তার শুরু করেন। এরপর আদিরনা শহর জয় করে তিনি এটিকে নতুন রাজধানী হিসেবে নির্বাচন করেন। এভাবে একে একে নতুন শহর জয় করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন তরুণ সুলতান মুরাদ।

উসমানি সাম্রাজ্যের এই অগ্রযাত্রা দেখে নড়েচড়ে বসে ইউরোপের খ্রিষ্টান দেশগুলো। পোপ ওরইয়ানুস পঞ্চমের তৎপরতায় ইউরোপের খ্রিষ্টান সৈন্যরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে উসমানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে প্রথমবারের মতো যুদ্ধে মুখোমুখি হয়।

সুলতান মুরাদের দক্ষ নেতৃত্বে এক লাখ সৈন্যের উসমানি সেনাবাহিনী পরাজিত করে ৬০ হাজার খ্রিষ্টান সৈন্যের সম্মিলিত বাহিনীকে। এ যুদ্ধের পর বুলগেরিয়া ও সার্বিয়া অঞ্চল উসমানি মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়।

সুলতান মুরাদ ৩৭টি যুদ্ধে নিজে অংশ নেন এবং সৈন্যদের নেতৃত্ব দেন। তিনি তাঁর শাসনামলে যেসব অঞ্চল উসমানি সাম্রাজ্যের মানচিত্রে যোগ করেন, তা তাঁর বাবার রেখে যাওয়া রাজ্যের পাঁচ গুণ বড়। ফলে তাঁর মৃত্যুকালে উসমানি সাম্রাজ্যের আয়তন পাঁচ লাখ বর্গকিলোমিটার ছাড়িয়ে যায়।

ইউরোপের বিভিন্ন খ্রিষ্টান-অধ্যুষিত অঞ্চল জয় করার পর সুলতান মুরাদ সেসব শহরে খ্রিষ্টান অধিবাসীদের সঙ্গে উদার আচরণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। সুলতান উরখানের আমলে যে সেনাবাহিনীর যাত্রা শুরু হয়, সুলতান মুরাদ তা আরও সুবিন্যস্ত এবং শক্তিশালী করেন।

Scanned with CamScanner

১৩৮৮ সালের ৮ অক্টোবর সার্বিয়ার পরাজিত বাহিনীর এক সৈন্যের প্রতারণায় নিহত হন সুলতান মুরাদ। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। ৩০ বছর ধরে তিনি উসমানি সুলতান হিসেবে পিতার রেখে যাওয়া সাম্রাজ্য অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যান।

উসমানি সাম্রাজ্যের তৃতীয় অধিপতি সুলতান মুরাদ প্রকৃতপক্ষে সুলতান খেতাবধারী প্রথম উসমানি শাসক। কারণ, তাঁর পিতা উরখান ও দাদা উসমানের জীবদ্দশায় তাঁদের নামের আগে 'বেগ' উপাধি ব্যবহৃত হতো। একজন বীর যোদ্ধা এবং নির্ভীক সুলতান হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বময়।

সুলতানের সঙ্গে প্রতারণা

যুদ্ধ শেষ। দুই পক্ষের বিপুল প্রাণহানির পর যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে উসমানি বাহিনী। নেতৃত্বে আছেন স্বয়ং সুলতান প্রথম মুরাদ। সেনাবাহিনীর পাশাপাশি আমির, উজির এবং পুত্র শাহজাদা বায়েজিদও তাঁর সঙ্গে আছেন।

১৩৮৯ সালের ১৫ জুন উসমানি বাহিনী ও ইউরোপীয় বাহিনীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী যে যুদ্ধ হয়, তা উসমানিদের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই যুদ্ধে খ্রিষ্টান বাহিনীর প্রধান রাজা লাজারের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পরাজয়ের শিকার হয় ইউরোপীয় সৈন্যরা।

যুদ্ধের পরদিন। রণাঙ্গনজুড়ে ছড়িয়ে আছে দুই পক্ষের নিহত সৈন্যদের অসংখ্য লাশ। বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে অস্ত্রশস্ত্র। ভেসে আসছে আহত সৈনিকদের গোঙানি।

সুলতান মুরাদের আদেশে আহত সৈনিকদের সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। অস্থায়ী চিকিৎসা ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে তাঁদের দ্রুত প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা দেওয়ার জন্য। আহত ও ক্ষতবিক্ষত উসমানি সৈন্যদের বাঁচিয়ে তুলতে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন চিকিৎসকেরা।

সুলতান মুরাদ তাঁর সেনাপতি ও উজিরদের সঙ্গে বের হয়েছেন। যুদ্ধ-পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি দেখার জন্য তিনি রণাঙ্গন ঘুরে দেখছেন। কিছুদূর যেতেই সামরিক কায়দায় সুলতানকে সালাম জানাল একজন সৈনিক।

–মহামান্য সুলতান, ইউরোপীয় বাহিনীর আহত সৈনিকদের মধ্যে সার্বিয়ার এক সৈনিক আপনাকে দেখতে চায়। মৃত্যুর আগে তাঁর শেষ ইচ্ছা, আপনার হাতে সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে।

Scanned with CamScanner

কোথায় ওই আহত সৈনিক? তাকে নিয়ে এসো এখানে।

–জাহাঁপনা, সে আহত। এখানে তুলে আনার মতো অবস্থা তার নেই।

সুলতান তাঁর সঙ্গীদের বললেন, 'চলো, আমরা যাই তার কাছে। মৃত্যুর আগে জীবনের শেষ মুহূর্তে যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে চাচ্ছে, তার কাছে আমাদের যাওয়া উচিত।'

সুলতান মুরাদ এসে দাঁড়ালেন আহত সৈনিকটির পাশে। সুলতানকে জানানো হলো, এই সৈনিকের নাম মিলুস কাবিলুফজ। ইউরোপীয় বাহিনীতে সার্বিয়ার হয়ে উসমানিদের বিরুদ্ধে লড়তে এসেছিল সে।

সুলতানকে দেখে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে আহত মিলুস। সুলতানের হাতে চুমু দেওয়ার আগ্রহে খুব কাছাকাছি এসে চোখের পলকে পোশাকের ভেতর থেকে সে ধারালো অস্ত্র বের করে ফেলল। মুহূর্তে সুলতানের বুকের নিচে সেটি ঢুকিয়ে দিল সে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন রক্তাক্ত সুলতান।

সুলতানকে জাপটে ধরে প্রহরীরা ছুটলেন নিরাপদ চিকিৎসা ক্যাম্পের উদ্দেশে। অন্য নিরাপত্তারক্ষীরা ধরে ফেলে ঘাতক মিলুসকে। সবাই বুঝতে পারল, যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে মিথ্যা অভিনয় করেছিল সার্বিয়ান এই প্রতারক।

আহত সুলতানের মুখ থেকে আর্তনাদের অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে আসছে। প্রচণ্ড রক্তক্ষরণে দুর্বল হয়ে আসছে তাঁর শরীর। দুই চোখ বন্ধ হয়ে আসছে তাঁর। তখনো আশা ছাড়েননি সুলতানের প্রহরী, সেবক ও চিকিৎসকেরা।

সুলতানের মুখ থেকে বেরিয়ে এল দুটি বাক্য, 'এটাই আমার ভাগ্যে লেখা ছিল। আমার পর তোমরা বায়েজিদকে মেনে নিয়ো।' এরপর নীরব হয়ে গেলেন তিনি। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন বীর বিজেতা ও শক্তিমান সুলতান প্রথম মুরাদ।

পরদিন সুলতানের মৃতদেহ বহন করে শোকাহত উসমানি সেনারা ফিরে এল বোর্সা শহরে। দরবারের সভাসদ এবং বিপুলসংখ্যক প্রজার উপস্থিতিতে সমাহিত করা হয় তাঁকে। সুলতান মুরাদের নামে নির্মিত মসজিদের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

সুলতানের সঙ্গে প্রতারণা ও তাঁকে হত্যার দায়ে ঘাতক মিলুসকে সেখানেই হত্যা করে উসমানি সেনাবাহিনীর একদল ক্ষুব্ধ সৈনিক।

Scanned with CamScanner

বীর সুলতান প্রথম বায়েজিদ

যুদ্ধবিদ্যা ও সামরিক কলাকৌশলে পারদর্শী সুলতান প্রথম বায়েজিদ পিতার অসিয়ত অনুযায়ী চতুর্থ সুলতান হিসেবে উসমানি সাম্রাজ্যের হাল ধরেন। সিংহাসনে বসে প্রথমে আপন ভাই ইয়াকুবকে হত্যার আদেশ করেন ৩০ বছর বয়সী তরুণ সুলতান।

নতুন সুলতানের এমন কঠোর সিদ্ধান্তে নাখোশ হন দরবারের সভাসদ ও গুণী ব্যক্তিরা। সুলতান বায়েজিদ তখন তাঁদের বলেছিলেন, 'একজন শাসক পৃথিবীতে আল্লাহর ছায়া। সুতরাং, যেহেতু আল্লাহ এক, কাজেই তাঁর ছায়া হিসেবে একজন সুলতান বেঁচে থাকবেন।' ভাইকে হত্যার পেছনে সুলতানের যুক্তি যেমনই হোক, উসমানি সুলতানদের মধ্যে এই রক্তাক্ত প্রথা যুগে যুগে প্রাণ কেড়ে নিয়েছে অনেক নিরপরাধ শাহজাদার।

সিংহাসনে বসে সার্বিয়ার রাজা লাজারের পুত্র স্টিফেনের সঙ্গে সখ্য তৈরি করেন সুলতান। স্টিফেনের বোন অলিভেরাকে বিয়ে করেন তিনি। পাশাপাশি বার্ষিক কর প্রদানের শর্তে স্টিফেনকে সার্বিয়া শাসনের সুযোগ দেন সুলতান।

সিংহাসনে আরোহণের আগে সুলতান বায়েজিদ কোতাহিয়া অঞ্চলের গভর্নর ছিলেন। এ ছাড়া হামেদ, আমাসিয়া অঞ্চলসহ অন্যান্য শহরের শাসক হিসেবে তিনি পিতার প্রতিনিধি ছিলেন বেশ কিছুকাল। কারামান গোষ্ঠীকে সমূলে উৎখাত করে আনাতোলিয়া ঐক্যবদ্ধ করার পাশাপাশি আশপাশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্রোহ দমন করেন সুলতান বায়েজিদ।

সুলতান প্রথম বায়েজিদের শাসনামলে উসমানি সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল বোর্সা। তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতায় মুগ্ধ জনসাধারণ ভালোবেসে তাঁকে 'সায়েকা' উপাধি দেয়। ইউরোপের বুলগেরিয়া, বসনিয়া, সালানিক ও আলবেনিয়া বিজয়ে সুলতান প্রথম বায়েজিদের কৃতিত্ব উসমানিদের ইতিহাসে আজও আলোচিত হয়ে আছে।

১৩৯৬ সালে ইউরোপ থেকে মুসলমানদের উৎখাত ও বিতাড়িত করতে ১৫টি খ্রিষ্টান দেশ যে সম্মিলিত আক্রমণ শুরু করে মুসলমানদের ওপর, এর প্রতিরোধে সুলতান প্রথম বায়েজিদ অবিশ্বাস্য সাফল্য অর্জন করেন।

Scanned with CamScanner

ইতিহাসের প্রসিদ্ধ নিগবোলি যুদ্ধে তাঁর নেতৃত্বে জয় ছিনিয়ে আনে উসমানি সৈন্যরা। পরাজয়বরণ করে ইংল্যান্ড, ফ্রান্সসহ ইউরোপের সম্মিলিত সামরিক শক্তি।

উসমানি সাম্রাজ্যের দুর্যোগকাল

তুর্কমেনিস্তানের শাসক এবং তাতারি সরদার তৈমুর লঙের আক্রমণে পরাজিত হয়ে ইরাকের শাসক সুলতান আহমদ আশ্রয় নিয়েছিলেন উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতান প্রথম বায়েজিদের কাছে। উসমানি সুলতান তাঁকে সসম্মানে আশ্রয় দেন এবং অতিথি হিসেবে গ্রহণ করেন। এ সংবাদে তাতারি সরদার তৈমুর লঙ ক্ষুব্ধ হন। তিনি সুলতান প্রথম বায়েজিদের কাছে একটি পত্র পাঠান। ওই পত্রে তৈমুর লঙ উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতান বায়েজিদকে মহান সম্রাট হিসেবে উল্লেখ করে ইরাক থেকে পলাতক শাসক আহমদকে ফেরত দেওয়ার অনুরোধ করেন।

তৈমুর লঙ এই চিঠিতে আরও জানান, পলাতক শাসককে তাঁর হাতে তুলে দিলে তিনি উসমানি সৈন্যদের সহযোগিতা করবেন। কারণ, তাঁর সৈন্যরাও উসমানি সৈন্যদের মতো বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত।

তৈমুর লঙের পাঠানো চিঠির উত্তরে সুলতান বায়েজিদ যে চিঠি পাঠান, এর ভাষা ছিল অত্যন্ত কঠোর। সুলতান বায়েজিদ তাঁর চিঠিতে তৈমুর লঙকে সম্বোধন করে লিখেছিলেন, 'শিকারি কুকুর তৈমুর, তুই বাইজেন্টাইন শাসকদের চেয়েও জঘন্য কাফের।' এমন অশোভন ও অপমানসূচক উত্তর পেয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়েন তৈমুর লঙ। তিনি তাঁর সৈন্যদের উসমানি সাম্রাজ্য অভিমুখে রওনা হতে আদেশ করেন।

তৈমুর লঙ তাঁর সৈন্যদের নিয়ে প্রথমে আর্মেনিয়ার সিওয়াস শহর দখল করে নেন এবং সুলতান বায়েজিদের ছেলে আরতুগরুলকে আটক করে হত্যা করেন। পরাজিত শত্রুদের বিভিন্নভাবে শাস্তি দিতে জুড়ি ছিল না তৈমুর লঙের। তাঁর নির্দেশে আর্মেনিয়ার ঘোড়সওয়ার সৈন্যদের মাথা ঝুঁকিয়ে দুই পায়ের মধ্যখানে বেঁধে ফেলা হয় এবং এরপর একটি বড় গর্তে ফেলে মাটিচাপা দেওয়া হয়।

অন্যদিকে সুলতান বায়েজিদও উসমানি সৈন্যদের নিয়ে তৈমুর লঙকে উচিত শিক্ষা দিতে রওনা হন। তৈমুর লঙের বাহিনীর বিভিন্ন অংশে নেতৃত্ব দেন তাঁর চার ছেলে। একইভাবে সুলতান বায়েজিদের নির্দেশনায় উসমানি সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অংশের নেতৃত্ব দেওয়া হয় তাঁর পাঁচ ছেলের হাতে।

Scanned with CamScanner

১৪০২ সালের জুলাই মাসে আঙ্কারা শহরের প্রান্তে মুখোমুখি হয় দুই বাহিনী। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তুমুল যুদ্ধ চলে দুই পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে। কৌশলগত অবস্থানের দিক থেকে সুলতান বায়েজিদ ভালো অবস্থানে ছিলেন। দিনভর চলা যুদ্ধে উসমানি সৈন্যদের নৈপুণ্য ও বীরত্ব প্রায় জয়ের প্রান্তে নিয়ে যায় তাঁদের। কিন্তু সন্ধ্যায় যুদ্ধ থামার পর উসমানি সৈন্যদের বিভিন্ন অংশ দলে দলে তৈমুর লঙের বাহিনীতে যোগ দেয়। একপর্যায়ে সৈন্যসংখ্যা কমে যায় সুলতান বায়েজিদের পক্ষে। মাত্র ১০ হাজার ইঙ্কেশারি বাহিনীর সদস্য এবং সার্বিয়ার সৈন্যরা ছাড়া অন্যরা তৈমুর লঙের পক্ষে অবস্থান নেয়। কারণ, ওইসব সৈন্য যেসব অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল, সেসব অঞ্চলের শাসকদের মধ্যে অনেকের ছেলে তখন তৈমুর লঙের হাতে বন্দী।

২৮ জুলাই সন্ধ্যার পর সুলতান বায়েজিদ যখন উসমানি সৈন্যদের পরাজয় টের পেলেন, তখন পুত্র মুসাকে নিয়ে তিনি পালিয়ে যান। কিন্তু পথে ঘোড়ার পিঠ থেকে তিনি পড়ে যান এবং তৈমুর লঙের সৈন্যদের হাতে আটক হন। সুলতান বায়েজিদের ছেলেদের মধ্যে মুসা তাঁর সঙ্গে বন্দী হলেন। অন্য তিন পুত্র সুলায়মান, ইসা ও মুহাম্মদ পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। আরেক পুত্র শাহজাদা মুস্তফা সেদিন থেকে নিখোঁজ হন।

বন্দী উসমানি সুলতান বায়েজিদকে যখন তৈমুর লঙের সামনে হাজির করা হয়, তখন তিনি যথাযথ সম্মানে তাঁকে স্বাগত জানান। সুলতান বায়েজিদের সঙ্গে তৈমুর লঙের আচরণ ছিল অত্যন্ত অমায়িক। তিনি সুলতান বায়েজিদকে নিজের পাশে বসান এবং তাঁর সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। পরাজিত ও বন্দী সুলতান বায়েজিদকে জীবনের নিরাপত্তা দেন তৈমুর লঙ। তিনি প্রহরীদের আদেশ করেন, সুলতান বায়েজিদকে কঠিন প্রহরায় রাখা হবে, তবে তাঁর সম্মান ও সমাদরে যেন কোনো ত্রুটি না হয়।

উসমানি সাম্রাজ্য লণ্ডভণ্ড করে আনাতোলিয়ায় প্রায় আট বছর অবস্থান করেন তৈমুর লঙ। এ সময় তিনি উসমানি সাম্রাজ্যের অঞ্চলগুলো থেকে উসমানিদের তাড়িয়ে আগের শাসকদের হাতে ফিরিয়ে দেন। ধীরে ধীরে উসমানি সাম্রাজ্যজুড়ে পতনের সুর বেজে ওঠে।

বন্দিদশা থেকে তিনবার পালাতে চেষ্টা করেন সুলতান বায়েজিদ। কিন্তু প্রতিবারই তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং তিনি ধরা পড়েন। ১৪০৩ সালের ১০ মার্চ অসুস্থ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন উসমানি সাম্রাজ্যের পরাজিত এবং অসহায় সুলতান প্রথম বায়েজিদ। তাঁর বয়স তখন ৪৪ বছর।

Scanned with CamScanner

সুলতান বায়েজিদের লাশ বোর্সা শহরে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেন তৈমুর লঙ। সুলতান বায়েজিদের বন্দী পুত্র মুসাকে কঠিন প্রহরায় তাঁর পিতার লাশ দাফনে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। সেখানে উসমানি সাম্রাজ্যের প্রয়াত সুলতান প্রথম মুরাদের কবরের পাশে সমাহিত করা হয় সুলতান প্রথম বায়েজিদকে।

১৩৮৯ থেকে ১৪০৩ সাল পর্যন্ত উসমানি সাম্রাজ্য শাসন করেন সুলতান বায়েজিদ। ১৩৬০ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

সুলতানের সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য

সুলতান বায়েজিদকে আদালতে তলব করেছেন বিচারক। এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে বোর্সার সাধারণ মানুষের মুখে মুখে। সবার মনে মনে বিস্ময় ও ভয়। সব শঙ্কা ও উৎকণ্ঠা দূর করে সুলতান আদালতে হাজির হওয়ার ঘোষণা দিলেন।

উসমানি আদালতের বিচারপতি কাজি শামসুদ্দিন ফানারি প্রশংসিত আলেম এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত। যথাসময়ে সুলতান আদালতে তাঁর সামনে হাজির হলেন। প্রথা অনুযায়ী তিনিও অন্য আসামিদের সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন কাঠগড়ায়।

আদালতে বিচারাধীন একটি মামলায় সাক্ষী হিসেবে সুলতানের নাম এসেছে। সে জন্য বিচারপতি তাঁকে তলব করেছেন। সেই আদেশে সাড়া দিয়ে সুলতান এসেছেন সাক্ষ্য দিতে।

বিচারক শামসুদ্দিন ফানারি সুলতান বায়েজিদের দিকে একনজর তাকালেন। তাঁর সাক্ষ্য শোনার আগে সাফ জানিয়ে দিলেন, 'মাননীয় সুলতান, আপনার সাক্ষ্য আদালতের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, আপনি মসজিদে গিয়ে সবার সঙ্গে নামাজ আদায় করেন না। কোনো যৌক্তিক কারণ ছাড়া যে ব্যক্তি মসজিদে এসে জামাতে নামাজ আদায় করেন না, তাঁর পক্ষে অসত্য সাক্ষ্য দেওয়া অসম্ভব নয়। কাজেই আপনার সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা করা হলো।' বিচারপতি কাজি শামসুদ্দিন উঠে দাঁড়ালেন। এজলাস ছেড়ে তিনি খাসকামরায় চলে গেলেন।

সুলতানের উপস্থিতিতে তাঁকে লক্ষ করে বিচারকের এমন মন্তব্যে স্তব্ধতা নেমে এল বিচারকক্ষে। নীরব ও নির্বাক সবাই একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছেন। এভাবে সুলতানকে অপমান করার পরিণতি কী হতে পারে, ভাবতেই গা শিউরে উঠছে মামলার বাদী ও বিবাদীর।

Scanned with CamScanner

কিন্তু কিছুই ঘটল না। সুলতান বায়েজিদ নীরবে আদালত ত্যাগ করলেন। শহরজুড়ে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল এমন বিস্ময়কর ঘটনা।

সেদিন প্রাসাদে ফিরে সুলতান বায়েজিদ একটি নতুন মসজিদ নির্মাণের আদেশ করলেন। রাজপ্রাসাদের আঙিনায় নির্মাণকাজ শুরু হলো নতুন মসজিদের। অল্প দিনে এর কাজ শেষ হলো, নতুন মসজিদ থেকে আজানের ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। তখন থেকে সুলতান বায়েজিদ নিয়মিত এ মসজিদে জামাতের সঙ্গে নামাজ আদায় করা শুরু করলেন। একজন সাহসী বিচারকের মন্তব্য পাল্টে দিল সুলতানের জীবন।

তুরস্কের ইতিহাসবিদ উছমান নাজ্জার তাঁর *হাদিকাতুস সালাতিন* বইয়ে এ ঘটনার বিবরণ লিখেছেন। বইটি রচনা করেছিলেন তিনি আজ থেকে প্রায় দুই শ বছর আগে।

সুলতান যখন ন্যায়পরায়ণ হন, তখন আদালতেও এমন ন্যায়বিচার করার মতো সাহসী বিচারকেরা অধিষ্ঠিত হন। ফলে সত্য ও সুন্দরের জয় হয়। সাধারণ মানুষের অধিকার সুরক্ষিত হয়।

সুলতানের উত্তর

বাইজেন্টাইন সম্রাট ম্যানুয়েলের শাসনামলে ১৩৯১ সালে কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করেন সুলতান বায়েজিদ। ইতিহাসের ওই সময়ে ইউরোপের অন্যান্য খ্রিষ্টান শাসক তাঁদের সম্মিলিত সেনাশক্তি নিয়ে ইউরোপ থেকে মুসলমানদের বের করে দেওয়ার জন্য ঐক্যবদ্ধ হন। বিভিন্ন সামরিক কৌশলে শক্তি সঞ্চয় করে উসমানি সেনাবাহিনীকে নির্মূল করতে উঠেপড়ে লাগে ইউরোপের খ্রিষ্টানশক্তি।

উসমানিদের উৎখাত করতে হাঙ্গেরির সম্রাট সিগমন্ড গোপনে বুলগেরিয়ার সম্রাট শিশম্যানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। সুলতান বায়েজিদের পিতা সুলতান মুরাদের শাসনকালে যে অংশ উসমানিরা জয় করেছিলেন, সেটি আবারও নিজেদের দখলে ফিরিয়ে আনার জন্য এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাঁদের মধ্যে।

হাঙ্গেরি ও বুলগেরিয়ার মধ্যে এ সমরচুক্তির খবর পান সুলতান বায়েজিদ। তিনি তাদের প্রস্তুতির সময় না দিয়ে আকস্মিক আক্রমণ করলেন বুলগেরিয়ায়। এতে মুখ থুবড়ে পড়ে বুলগেরিয়ার সমরশক্তি। উসমানি সেনাবাহিনী বুলগেরিয়ার বিভিন্ন শহর জয় করে নেয়। উসমানি মানচিত্রের নতুন অংশ হয় বুলগেরিয়া।

Scanned with CamScanner

বুলগেরিয়ার এমন করুণ পরিণতি দেখে হাঙ্গেরির সম্রাট সিগমন্ড টের পেলেন, তাঁর রাজ্যের আকাশেও বিপদের মেঘ জমছে। কদিন পর হয়তো তাঁকে পালিয়ে যেতে হবে রাজ্য ছেড়ে। নয়তো বন্দী হতে হবে উসমানিদের হাতে।

অনেক যোগ-বিয়োগ করে সম্রাট সিগমন্ড সিদ্ধান্ত নিলেন, প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে উসমানি সুলতানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ফাঁদ পাতবেন তিনি। যদিও তিনি জানেন, দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা বা সন্ধি সমঝোতা উসমানিদের পছন্দ নয়। যাওয়ার বেলায় প্রতিনিধিদলকে তিনি বললেন, 'সুলতান বায়েজিদের সঙ্গে দেখা করে তোমরা তাঁকে শুধু একটি প্রশ্ন করবে, কোন অধিকার এবং শক্তিতে তিনি ইউরোপ জয় করতে অভিযানে নেমেছেন?'

হাঙ্গেরির সম্রাটের প্রতিনিধিদল যথাসময়ে সুলতানের রাজপ্রাসাদে এসে পৌছাল। সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হলো তাদের।

সুলতানকে সম্মান জানিয়ে প্রতিনিধিদলের নেতা বললেন, 'হাঙ্গেরির মহান সম্রাট সিগমন্ড জানতে চেয়েছেন, আপনি কোন অধিকার এবং শক্তিতে ইউরোপে আক্রমণ করছেন?'

সুলতান তাঁর প্রহরীকে একখানা কোরআন শরিফ আনার আদেশ করলেন। নির্দেশমতো প্রহরী পবিত্র কোরআন এনে সুলতানের হাতে তুলে দিল।

হাঙ্গেরির প্রতিনিধিদলের সামনে সুলতান পবিত্র কোরআনে চুমু খেলেন। এরপর নিজেই কোমরের খাপ থেকে তলোয়ার বের করলেন। ডান হাতে কোরআন এবং বাম হাতে তলোয়ার তুলে ধরে প্রতিনিধিদলকে বললেন, 'আমার ডান হাতে কোরআন, এই মহাগ্রন্থের শক্তিতে আমি ইউরোপ আক্রমণ করছি। আর বাম হাতে আমার তলোয়ার, এই অসির যোগ্যতায় আমি এখানে এসেছি। আমার শক্তি ও যোগ্যতার এই দুটি উৎস তোমাদের সিগমন্ডকে বুঝিয়ে বলো।'

সুলতান উঠে দাঁড়ালেন। প্রতিনিধিদল বেরিয়ে এল দরবার থেকে। বিস্ময় ও ভয় তাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

সুলতানের মসজিদ

১৩৯৬ সালে রাজধানী বোর্সায় শহরের প্রাণকেন্দ্রে একটি বড় মসজিদ নির্মাণের ইচ্ছা করেন সুলতান প্রথম বায়েজিদ। সুলতানের ইচ্ছাপূরণে মসজিদ

Scanned with CamScanner

তৈরির জন্য প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু হলো। নানা বিবেচনা শেষে শহরে একটি জায়গা নির্বাচন করলেন সুলতানের কর্মকর্তারা।

শহরের মাঝখানে অবস্থিত ওই জায়গায় তখন অনেকের ঘরবাড়ি। দরবারের পক্ষ থেকে এসব ঘরবাড়ির মালিকদের জানিয়ে দেওয়া হলো, মহামান্য সুলতানের আদেশে এখানে মসজিদ তৈরি করা হবে, ফলে তাদের বাড়িঘর অন্যত্র সরিয়ে নিতে হবে।

সুলতানের আদেশ মেনে মসজিদ তৈরির জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে সম্মত হলো নির্ধারিত জায়গার বাসিন্দারা। এর বিনিময়ে তারা সুলতানের পক্ষ থেকে অন্যত্র জমি বুঝে নিল। কিন্তু বেঁকে বসল একটি ঘরের মালিক। তার এক কথা, বাপ-দাদার এই ভিটেমাটি ছেড়ে সে কোথাও যাবে না।

দরবারের লোকেরা খবর পেলেন, জমি ছাড়তে নারাজ লোকটি ধর্মে খ্রিষ্টান। মুসলমানদের ইবাদতের জন্য মসজিদ তৈরি হবে, এটা তার কাছে অসহনীয়। আবার এই জমি না পেলে মসজিদ তৈরি করা সম্ভব নয়। কারণ, খ্রিষ্টান লোকটির জমি মসজিদের জন্য নির্ধারিত জায়গার একদম মধ্যবিন্দুতে অবস্থিত। চারপাশের সবাই নিজেদের ভূমি হস্তান্তর করে অন্যত্র চলে যাচ্ছে, কিন্তু খ্রিষ্টান লোকটি গোঁ ধরে আছে।

এ নিয়ে বেশ কয়েক দিন ধরে তার সঙ্গে আলোচনা করা হলো। শেষে অতিরিক্ত মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে সে এই জমি ছেড়ে দিতে রাজি হলেও শর্ত জুড়ে দিল। শর্তটি হলো, তার ঘরের এই জমিসহ আশপাশের পুরো জায়গায় সুলতানের মসজিদ তৈরি হোক, তাতে তার আপত্তি নেই। কিন্তু তার এই জমিতে কেউ নামাজ পড়তে পারবে না। এমন অদ্ভুত শর্ত শুনে থমকে গেলেন সুলতানের প্রতিনিধিরা। মসজিদ তৈরি হবে কিন্তু নামাজ পড়া যাবে না, তবে এ অংশে আর কী করা যেতে পারে! এমন শর্ত মেনে জমি কিনেই বা লাভ কী?

উসমানি সাম্রাজ্যের তৎকালীন শায়খুল ইসলামের কাছে এ ব্যাপারে সমাধান চাওয়া হয়। তিনি খ্রিষ্টান নাগরিকের শর্ত মেনে জমি কিনে নেওয়ার ফতোয়া দিলেন।

সব ঝামেলা ও বাধা-বিপত্তি শেষ হওয়ার পর মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু হলো। কিন্তু খ্রিষ্টান লোকটির শর্ত মেনে কীভাবে মসজিদটি তৈরি করা যায়, এ নিয়ে ভাবতে থাকলেন সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীরা। কারণ, মসজিদ তৈরির সাধারণ নিয়মে প্রথমে নামাজের কাতার এবং পেছনের দিকে নামাজিদের অজুর জন্য জায়গা রাখা হয়। খ্রিষ্টান লোকটির কাছ থেকে কেনা জমি পুরো

Scanned with CamScanner

জায়গাটির এক পাশে বা কোনায় হলে সেটি অজুর জায়গা হিসেবে রাখা যেত। তাতে লোকটির শর্তও পূরণ করা সম্ভব হতো। কিন্তু খ্রিষ্টান লোকটির জমি প্রস্তাবিত জায়গার মাঝখানে হওয়ায় সমস্যা জটিল আকার ধারণ করল।

নানা হিসাব-নিকাশ করে ভেবেচিন্তে প্রকৌশলীরা সিদ্ধান্ত নিলেন, এই মসজিদের অজুখানা তৈরি হবে মসজিদের মাঝখানে। একজন খ্রিষ্টান নাগরিকের বেঁধে দেওয়া শর্তের প্রতি সম্মান দেখিয়ে বিষয়টি মেনে নিলেন সুলতান।

এভাবেই নির্মাণকাজ শেষ হলো মসজিদের। সেদিন থেকে বোর্সা শহরবাসীর কাছে এই স্থাপনা কেবলই নামাজ আদায়ের মসজিদ নয়, বরং ইসলামের উদারতার এক অনন্য নিদর্শন হয়ে থাকল।

বোর্সা শহরে উলু জামে নামের এই মসজিদে আজও যাঁরা নামাজ পড়তে যান, তাঁরা প্রথমেই অবাক হন মসজিদের মাঝখানে পানির ঝরনা ও অজুখানা দেখে। কিন্তু অনেকেই জানেন না, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে একজন সাধারণ খ্রিষ্টানের ইচ্ছা ও শর্তের প্রতি সেকালের প্রতাপশালী উসমানি সুলতানের শ্রদ্ধার এই অবাক করা গল্প।

রুটিওয়ালার মসজিদ

প্রতিদিন সকালে তিনি রুটি নিয়ে বের হন। বাজারে কিংবা অলিগলিতে ঘুরে ঘুরে রুটি বিক্রি করেন। পথেঘাটে শিশুদের পেলে আদর করেন। সদা হাসিমুখ, সহজ-সরল মানুষ তিনি। শুভ্র সফেদ চেহারার এ রুটি বিক্রেতাকে শহরের সবাই ভালোবাসে। বোর্সা শহরবাসীর প্রিয় রুটিওয়ালা মানুষটিকে সবাই ডাকে 'সমুনজি বাবা' নামে। 'সমুন' শব্দের অর্থ রুটি।

তিনি যখন কোনো গলিতে ঢোকেন, তখন খেলায় ব্যস্ত শিশুরা দৌড়ে আসে। তারা হইহুল্লোড় করে, সমুনজি পিতা এসেছেন, সমুনজি পিতা এসেছেন। বাচ্চাদের হইচই শুনে ঘরের লোকেরা বের হয়ে আসে। তারা সবাই রুটিওয়ালার কাছ থেকে রুটি কেনে। তারপর যখন তিনি বাজারে আসেন, তখনো সবাই তাঁর কাছ থেকে রুটি কেনে। কারণ, সবাই জানে, সমুনজি বাবার রুটি যেমন গরম থাকে, তেমনই তা সুস্বাদু।

রুটিওয়ালা সমুনজি বাবার আসল নাম হামেদ আকসারাবলি। কাইছারি শহরে তাঁর জন্ম। সেকালের শাম, তিবরিজসহ নানা শহরে তিনি পড়াশোনা করেছেন। আরদবিল শহরের বিখ্যাত আলেম ও সাধক বুজুর্গ আলাউদ্দিন

Scanned with CamScanner

আলআরদবিলির কাছে তিনি শিষ্য হিসেবে সান্নিধ্য গ্রহণ করেছেন, জ্ঞান অর্জন করেছেন। একাধারে কয়েক বছর এ মনীষীর সাহচর্যে তিনি আধ্যাত্মিকতার সবক শিখেছেন।

তারপর তিনি চলে আসেন এই বোর্সা শহরে। কারণ, উসমানি সাম্রাজ্যের এটাই তখন রাজধানী। ক্ষমতায় সমাসীন সুলতান প্রথম বায়েজিদ।

নিজের বাড়িতে রুটি বানাতেন সমুনজি বাবা। তারপর রোজ সকালে সেসব রুটি ঝোলায় ভরে কাঁধে নিয়ে বের হয়ে যেতেন। রুটি বিক্রি করা ছিল তাঁর জীবিকা উপার্জনের পেশা। বাস্তবে এই রুটিওয়ালা যে মস্ত বড় জ্ঞানী ও দরবেশ, সেটা শহরের অনেকেই জানত না। রুটি বিক্রির আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখতেন সমুনজি বাবা।

বোর্সা শহরবাসীর জন্য নতুন জামে মসজিদ নির্মাণ করছেন সুলতান প্রথম বায়েজিদ। শত শত লোক কাজ করছে এর নির্মাণে। সমুনজি বাবা প্রতিদিন নির্মাণাধীন ওই মসজিদের আঙিনায় যান। কর্মরত শ্রমিকেরা তাঁর কাছ থেকে রুটি কেনে। কাজের বিরতিতে তারা রুটি খেয়ে আবারও কাজে মনোযোগ দেয়।

এ মসজিদের নাম 'আলো জামে'। এর অর্থ বিশাল মসজিদ বা আলজামেউল আজিম। সেকালে ইসলামি স্থাপত্যের দৃষ্টিনন্দন চমৎকার স্থাপনা হিসেবে এ মসজিদ তৈরি করা হচ্ছিল। বাইরে থেকে দেখতে যেমন মুগ্ধকর, তেমনি এর ভেতরে কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের কারুকাজ আরও বেশি সুন্দর।

মসজিদের নির্মাণকাজ শেষ হলে সুলতান ঘোষণা দিলেন, আগামী শুক্রবার স্বয়ং তিনি উপস্থিত থেকে জুমার নামাজের মাধ্যমে মসজিদের শুভ উদ্বোধন করবেন।

নির্ধারিত শুক্রবার ঘনিয়ে এল। সকাল থেকে বোর্সা শহরবাসী ভিড় করল মসজিদের চারপাশে। এত সুন্দর মসজিদে প্রথম জুমার নামাজ আদায় করতে শহরের বাইরে থেকেও অনেকে এসেছে। পুরো মসজিদ এবং আঙিনা ও চারপাশ লোকে লোকারণ্য। যথাসময়ে এলেন সুলতান বায়েজিদ এবং তাঁর উজির ও অন্য সঙ্গীরা। শহরের বিচারপতি শামসুদ্দিন ফানারিসহ গণ্যমান্য সবাই উপস্থিত হয়েছেন।

সুলতান প্রথম বায়েজিদ মসজিদের প্রথম কাতারে এসে বসলেন। তারপর তিনি একজন আলেমের দিকে তাকালেন। তাঁর নাম আমির সুলতান। সুলতান তাঁকে ইশারা করলেন খুতবা এবং নামাজ পড়াতে।

Scanned with CamScanner

সুলতানের আদেশে উঠে দাঁড়ালেন আমির সুলতান। প্রাজ্ঞ পণ্ডিত ও আলেম হিসেবে শহরের সবাই তাঁকে চেনে। কিন্তু মেহরাবের কাছে গিয়ে সবার দিকে তাকাতে লাগলেন আমির সুলতান, যেন তিনি কাউকে খুঁজছেন। মসজিদে সমবেত সবাই অপেক্ষা করছে, আমির সুলতান কাকে ডাকেন সেটা দেখার জন্য।

আমির সুলতান কাকে যেন দেখতে পেলেন। হাতের ইশারায় তাঁকে ডাকলেন উঠে আসার জন্য। উপস্থিত সবাই তাকিয়ে দেখে, আমির সুলতান ডাকছেন তাদের প্রিয় রুটিওয়ালাকে। সবাই এবার নড়েচড়ে বসল। কী করবেন তিনি এই রুটিওয়ালাকে ডেকে!

সবার বিস্ময়ভরা প্রতীক্ষা ভাঙল আমির সুলতানের কণ্ঠে। তিনি বললেন, 'এ মসজিদে আজ উপস্থিত সবার মধ্যে জুমার নামাজে খুতবার জন্য সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি হচ্ছেন এই লোক।' তারপর তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন সমুনজি বাবাকে। তাঁকে অনুরোধ করলেন খুতবার জন্য মিম্বরে গিয়ে দাঁড়াতে।

আকস্মিক এমন পরিস্থিতিতে বিব্রত ও কুণ্ঠিত সমুনজি বাবা। লজ্জায় মাথা নত করে আছেন তিনি। আমির সুলতানকে ফিসফিস করে বললেন, 'আপনি এ কী করলেন!' আমির সুলতান তাঁকে বললেন, 'আজ আপনিই এখানে যোগ্যতম ব্যক্তি। তাই এ কাজ করেছি।'

যে পরিচয় তিনি এত দিন গোপন করে রেখেছিলেন শহরের সবার কাছে, সেটাই আজ ফাঁস করে দিলেন আমির সুলতান, এটা ভেবে সমুনজি বাবা বারবার বিব্রত বোধ করছিলেন। তবু তিনি উঠে দাঁড়ালেন নবনির্মিত সুবিশাল এই মসজিদের অপূর্ব সুন্দর মিম্বরে।

তারপর খুতবা দিলেন উপস্থিত সবার উদ্দেশে। সুরা ফাতেহার সাতটি তাফসির ও ব্যাখ্যা সংক্ষেপে তুলে ধরলেন। পবিত্র কোরআনের সুরা ফাতেহার এমন সাত রকমের ব্যাখ্যা শুনে স্বয়ং সুলতান, বিচারপতিসহ উপস্থিত সবাই মুগ্ধ হলেন।

বিচারপতি শামসুদ্দিন ফানারি জুমার নামাজের পর তাঁর সঙ্গীদের বললেন, 'সমুনজি বাবার গভীর পাণ্ডিত্যে আমি মুগ্ধ। তাঁর প্রথম তাফসিরটি সবাই বুঝতে পেরেছে। দ্বিতীয়টি কেউ কেউ বুঝেছেন। তৃতীয় তাফসিরটি কেবল বিশেষ ব্যক্তিরাই বুঝতে পেরেছেন। তাঁর চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম ব্যাখ্যাটি ছিল আমাদের অনুধাবনের ঊর্ধ্বে।'

Scanned with CamScanner

জুমার নামাজ শেষ হলো। শহরবাসীর মুখে মুখে নতুন করে ছড়িয়ে পড়ল সমুনজি বাবার নাম। যাঁকে তারা এত দিন দেখেছে পথেঘাটে রুটির ঝোলা কাঁধে, তিনি এত বড় ব্যক্তিত্ব–জানতে পেরে অবাক শহরবাসী।

কত মহান সাধক হলে নিজেকে এভাবে লুকিয়ে রেখে রুটি বিক্রি করে জীবিকা উপার্জন করে একজন মানুষ, সেটা নিয়ে ভাবছে সবাই। শুক্রবার দিনের বাকিটা সময় সবাই অপেক্ষায় থাকল শনিবার সকালের। কারণ, শনিবার সকালে আবারও যখন তিনি বের হবেন রুটি নিয়ে, তখন তারা সমুনজি বাবার কদমবুসি করবে। তাঁর কাছে দোয়া চাইবে। রাত পোহাবার অপেক্ষায় থাকল বোর্সা শহরবাসী।

শনিবারের সকাল হলো। যথারীতি আলোকিত সূর্যোদয়ে আলো ঝলমল করছে বোর্সা নগরী। কিন্তু আজ আর বের হচ্ছেন না রুটিওয়ালা সমুনজি বাবা। অপেক্ষার প্রহর যে আর কাটে না। কেউ কেউ খুঁজতে বের হলেন তাঁকে। তাঁর ঘরের উদ্দেশে। কিন্তু ততক্ষণে শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন সমুনজি বাবা। যে শহরের মানুষ তাঁকে চিনে ফেলেছে, এ শহরে তিনি থাকবেন না। লোকেরা এসে দেখে, শূন্য পড়ে আছে তাঁর ঘরটি। রুটি বানানোর সেই চুলোয় আজ আর আগুন জ্বলেনি।

প্রিয় রুটিওয়ালাকে আর দেখতে না পেয়ে প্রিয়জন হারানোর বেদনায় সেদিন মন খারাপ হয়েছিল বোর্সা শহরবাসীর। শুধু কি রুটিওয়ালা, তিনি যে একজন মস্ত বড় আলেম, একজন বুজুর্গ আল্লাহওয়ালা। আহা! এই শহরের কোথাও আর তাঁকে হাসিমুখে দেখা যাবে না।

অনেক পরে আকসারাই নামের এক শহরে ইন্তেকাল করেছিলেন এই রুটিওয়ালা। সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

Scanned with CamScanner

চার ভাইয়ের দ্বন্দ্ব ও ষড়যন্ত্র অরক্ষিত উসমানি সাম্রাজ্য

তাতারদের আক্রমণে পরাজিত হওয়ার পর উসমানি সাম্রাজ্য সংকুচিত হয়ে আসে। তাতার সরদার তৈমুর লঙ উসমানি অঞ্চলগুলো আগের শাসকদের হাতে ফিরিয়ে দেন। ফলে হাতে গোনা দু-চারটি শহর ছাড়া অন্যান্য সব অঞ্চল উসমানিদের হাতছাড়া হয়।

উসমানি সুলতান প্রথম বায়েজিদকে আটক করার মধ্য দিয়ে উসমানি সাম্রাজ্যের আকাশে যে দুর্যোগের মেঘ জমে, তা আরও প্রকট আকার ধারণ করে তাঁর মৃত্যুর পর। বন্দী অবস্থায় সুলতান বায়েজিদের মৃত্যুসংবাদ তাঁর সন্তানদের মধ্যে ক্ষমতার লোভ ও দ্বন্দ্ব জাগিয়ে তোলে। পরস্পরে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তৈমুর লঙের হাত থেকে সাম্রাজ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করার পরিবর্তে তাঁরা মেতে ওঠেন পারস্পরিক শত্রুতায়।

সুলতান প্রথম বায়েজিদের মৃত্যুকালে তাঁর যে পুত্ররা জীবিত ছিলেন, তাঁরা হলেন শাহজাদা সুলায়মান শাহ (১৩৭৫-১৪১০), শাহজাদা ইসা (১৩৭৮-১৪০৫), শাহজাদা মুস্তফা (১৩৮০-১৪২২), শাহজাদা মুহাম্মদ (১৩৮২-১৪২১), শাহজাদা মুসা (১৩৮৮-১৪১৩) ও শাহজাদা কাসেম (১৩৯৭-১৪১৭)। এঁদের মধ্যে শাহজাদা মুহাম্মদ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে একে একে বড় ভাই সুলায়মান, ইসা ও ছোট ভাই মুসাকে হত্যা করেন।

সুলতান প্রথম বায়েজিদের পুত্র শাহজাদা সুলায়মান তাঁর পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়েই আদিরনা শহরে নিজেকে উসমানি সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন। শুধু তা-ই নয়, অন্য দুই ভাইকে ঠেকাতে তিনি রোমের সম্রাট দ্বিতীয় ইমানুয়েলের সঙ্গে চুক্তি করেন। চুক্তি অনুযায়ী উসমানিদের জয় করা শহর সালানিক এবং আরও কিছু অঞ্চল তিনি রোমান সম্রাটকে ফিরিয়ে দেন। নিজেকে আস্থাবান হিসেবে প্রমাণ করতে রোমান সম্রাটের ঘনিষ্ঠ এক নারীকে বিয়েও করেন তিনি। এসব কিছুর বিনিময়ে সম্রাট যেন সামরিক শক্তি দিয়ে তাঁকে সহযোগিতা করেন, এটাই তাঁর ইচ্ছা।

Scanned with CamScanner

ওদিকে আরেক শাহজাদা মুহাম্মদ আনাতোলিয়ার বিভিন্ন পার্বত্য অঞ্চলে নিজেকে সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন। অন্য শাহজাদা ইসা নিজেকে বোর্সা শহরে সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন। সুলতান প্রথম বায়েজিদের তিন পুত্রের মধ্যে এমন কাড়াকাড়ি ও বিভেদ দেখে তৈমুর লঙ আপ্লুত হন। তিনি গোপনে তিনজনকেই সহযোগিতা করেন, যাতে দীর্ঘকাল তিন ভাই একে অন্যের বিরুদ্ধে লেগে থাকেন এবং উসমানি সাম্রাজ্য আর কখনো উঠে দাঁড়ানোর সুযোগ না পায়।

শুরু হয় উসমানি সাম্রাজ্যের দুর্যোগপূর্ণ দুঃসময়। সুলতান প্রথম বায়েজিদের অবর্তমানে পুরো সাম্রাজ্য যখন তাতারদের আক্রমণে বিধ্বস্ত, তখন নতুন করে তিন শাহজাদার ভ্রাতৃঘাতী লড়াই অস্থির করে তোলে সাধারণ মানুষকে। শাহজাদা মুহাম্মদ তাঁর অনুগত সৈন্যদের নিয়ে প্রথমে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাঁর ভাই ইসার ওপর। কয়েকটি যুদ্ধে তাঁর সৈন্যদের পরাজিত করে শাহজাদা মুহাম্মদের সৈন্যরা। একপর্যায়ে নিহত হন শাহজাদা ইসা। শেষ হয় তাঁর সংক্ষিপ্ত অধ্যায়।

এরপর তৈমুর লঙের নির্দেশে কারমান প্রদেশের শাসকের হাতে বন্দী মুসাকে মুক্ত করেন মুহাম্মদ। দুই ভাই মিলে পরামর্শ করেন কীভাবে তাঁদের ভাই সুলায়মানকে দমন করা যায়। মুহাম্মদের অনুগত সৈন্যদের নিয়ে ইউরোপীয় অঞ্চলে অবস্থানরত সুলায়মানকে দমন করতে রওনা হন মুসা। প্রথমবার পরাজিত হয়ে ফিরে আসেন তাঁরা। কিছুদিন বিরতির পর আরও শক্তি সঞ্চয় করে আবারও সুলায়মানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন মুসা। আদিরনা শহরের বাইরে সংঘটিত যুদ্ধে ১৪১০ সালে সুলায়মান নিহত হন তাঁর ভাই মুসার সৈন্যদের হাতে।

সুলতান প্রথম বায়েজিদের চার পুত্রের মধ্যে সুলায়মান ও ইসার মৃত্যুর পর বেঁচে থাকেন দুজন–মুসা ও মুহাম্মদ। এবার দ্বন্দ্ব শুরু হয় এ দুজনের মধ্যে। মুসা বিশ্বাসঘাতকতা করেন তাঁর ভাই মুহাম্মদের সঙ্গে। ইউরোপের সার্বিয়া, হাঙ্গেরিসহ কয়েকটি অঞ্চল জয় করে নেন মুসা। এরপর ভাই মুহাম্মদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘোষণা দিয়ে তিনি একাই সৈন্যদের নিয়ে এগিয়ে যান ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চল অভিমুখে। এমনকি তিনি কিছু সৈন্য নিয়ে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করে বসেন। এ পর্যায়ে বাইজেন্টাইন সম্রাট দুই ভাইয়ের বিরোধকে দারুণভাবে কাজে লাগালেন। তিনি মুহাম্মদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন মুসার অবরোধ উঠিয়ে নিতে।

Scanned with CamScanner

বাইজেন্টাইন সম্রাটের অনুরোধে সাড়া দিয়ে ছুটে আসেন মুহাম্মদ। আপন ভাই মুসার সৈন্যদের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ হয় মুহাম্মদের সৈন্যদের। বাধ্য হয়ে অবরোধ তুলে নেন মুসা। বাইজেন্টাইন সম্রাট এবং সার্বিয়ার শাসকের সঙ্গে চক্রান্ত করে মুসার সৈন্যদের মধ্যে অবিশ্বাস ও বিশ্বাসঘাতকতা ছড়িয়ে দেন মুহাম্মদ। নিজের লোকদের হাতে আটক হন মুসা। তাঁকে ধরে নিয়ে আসা হয় তাঁর ভাই মুহাম্মদের সামনে। মুসাকে হত্যার আদেশ করেন মুহাম্মদ। ভাইয়ের রক্তে শেষবারের মতো লাল হলো মুহাম্মদের হাত। সময়ের খাতায় তখন ১৪১৩ সাল।

একে একে সব ভাইকে হত্যা করে উসমানি সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অধিষ্ঠিত হন তিন ভাইয়ের হত্যাকারী পঞ্চম উসমানি সুলতান মুহাম্মদ জালাবি।

সুদীর্ঘ ১০ বছর ধরে চলে চার ভাইয়ের এ লড়াই। ফলে উসমানি সাম্রাজ্যের সিংহাসনে তখন একক কোনো সুলতান ছিলেন না। উসমানিদের পতন পর্যন্ত এমন দুর্যোগপূর্ণ অন্ধকার সময় আর কখনো আসেনি।

সুলতান মুহাম্মদ জালাবিকে উসমানি সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় জনক হিসেবে ধরা হয়। কারণ, তাতারদের লুটপাট ও তাণ্ডবের পর বিচ্ছিন্ন ও বিধ্বস্ত উসমানি সাম্রাজ্য তাঁর নেতৃত্বে আবারও আগের ধারাবাহিকতায় ফিরে আসতে শুরু করে।

সুলতান মুহাম্মদের শাসনামলে হঠাৎ করেই উদয় হন তাঁর বড় ভাই শাহজাদা মুস্তফা। ১৬ বছর নিখোঁজ থাকার পর শাহজাদা মুস্তফার উপস্থিতি উসমানি সাম্রাজ্যে কৌতূহল ও বিস্ময়ের জন্ম দেয়। এ দীর্ঘ সময় তিনি কোথায় ছিলেন, তা আজও রহস্যময়।

শাহজাদা মুস্তফা উসমানি সাম্রাজ্যের দৃশ্যপটে ফিরে এসে সিংহাসনের দাবি করে বসেন। বয়সে তিনি তৎকালীন সুলতান মুহাম্মদের চেয়ে বড়, কাজেই তাঁর দাবির ভিতও বেশ শক্ত। তাঁর পেছনে প্ররোচনা দেয় বাইজেন্টাইন এবং অন্যান্য কিছু বিদেশি গোষ্ঠী।

শাহজাদা মুস্তফা তাঁর ভাই সুলতান মুহাম্মদের বিরুদ্ধে কিছু সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের ডাক দেন। কিন্তু তত দিনে পুরো সাম্রাজ্য সুলতান মুহাম্মদের কঠিন নিয়ন্ত্রণে। ফলে যুদ্ধের শুরুতেই পরাজিত হয় শাহজাদা মুস্তফার বাহিনী। পালিয়ে তিনি আশ্রয় নেন বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে।

সুলতান মুহাম্মদ বড় ভাইয়ের চক্রান্ত থেকে নিস্তার পেতে সন্ধি করেন বাইজেন্টাইন সম্রাটের সঙ্গে। সুলতান মুহাম্মদ বাইজেন্টাইন সম্রাটকে একটি

Scanned with CamScanner

প্রস্তাব পাঠান। এতে তিনি বলেন, শাহজাদা মুস্তফাকে যদি বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে আটক রাখা হয়, তবে প্রতিবছর উসমানি সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে এ বাবদ তিন লাখ স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হবে বাইজেন্টাইন সম্রাটকে। এ প্রস্তাবে সম্মতি দেন বাইজেন্টাইন সম্রাট দ্বিতীয় ইমানুয়েল। বড় ভাইকে আটকে রেখে ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থপ্রাপ্তির এমন সুবর্ণ সুযোগ কে হেলায় হারাতে চায়!

২৪টি যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন সুলতান মুহাম্মদ জালাবি। সুলতান হওয়ার পরও তাঁর শরীরজুড়ে ৪০টি আঘাতের আলামত ছিল। তাঁর দক্ষতা ও দূরদর্শিতায় উসমানি সাম্রাজ্য আগের প্রভাব ও শক্তি ফিরে পায়। ৩৯ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জীবনীকারকদের ভাষায়, তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল এবং অটল ও ধর্মানুরাগী ব্যক্তিত্ব। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সামরিক দূরদর্শিতায় তাঁর মেধার কাছে হেরে যান অন্য চার ভাই।

১৪২১ সালে কঠিন অসুখে আক্রান্ত হন সুলতান মুহাম্মদ। রক্ত ডায়রিয়া তাঁকে দুর্বল করে দেয়। সিংহাসন ছেড়ে তিনি অবশ হয়ে পড়েন বিছানায়। সুলতান বুঝতে পারেন, তাঁর শেষ সময় খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। এ সময় তিনি তাঁর পুত্র মুরাদের উদ্দেশে একটি চিঠি লেখেন। এতে তিনি তাঁর শারীরিক দুর্বলতার কথা জানিয়ে তাঁকে ভবিষ্যতের সুলতান হিসেবে ঘোষণা দেন। মুরাদ তখন আমাসিয়া অঞ্চলের শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

কিছুদিন পর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন সুলতান মুহাম্মদ। কিন্তু সেনাবাহিনী ও সাধারণ মানুষের কাছে সুলতানের মৃত্যুসংবাদ গোপন রাখা হয়। সুলতানের অন্তঃপুর ও দরবারের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন ছাড়া সুলতানের মৃত্যুসংবাদ আর কারও জানা ছিল না। সুলতানের পুত্র মুরাদ তখনো আমাসিয়ায়, ফলে তাঁর আসা পর্যন্ত সুলতানের লাশ দাফন না করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন দিওয়ানের উচ্চপদস্থ উজির এবং অন্যরা।

উসমানি সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী শাহজাদা মুরাদের ফিরে আসা পর্যন্ত প্রতিদিন দরবারের কাজকর্ম আগের মতোই চলত। সৈন্য ও সাধারণ মানুষকে জানানো হতো, সুলতান অসুস্থ এবং তিনি বিশ্রামে আছেন। সুলতানের মৃত্যুর কিছুদিন পর দরবার থেকে উসমানি সৈন্যদের একটি দলকে নির্দিষ্ট অঞ্চলে অভিযানে অংশ নেওয়ার আদেশ জারি করা হয়। সৈন্যরা যুদ্ধযাত্রার সব প্রস্তুতি চূড়ান্ত করার পর জানায়, সুলতানকে একনজর না দেখে তারা যুদ্ধের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করবে না।

Scanned with CamScanner

সৈন্যদের এমন দাবিতে বিপাকে পড়ে যান দরবারের কর্তাব্যক্তিরা। তাঁরা সৈন্যদের জানান, সুলতান খুবই অসুস্থ এবং কাউকে দর্শন দেওয়া এ মুহূর্তে তাঁকে বিরক্ত করার নামান্তর। কিন্তু কোনোভাবেই সৈন্যরা সুলতানকে না দেখে যুদ্ধে যেতে রাজি হচ্ছিল না।

একপর্যায়ে নিরুপায় হয়ে ভিন্ন কৌশল গ্রহণ করেন দরবারের কয়েকজন উজির। তাঁরা সৈন্যদের জানিয়ে দেন, আগামীকাল সকালে সুলতান তাঁর প্রাসাদের জানালায় কিছুক্ষণ বসে থাকবেন। সৈন্যরা সে সময় প্রাসাদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করবে এবং সুলতানকে একনজর দেখার সুযোগ পাবে।

পরদিন সকালে সুলতানের লাশ প্রাসাদের একটি উঁচু জানালার পাশে চেয়ারে বসানো হয়। লাশের পেছনে একজন উজির আড়ালে বসেন। তিনি পেছন থেকে সুলতানের হাত নাড়াতে থাকেন। জানালার সামনে দিয়ে সেনাবাহিনীর সদস্যরা সুলতানকে দেখে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। দীর্ঘদিন পর সুলতানের অবয়ব ও তাঁর হাত নাড়ানো দেখে সৈন্যদের মধ্যে উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়ে। তারা সেদিনই নির্দিষ্ট যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশে রওনা করে।

সুলতান মুহাম্মদের মৃত্যুসংবাদ ৪১ দিন গোপন রাখা হয়। তাঁর পুত্র মুরাদ এসে পৌঁছানোর পর সুলতানের মৃত্যুসংবাদ প্রচার করা হয়। এরপর উসমানি সাম্রাজ্যের নতুন সুলতান হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন ১৮ বছর বয়সী তরুণ সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ।

Scanned with CamScanner

কীর্তিমান সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ

উসমানি সাম্রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছে সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ কবি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর পিতার নাম সুলতান প্রথম মুহাম্মদ এবং মায়ের নাম আমেনা খাতুন। ১৪০৪ সালে আমাসিয়ায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

১৪২১ সালে পিতা সুলতান প্রথম মুহাম্মদের মৃত্যুর ৪১ দিন পর তিনি উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতান হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। সুলতান হিসেবে উসমানি সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণের পর সুলতান মুরাদ তাঁর চাচা মুস্তফার ষড়যন্ত্রের শিকার হন। বাইজেন্টাইন সম্রাটের প্ররোচনা ও সহযোগিতায় মুস্তফা আদিরনা শহরে আসেন এবং সেখানে নিজেকে সুলতান হিসেবে ঘোষণা দেন। একদল সৈন্য নিয়ে তিনি রাজধানী বোর্সা অভিমুখে রওনা হন ভাতিজা সুলতান মুরাদকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে। এ খবর পেয়ে সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ তাঁর সৈন্যদের প্রস্তুত করেন এবং চাচাকে পরাজিত করে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন।

এরপর বিদ্রোহ ঘোষণা করেন সুলতান মুরাদের ছোট ভাই। এজনিক শহরে তিনি নিজেকে সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন। সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ সেখানে ছুটে যান এবং ছোট ভাইয়ের সব ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে তাঁকে হত্যা করেন।

৪০ বছর বয়সে পৌঁছে সাম্রাজ্য পরিচালনায় ক্লান্ত হয়ে পড়েন সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ। ১৪৪৪ সালের আগস্ট মাসে তিনি ১৪ বছর বয়সী পুত্র দ্বিতীয় মুহাম্মদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেন। এ সময় মানিসা শহরে চলে যান এবং সেখানে ইবাদত ও সাধনায় মগ্ন হন।

সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ ক্ষমতা ছেড়ে আরাধনায় লিপ্ত, উসমানি সাম্রাজ্যের নতুন সুলতান তাঁর শিশুপুত্র–এমন সংবাদে ইউরোপের খ্রিষ্টান জগতে উল্লাস ছড়িয়ে পড়ে। খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় গুরু পোপের তৎপরতায় উসমানিদের দমনে ঐক্যবদ্ধ বাহিনী গঠন করে ইউরোপের কয়েকটি দেশ। হাঙ্গেরি, জার্মানি, ফ্রান্স, ভেনিস, বাইজেন্টাইনসহ অন্যান্য দেশ ও অঞ্চল একসঙ্গে উসমানিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পূর্ণ প্রস্তুতি নেয়।

Scanned with CamScanner

উসমানি সাম্রাজ্যে এ সময় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শিশু সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ কীভাবে নেতৃত্ব দেবেন এ শক্তি মোকাবিলায়, এ নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভোগেন উজির ও সেনাবাহিনীর নেতারা। ছদরে আজম জান্দারলি জাদা খলিল পাশার পরামর্শে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সুলতান দ্বিতীয় মুরাদকে ফিরিয়ে আনতে হবে যেকোনোভাবে। নইলে আসন্ন বিপদ ঠেকানো প্রায় অসম্ভব।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৪৪৪ সালে আবারও উসমানি সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসে হাল ধরেন সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ। ৪০ হাজার সৈন্যের সুসজ্জিত উসমানি বাহিনী নিয়ে তিনি আদিরনা অভিমুখে রওনা হন এবং এরপর আরও সামনে এগিয়ে দুর্বার আক্রমণে খ্রিষ্টান বাহিনীকে লন্ডভন্ড করে দেন। এমন অবিশ্বাস্য বিজয়ে পুরো সাম্রাজ্যে আনন্দময় স্বস্তি ফিরে আসে। এ যুদ্ধে উসমানি বাহিনীর মাত্র ১৫০ জন সৈন্য শহীদ হন, এর বিনিময়ে মুখ থুবড়ে পড়ে সম্মিলিত ইউরোপীয় বাহিনী।

শত্রুদের পরাজিত করে উসমানি সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ। ১৪৪৫ সালে দ্বিতীয়বারের মতো তিনি পুত্র মুহাম্মদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। কিন্তু দরবারের সভাসদ ও ইঙ্কেশারি বাহিনীর সৈন্যরা সুলতানের পদত্যাগ মেনে নেয়নি। তাদের উপর্যুপরি চাপে সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ আবারও সিংহাসনে বসে ক্ষমতার হাল ধরতে বাধ্য হন।

১৪৪৬ সালে তৃতীয়বারের মতো উসমানি সুলতান হিসেবে অধিষ্ঠিত হন তিনি। এ সময় আবারও শক্তি সঞ্চয় করে উসমানি সাম্রাজ্য নির্মূল করতে সক্রিয় হয় ইউরোপীয় শক্তি। সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ এবারও তাদের সব চক্রান্ত ভণ্ডুল করে দেন।

১৪৫১ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৯ বছর। মোট ৩০ বছর তিনি উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতান হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শহরবাসীর শেষ আশ্রয়

সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ চারিত্রিক গুণে অন্য সুলতানদের চেয়ে ব্যতিক্রমধর্মী ছিলেন। সুলতানি ব্যস্ততার চেয়ে কাব্যচর্চা ও ইবাদত বন্দেগিতে বেশি আনন্দ খুঁজে পেতেন। উসমানি সুলতানদের ইতিহাসে তিনিই একমাত্র সুলতান, যিনি তাঁর পুত্রের জন্য দুবার স্বেচ্ছায় ক্ষমতা থেকে পদত্যাগ করেন।

সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের ক্ষমতা গ্রহণের পর ধীরে ধীরে উসমানি সাম্রাজ্যের অশান্ত অঞ্চলগুলোয় শান্তিশৃঙ্খলা ফিরে আসে। অভ্যন্তরীণ

Scanned with CamScanner

বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ কমে আসায় প্রথমে বিদ্রোহীদের হাত থেকে সালানিক শহরটি পুনরুদ্ধারে আগ্রহী হলেন সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ। তবে সামরিক অভিযানের আগে দুই পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেন তিনি।

প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সালানিক দখলকারী শাসকের কাছে উপহারসহ দূত পাঠালেন সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ। দূতের মাধ্যমে সালানিক অঞ্চলটি উসমানি সাম্রাজ্যে ফিরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ বার্তা পাঠান তিনি। সুলতানের দূতের জবাবে সালানিকের দখলদার গোষ্ঠীও দূত পাঠায়। এভাবে দূতের আনাগোনার মাধ্যমে আলাপ-আলোচনা শুরু হলো দুই পক্ষের মধ্যে।

দিন পেরিয়ে যায়, সমস্যার কোনো সুরাহা হয় না। সালানিক অঞ্চলটি উসমানিদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার কোনো আভাস মিলছে না সালানিক দখলদারের কাছ থেকে। একপর্যায়ে সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ বুঝতে পারলেন, দূত চালাচালি করে অযথা সময় নষ্ট করছে সালানিকের দখলদারেরা।

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল সুলতানের। সালানিকের পক্ষ থেকে পাঠানো সর্বশেষ প্রতিনিধিদলের নেতাকে সুলতান সাফ জানিয়ে দিলেন, 'দেখো, আমাদের পূর্বসূরিরা সালানিক জয় করেছিলেন এবং এটি উসমানি সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। ফলে ওই অঞ্চলে কোনো বিদেশি সৈন্যের প্রবেশ এবং দখলদারের শাসন আমরা মেনে নেব না। সুতরাং, তোমরা যদি সালানিক ছেড়ে স্বেচ্ছায় চলে না যাও, তবে আমি সৈন্যদের নিয়ে তোমাদের জোর করে সেখান থেকে বের করে দিতে বাধ্য হব।'

এর পরও কয়েক মাস অপেক্ষা করেন সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ। কিন্তু কোনো উত্তর আসেনি প্রতিপক্ষের কাছ থেকে। একপর্যায়ে সামরিক অভিযানের জন্য সেনাবাহিনীকে প্রস্তুতির আদেশ দেন সুলতান।

১৪৩১ সালে নৌপথে সালানিক অভিমুখে রওনা হয় উসমানি সৈন্যরা। কিছুদূর যেতেই গালিবুলিতে উসমানি নৌবহর মুখোমুখি হয় সালানিকের দখলদার বন্দুকিয়ার নৌসেনাদের। দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। উসমানি সেনাদের প্রবল আক্রমণের মুখে বন্দুকিয়ার বাহিনী পরাজয় স্বীকার করে পিছু হটে।

সুলতান সব বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে সালানিকে পৌঁছালেন এবং শহর অবরোধ করলেন। পরে সামরিক অভিযানে বন্দুকিয়ার শাসক ও সেনাদের পরাজিত করে বিজয়ীর বেশে শহরে প্রবেশ করলেন সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ ও

Scanned with CamScanner

উসমানি সেনারা। দীর্ঘদিন পর আবারও সালানিক শহরটি উসমানি মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়।

সালানিক জয়ের পর সুলতান মুরাদ সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেন। এ সময় তাঁর কাছে পার্শ্ববর্তী ইয়ানিয়া শহর থেকে খ্রিষ্টানদের একটি প্রতিনিধিদল আসে। হঠাৎ খ্রিষ্টানদের প্রতিনিধিদলের আগমনে অবাক হন উসমানি দরবারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা। কারণ, ইয়ানিয়া শহর তখন ইতালির নিয়ন্ত্রণে এবং এদের সঙ্গে উসমানিদের কোনো সম্পর্ক নেই।

সেকালে ইয়ানিয়া শহরের শাসক ছিল ইতালির টোকো পরিবার। ১৪৩০ সালে সেখানকার শাসক দ্বিতীয় কার্লোতোকোর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ক্ষমতা গ্রহণ করেন। কিন্তু এ নিয়ে শাসক পরিবারে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। এর প্রভাব পড়ে ইয়ানিয়া শহরে। শাসক পরিবারের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতায় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে ইয়ানিয়া শহরবাসী। ফলে যখন তারা জানতে পারে, উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সালানিকে অবস্থান করছেন, তখন এ প্রতিনিধিদল পাঠায় শহরবাসী।

ইয়ানিয়া শহরের গুণী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিনিধিদলটি সালানিকে পৌঁছে সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি চায়। সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ তাদের অনুমতি দেন। সুলতানকে সম্মান জানিয়ে প্রতিনিধিদলের নেতা বললেন, 'মহামান্য সুলতান! শহরবাসীর পক্ষ থেকে আপনার কাছে আমরা একটি আরজি নিয়ে এসেছি। আমি সেই আরজি পেশ করার অনুমতি চাইছি।'

'অনুমতি দেওয়া হলো। তোমাদের আরজি বলো।'

'আমরা ইয়ানিয়া শহরের বাসিন্দা। আমাদের শাসকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও কলহ চলছে। এর মাশুল দিতে হচ্ছে আমাদের। জোর করে তারা আমাদের সন্তানদের যুদ্ধে নিয়ে যায়। আমাদের সঙ্গে শাসকদের আচরণ দাসের সঙ্গে মালিকের মতো। এই লাঞ্ছনা ও অশান্তি থেকে আমরা মুক্তি চাই। আপনার সহযোগিতা আমাদের প্রয়োজন।'

'শাসক পরিবারের সঙ্গে এটা তোমাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যা। আমি কীভাবে সহযোগিতা করব তোমাদের?'

'মাননীয় সুলতান! আমরা খ্রিষ্টান। আপনার শাসনসীমার বাইরে আমাদের অবস্থান। কিন্তু আমাদের পর্যটক ও বিদেশি ব্যবসায়ীদের মুখে আপনার গুণ সম্পর্কে আমরা জেনেছি। প্রজাদের প্রতি আপনার ন্যায়পরায়ণতার কথা আমরা শুনেছি। আমরা চাই, আপনি আমাদের শহরের

Scanned with CamScanner

নিয়ন্ত্রণ নেন। এ ব্যাপারে আমরা আপনাকে সব ধরনের সাহায্য করব। আপনার ছায়ায় আমরা অত্যাচারী শাসক পরিবারের অন্যায় আচরণ থেকে মুক্তি পাব।'

এরপর প্রতিনিধিদলের সদস্যরা সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের হাতে শহরটির সোনালি চাবি তুলে দিল। প্রতীকী অর্থে সুলতানের হাতে শহরের নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তর করল তারা।

ইয়ানিয়া শহরবাসীর অনুরোধ ফিরিয়ে দেননি সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ। উসমানি সেনাবাহিনীর একজন সেনাপতিকে কিছু সৈন্যসহ পাঠিয়ে দেন শহরের নিয়ন্ত্রণ নিতে।

১৪৩১ সালে উসমানি সেনাদের বদৌলতে ইয়ানিয়া শহরবাসী মুক্তি পেল তাদের শাসকদের অত্যাচার ও দুঃশাসন থেকে।

ইউরোপীয় শত্রুদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে তাদের সঙ্গে সন্ধি করেন উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ। এরপর আনাতোলিয়ায় ফিরে এসে পুত্র শাহজাদা আলার মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে পড়েন সুলতান। এ শোকে তাঁর মনোজগতে পরিবর্তন দেখা দেয়। সাম্রাজ্য পরিচালনার ব্যস্ততা আর সুলতানি জীবনযাপন ছেড়ে নীরব সাধনায় মনোযোগী হন তিনি। আরেক পুত্র দ্বিতীয় মুহাম্মদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে তিনি নীরব সাধনায় নিমগ্ন হন।

মাত্র তিন মুরিদ

সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ আঙ্কারা শহরের একজন দরবেশকে শ্রদ্ধা করতেন। এই দরবেশের নাম হাজি বাইরাম। তিনি ছিলেন একাধারে একজন প্রাজ্ঞ পণ্ডিত, বিখ্যাত সাধক ও দুনিয়াত্যাগী দরবেশ।

তাঁর প্রতি সুলতানের ভালোবাসা ও সম্মান এত গভীর ছিল যে, তিনি হুকুম জারি করেছিলেন, হাজি বাইরামের কোনো মুরিদের কাছ থেকে সুলতানি রাজস্ব আদায় করা হবে না। আঙ্কারা শহরের গভর্নরের কাছে তিনি এই আদেশ পাঠিয়েছিলেন।

সুলতানের এমন আদেশ শুনে শহরবাসীর অনেকে হাজি বাইরামের মুরিদ হিসেবে দাবি করা শুরু করল। রাজস্ব দেওয়া থেকে মুক্তি পেতে হাজি বাইরামের মুরিদ হিসেবে নিজেকে পরিচয় দেওয়ার সুযোগ কাজে লাগাতে শুরু করল সুবিধাবাদী শহরবাসী।

Scanned with CamScanner

পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে দাঁড়াল যে, শহরের খাজনা আদায়কারী কর্মকর্তারা কারও কাছ থেকে খাজনা নিতে পারছিলেন না। রাজস্বের জন্য গেলেই লোকেরা দাবি করত, আমরা হাজি বাইরামের মুরিদ। কর্মকর্তারা খালি হাতে ফিরে আসতে বাধ্য হতেন তখন। হাজি বাইরামের কোনো মুরিদের কাছ থেকে রাজস্ব না নেওয়ার ব্যাপারে সুলতানের আদেশ অমান্য করার দুঃসাহস কার আছে!

বাধ্য হয়ে একদিন খাজনা বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা সুলতানের দরবারে হাজির হলেন। সুলতানের কাছে আরজ করলেন, 'মহামান্য সুলতান, আঙ্কারা শহরের কেউ এখন আর রাজস্ব দিচ্ছে না।'

সুলতান ভ্রু কুঁচকে জানতে চাইলেন, কেন?

প্রধান কর্মকর্তা পুরো পরিস্থিতি তুলে ধরলেন সুলতানের সামনে, 'হাজি বাইরামের মুরিদদের ব্যাপারে আপনার আদেশ শুনে প্রত্যেকে এখন নিজেকে হাজি বাইরামের মুরিদ হিসেবে পরিচয় দিচ্ছে। ফলে আমাদের কর্মকর্তারা খালি হাতে ফিরে আসছে।'

সুলতান জানতে চাইলেন, আঙ্কারা শহরের সবাই নিজেদের হাজি বাইরামের মুরিদ দাবি করছে?

–জি জাহাঁপনা, সবার দাবি, তারা হাজি বাইরামের মুরিদ।

সুলতান বুঝলেন, তাঁর আদেশের সুযোগ কাজে লাগাতে লোকজন এখন হাজি বাইরামের নাম ব্যবহার করে রাজস্ব ফাঁকি দিচ্ছে।

–এ পরিস্থিতিতে কীভাবে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী পার্থক্য করা যায়, এ ব্যাপারে মহান সুলতানের দিকনির্দেশনার মুখাপেক্ষী আমরা।

সুলতান বললেন, 'ব্যাপারটা কঠিন, তবে আমি হাজি বাইরামের কাছে পত্র পাঠাচ্ছি। তিনি এর সুরাহা করে দেবেন।'

সুলতানের দূত পত্র নিয়ে হাজি বাইরামের কুটিরে উপস্থিত হলেন। সুলতানের পাঠানো পত্র তুলে দেওয়া হলো তাঁর হাতে।

হাজি বাইরাম সুলতানের চিঠি পড়লেন। তারপর সামনে বসা মুরিদদের মধ্যে একজনকে ডেকে বললেন, 'আঙ্কারা শহরে ঘোষণা করে দাও, আমি আমার সব মুরিদকে একদিন একসঙ্গে দেখতে চাই। শহরের একটি বড় মাঠে তাদের সমবেত হওয়ার ব্যবস্থা করো। সবাইকে বলে দাও, যারা আমার মুরিদ, তাদের কেউ যেন সেদিন অনুপস্থিত না থাকে।'

Scanned with CamScanner

আজারা শহরের সব অলিগলিতে প্রচার করা হলো হাজি বাইরামের এলান। নির্ধারিত দিনে আজারা শহরের সবাই এসে জড়ো হলো, কানায় কানায় ভরে গেল পুরো ময়দান।

হাজি বাইরাম ওই মাঠের এক কোনায় একটি তাঁবুর ভেতর অপেক্ষা করছিলেন। পুরো মাঠ লোকে লোকারণ্য হওয়ার পর তিনি বের হয়ে সবার সামনে এলেন। এরপর ঘোষণা করলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে আমাকে পীর হিসেবে মানে এবং আমাকে তার শায়খ হিসেবে দাবি করে, সে যেন আমার সঙ্গে এই তাঁবুর ভেতরে আসে। আমি আল্লাহর নামে তাকে জবাই করে উৎসর্গ করব। তার রক্ত তাঁবুর বাইরে প্রবাহিত হবে এই উৎসর্গের সাক্ষী হিসেবে।'

দরবেশের এমন ঘোষণায় আকস্মিক স্তব্ধতা নেমে এল মাঠজুড়ে। হাসি হারিয়ে গেল মাঠভর্তি মুরিদদের মুখ থেকে।

হাত তুলে একজন যুবক এগিয়ে এল। তাঁর কণ্ঠে শোনা গেল, 'আমি প্রস্তুত হে শায়খ, আমাকে গ্রহণ করুন আল্লাহর জন্য।' হাজি বাইরাম যুবকটির হাত ধরে তাঁবুর ভেতরে নিয়ে গেলেন। পর্দার ভেতর চলে যাওয়ার পর আগে থেকে সেখানে রাখা একটি ছাগল জবাই করতে বললেন তিনি। যুবকটিকে বললেন, এক কোনায় চুপচাপ বসে থাকো। যুবকের পরিণতি নিয়ে সবাই যখন শঙ্কায়, তখন তাদের সামনে এক গামলাভর্তি রক্ত ফেলা হলো।

লাল রক্তের এমন দৃশ্য দেখে মুরিদদের ভেতর ভয় ছড়িয়ে পড়ল। হাজি বাইরাম আবার বাইরে এসে ঘোষণা করলেন, 'আমি আল্লাহর নামে আমার একজন মুরিদকে জবাই করে উৎসর্গ করতে চাই। তোমাদের মধ্যে যে আমাকে প্রকৃতভাবে পীর হিসেবে মানো, সামনে এগিয়ে এসো।'

ভিড় ভেঙে লাব্বাইক বলে এগিয়ে এল আরেকজন যুবক। হাত উঁচিয়ে বলল, 'আমি প্রস্তুত হে শায়খ।'

হাজি বাইরাম তার হাত ধরে ভেতরে গেলেন। আগের মতো আরেকটি ছাগল জবাই করা হলো ভেতরে। এবারও রক্ত ফেলা হলো তাঁবুর বাইরে উপস্থিত জনতার সামনে।

রক্তে ভেসে যাচ্ছে তাঁবুর আঙিনা। ততক্ষণে বদলে গেছে পরিবেশ। ভিড়ের পেছন থেকে অনেকেই তখন যার যার বাড়ির পথ ধরছে।

হাজি বাইরাম বাইরে এসে আবারও আগের ঘোষণা দিলেন। কিছুক্ষণ নীরবতার পর এবার এগিয়ে এলেন একজন নারী। হাত উঁচু করে তিনি বললেন, 'আমি তৈরি, আমাকে গ্রহণ করুন আল্লাহর নামে।'

Scanned with CamScanner

হাজি বাইরাম তাঁকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। এক কোনায় বসতে বলে তৃতীয় ছাগল জবাই করতে আদেশ দিলেন। তৃতীয়বারের মতো রক্ত ছুড়ে ফেলা হলো তাঁবুর বাইরে।

এবার আর দেরি করল না কেউ। লোকজন দলে দলে নিজেদের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফাঁকা হয়ে গেল পুরো ময়দান।

পরদিন হাজি বাইরাম সুলতানকে চিঠি পাঠালেন। তাতে তিনি লিখেছেন, 'আঙ্কারা শহরে আমার মাত্র তিনজন মুরিদ। দুজন যুবক এবং একজন নারী।'

সুলতানের অসিয়ত

মৃত্যুশয্যায় জীবনের শেষ মুহূর্ত পার করছেন সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ। তাঁকে ঘিরে আছেন পরিবারের ঘনিষ্ঠজনেরা। পরপারে যাত্রার আগে সবাইকে উপদেশ দিচ্ছেন মৃত্যুপথযাত্রী সুলতান। পরিবারের সদস্য, দরবারের সভাসদ ও সাম্রাজ্যের সাধারণ মানুষের মনে বিষাদের ছায়া।

বিষণ্ন নীরবতা ভেঙে অস্ফুট কণ্ঠে উজির ইসহাক পাশাকে ডেকে পাঠালেন সুলতান। তখনই হাজির হলেন উজির। সুলতান তাঁকে বললেন, 'ইসহাক, সবাইকে আমার অসিয়তবাণী পড়ে শোনাও।'

সুলতানের আদেশে ইসহাক পাশা তাঁর পকেটে থাকা সুলতানের অসিয়ত বের করলেন। তারপর পড়ে শোনাচ্ছেন সবাইকে, 'পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। সব প্রশংসা জগতের মহান প্রতিপালকের জন্য। দরুদ ও সালাম মহান নেতা এবং নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানে উৎসর্গিত এবং তাঁর সাহাবিদের শানে নিবেদিত। মহান আরশের অধিপতি আল্লাহর ওপর আমি ভরসা করছি। প্রত্যেক আত্মাকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। দুনিয়ার এই জীবন যেন তোমাদের ধোঁকায় না ফেলে সেদিকে সতর্ক থেকো। আল্লাহর ব্যাপারে তোমরা কখনো ধোঁকায় পড়ো না।

'আমি তোমাদের অসিয়ত করছি, সারুহান প্রদেশে থাকা আমার সম্পত্তি থেকে এক-তৃতীয়াংশ বা ৩ হাজার ৫০০ স্বর্ণমুদ্রা পবিত্র মক্কায় বসবাসকারী গরিব ও অসহায় ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করবে। এ ছাড়া আরও ৩ হাজার ৫০০ স্বর্ণমুদ্রা পবিত্র মদিনা নগরীর দুস্থদের মধ্যে ভাগ করে দেবে। পবিত্র মক্কার মসজিদুল হারামে কোরআন তেলাওয়াত শেষে ৭০ হাজার বার কালেমা তাইয়্যেবা পাঠ করে যারা আমার নামে সওয়াব উৎসর্গ করবে, তাদের ৫০০ স্বর্ণমুদ্রা দান করবে। পবিত্র মসজিদে আকসায় যারা বেশি বেশি কোরআন

Scanned with CamScanner

তেলাওয়াত করে এবং কালেমা তাইয়্যেবার জিকির করে, তাদের মধ্যে আমার সম্পত্তি থেকে ২ হাজার ৫০০ স্বর্ণমুদ্রা বণ্টন করবে।'

সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের শাসনামলে পবিত্র মক্কা ও মদিনা এবং মসজিদে আকসা উসমানি সাম্রাজের অন্তর্গত হয়নি। তবু জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এই তিন পবিত্র মসজিদের প্রতিবেশীদের জন্য সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের এ দান ও নিবেদন উসমানি সুলতানদের হৃদয়ে মক্কা ও মদিনা এবং ফিলিস্তিনে মসজিদে আকসার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার প্রমাণ।

Scanned with CamScanner

মহানায়ক সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহ্

'তাঁকে খুব কম হাসতে দেখা যেত। তাঁর প্রচণ্ড মেধা সব সময় সতর্ক। একদিকে তিনি যেমন বিনয়ী, তেমনিভাবে তিনি তেজোদ্দীপ্ত ও কঠোর। শীত ও গরম এবং ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্য করার বেলায় তাঁর জুড়ি নেই। তিনি যা বলেন, তা করেন। কাউকে তিনি পরোয়া করেন না। অনর্থক কাজ থেকে তিনি দূরে সরে থাকেন। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় তিনি বইয়ের ভেতর ডুবে থাকেন।'

ইতালির জর্জ ডলফিনের লেখা এই কয়েকটি লাইনে যে চিত্র পাঠকের কল্পনায় ভেসে ওঠে, সেটাই সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহের চেহারা ও চরিত্র। কনস্টান্টিনোপল জয়ে সুলতান মুহাম্মদের দুর্ধর্ষ সাহসিকতা ও ক্ষিপ্রতা যেমন তাঁর অনমনীয় ও আপসহীন মনোভাবের প্রতীক, তেমনি এই শহর জয়ের পর সেখানকার সব খ্রিষ্টান ও ইহুদির নিরাপত্তা প্রদান এবং তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখা তাঁর উদার মনোভাবের অনন্য পরিচয় বহন করে।

উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতানদের ধারাবাহিকতায় তিনি সপ্তম সুলতান। এর চেয়েও বড় পরিচয়, তিনি বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল জয়ের মহানায়ক। শত শত বছর আগে নবিজি (সা.) সুসংবাদ দিয়েছিলেন, 'কনস্টান্টিনোপল অবশ্যই বিজিত হবে মুসলমানদের হাতে। কত না উত্তম ওই বিজয়ের সেনাপতি, আর কত না উত্তম বাহিনী সেই বাহিনী'। (মুসনাদে আহমদ)

১৪২৯ সালের ২০ এপ্রিল আদিরনা শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সে সময় এই শহর ছিল উসমানি সাম্রাজ্যের রাজধানী।

মাত্র ১১ বছর বয়সে তিনি পিতার পক্ষ থেকে আমাসিয়ার শাসক হিসেবে মনোনীত হন। রাষ্ট্র পরিচালনায় পুত্র যেন দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সবক নেন, সে জন্য পিতা সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের এই সিদ্ধান্ত। পিতার মৃত্যুর পর ১৪৫১ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি উসমানি সাম্রাজ্যের অধিপতি হিসেবে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। সে সময় তাঁর বয়স মাত্র ২২ বছর। সুলতান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর সর্বপ্রথম তিনি আপন ভাই আহমদকে হত্যা করেন।

Scanned with CamScanner

সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহের হাতে উসমানি সাম্রাজ্যের প্রাণশক্তি নতুন করে জেগে ওঠে। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শায়খ শামসউদ্দীন ছিলেন সুলতানের শৈশবকালীন শিক্ষক ও গুরু সমতুল্য। তিনি ছিলেন এই তরুণ সুলতানের মানসিক শক্তি ও উদ্দীপনার অমূল্য উৎস।

সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহ এই শিক্ষকের কাছে ইসলামি শরিয়ত, অঙ্কশাস্ত্র, ইতিহাস, যুদ্ধবিদ্যাসহ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি গভীর টান ছিল সুলতানের। তুর্কি ভাষার পাশাপাশি তিনি আরবি, ফরাসি, হিব্রু, ফারসি, গ্রিক, ল্যাটিন ও সার্বিয়া ভাষায় কথা বলতে পারতেন।

১৪৮১ সালের ৩ মে মৃত্যুবরণ করেন সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ আলফাতেহ। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। দীর্ঘ ৩১ বছর ধরে চলা তাঁর শাসনামলে তিনি উসমানি সাম্রাজ্যকে নিয়ে যান শৌর্যবীর্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তির শীর্ষচূড়ায়।

কনস্টান্টিনোপল বিজয়

সুলতান মুহাম্মদ ১৪৫৩ সালের ৬ এপ্রিল ইঙ্কেশারি বাহিনীর ১২ হাজার সদস্যসহ এক লাখের বেশি সৈন্য নিয়ে কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন আকারের ৩২০টি রণতরি ছিল।

কনস্টান্টিনোপল শহরটি আকৃতিতে ত্রিকোনাকার। এর দুদিক ছিল সাগর দ্বারা বেষ্টিত এবং একদিক ছিল দুই দেয়াল ও গভীর পরিখা দিয়ে সুরক্ষিত। সুলতানের তিনটি কামান ও ১৪টি ব্যাটারি একসঙ্গে শহরকে লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ শুরু করে। উসমানি সেনারা বারবার শহরের পরিখা পার হওয়ার চেষ্টা করছিল, কিন্তু গ্রিকদের শক্তিশালী প্রতিরোধে সাময়িকভাবে পিছু হটে তারা।

উসমানি সেনাবাহিনীর সদস্যরা বৃক্ষকাণ্ডের সাহায্যে পরিখার ওপর সেতু নির্মাণ করে, কিন্তু গ্রিকরা তা সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়। এভাবে দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ চলতে থাকে।

ইতিমধ্যে গ্রিক সম্রাটকে সাহায্য করতে চারটি যুদ্ধজাহাজ এসে পৌঁছায় অন্য খ্রিষ্টান দেশ থেকে। সুলতান জাহাজগুলো আটকাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।

Scanned with CamScanner

এ সময় সুলতান নতুন কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি দেখলেন, রণতরিগুলো যদি পোতাশ্রয়ে না নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ। কিন্তু পোতাশ্রয়ে যেতে যে জলপথ অতিক্রম করতে হবে, তা শত্রু দ্বারা সুরক্ষিত। তাই তিনি তাঁর যুদ্ধজাহাজগুলো স্থলপথে পোতাশ্রয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

সুলতানের আদেশে ১০ মাইল পথ সমান করে এর ওপর তক্তা বিছানো হয়। এরপর তক্তা বিছানো পথকে মেষ ও গরুর চর্বি দিয়ে পিচ্ছিল করা হয়। এক রাতের মধ্যে চর্বি মাখানো পিচ্ছিল পথে ৮৮টি রণতরি ফসফরাস থেকে পোতাশ্রয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হলো। সুলতান তখন পানির ওপর ভাসমান সেতু তৈরি করে এর ওপর একটি বড় কামান স্থাপন করেন।

এরপর শুরু হয় নতুন করে গোলাবর্ষণ। উসমানি বাহিনীর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে দুর্গের মজবুত দেয়ালে ভাঙন ধরে। ১৪৫৩ সালের ২৫ মে কনস্টান্টিনোপল শহরের দুই পাশ থেকে অপ্রতিরোধ্য আঘাত হানতে শুরু করে উসমানি বাহিনী। প্রথমবার আক্রমণ করে ব্যর্থ হলে আনাতোলিয়ার সৈন্যরা দ্বিতীয়বার আক্রমণ করে। কিন্তু এতে বিশেষ ফল হচ্ছিল না।

এ সময় সুলতান তাঁর নেতৃত্বাধীন ইঙ্কেশারি সৈন্যদের নিয়ে তৃতীয়বার শহরের ওপর চরম আঘাত হানেন। দুই ঘণ্টা ধরে অবিরাম গ্রিক সৈন্যরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু গ্রিক সেনাপতি গোয়াসটিনিয়ান যুদ্ধক্ষেত্রে গুরুতর আহত হয়ে পড়েন। চিকিৎসার জন্য তিনি যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এতে খ্রিষ্টান সৈন্যদের মনোবল ভেঙে পড়ে।

এ সময় সৈন্যদের মনোবল চাঙা রাখতে স্বয়ং গ্রিক সম্রাট যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। কিন্তু বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেও তিনি শহর রক্ষা করতে পারলেন না। কিছুক্ষণ পর তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন।

সম্রাটের মৃত্যুতে খ্রিষ্টান সৈন্যদের মনোবল পুরোপুরি ভেঙে পড়ে এবং তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে শুরু করে। উসমানি সৈন্যরা বীরদর্পে শহরের ভেতর ঢুকে পড়ে। রচিত হয় নতুন গৌরবময় এক অধ্যায়, যুগ যুগ ধরে মুসলমানরা ছিলেন যে সুবর্ণ সুযোগের অপেক্ষায়।

সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহের হাতে কনস্টান্টিনোপলের পতন যখন সময়ের ব্যাপার, তখন সেখানকার খ্রিষ্টানরা এই বিশ্বাসে সেন্ট সুফিয়া গির্জায় আশ্রয় নিয়েছিল যে, মুসলমানরা এ পবিত্র গির্জা কখনো দখল করতে পারবে না।

Scanned with CamScanner

কারণ, খ্রিষ্টানরা এ গির্জাকে ঈশ্বরের পবিত্র গৃহ বলে বিশ্বাস করত। এই গির্জার একজন ধর্মীয় যাজক সাধারণ খ্রিষ্টানদের প্রতিশ্রুতি দেন, 'উসমানিরা রোমান বাহিনীকে তাড়া করে সেন্ট সুফিয়া গির্জার ওই জায়গা পর্যন্ত চলে আসবে, যেখানে সম্রাট কনস্টান্টাইনের নির্মিত পবিত্র স্তম্ভ রয়েছে। কিন্তু এর পরপরই শুরু হবে উসমানি বাহিনীর বিপর্যয়। তখন আকাশ থেকে স্বর্গীয় দূত তলোয়ার হাতে নেমে আসবেন এবং ওই স্তম্ভের গোড়ায় অবস্থানকারী ধর্মীয় যাজকের হাতে তা তুলে দেবেন। স্বর্গীয় দূত যাজককে বলবেন, যাও প্রতিশোধ নাও। তখন ওই যাজক দূতের দেওয়া তলোয়ার হাতে উসমানিদের হত্যা করা শুরু করবেন। পুরো আনাতোলিয়া থেকে তাদের ধাওয়া করে ইরানের সীমান্ত পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে।'

উসমানি বাহিনী যখন ওই পবিত্র স্তম্ভ পার হয়ে সেন্ট সুফিয়া গির্জার মূল ফটক পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তখনো গির্জায় আশ্রয়গ্রহণকারী খ্রিষ্টানরা ঐশী সাহায্যের আশায় প্রহর গুনছিল। এমন সময়ে খোলা তলোয়ার হাতে তাদের সামনে উপস্থিত হন সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহ। সেদিন ওই গির্জায় আশ্রয় নেওয়া একজন খ্রিষ্টানকেও তিনি হত্যা করেননি, বরং সবাইকে নিরাপত্তা দিয়ে ইসলামের উদার সৌন্দর্যের প্রথম পয়গাম পৌঁছে দেন তিনি।

সুলতানের হস্ত কর্তন

সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহের কাছে ইস্তাম্বুলের প্রধান বিচারপতির আদেশ পৌঁছেছে। কাল আদালতে সুলতানকে হাজির হতে বলেছেন বিচারপতি সারি খিজির জালবি। উসমানি সাম্রাজ্যে তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও বিচারিক দক্ষতা প্রবাদতুল্য প্রসিদ্ধ।

প্রধান বিচারপতির আদেশ পেয়ে পরাক্রমশালী সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহ মোটেও বিচলিত হলেন না। বরং আদালতের আদেশ শিরোধার্য মেনে তিনি পরদিন বিচারালয়ে হাজির হলেন। সুলতান সেখানে প্রবেশ করে একটি চেয়ারে বসলেন।

সুলতানকে বসা দেখে বিচারপতি বললেন, 'মাননীয় সুলতান, আপনি বসতে পারেন না। দাঁড়িয়ে থাকুন। যেভাবে আপনার বাদী দাঁড়িয়ে আছে এই আদালতে।'

সুলতান চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বাদীর দিকে তাকিয়ে দেখেন, এই লোক তো সেই প্রকৌশলী, যাকে তিনি সেদিন শাস্তি দিয়েছিলেন। কারণ, সে

Scanned with CamScanner

তাঁর আদেশ মানেনি। সুলতান বুঝতে পারলেন, তাকে শাস্তি দেওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে সে এই মামলা দায়ের করেছে।

বিচারকাজ শুরু হলো। প্রধান বিচারপতির আদেশে অভিযোগ দায়েরকারী প্রকৌশলী অভিযোগ পেশ করছে, 'আমার নাম ইসবালান্তি। ইতালির রোমে আমার বাড়ি। ইস্তাম্বুল শহরে একটি মসজিদ তৈরির কাজে সুলতান আমাকে প্রকৌশলী হিসেবে নিয়োগ দেন। সুলতান আদেশ করেছিলেন, মসজিদের খুঁটিগুলো অনেক উঁচু হতে হবে, যাতে তা দূর থেকে দেখা যায় এবং এর সৌন্দর্য বাড়ে। কিন্তু আমি এই খুঁটিগুলো সুলতানের আদেশমতো উঁচু রাখিনি। বরং তাঁকে না জানিয়ে একটি নির্দিষ্ট মাপে সেগুলো নির্মাণ করি। এতে সুলতান ক্ষুব্ধ হন। তিনি ক্রোধের বশবর্তী হয়ে আমার হাত কেটে ফেলার আদেশ দেন। তাঁর দরবারের লোকেরা সুলতানের হুকুম কার্যকর করে আমার হাত কেটে ফেলেছে। আমি আপনার আদালতে এর বিচার চাই।'

আদালতজুড়ে নিস্তব্ধ নীরবতা নেমে এল। আইনজীবী এবং উৎসুক বিশিষ্টজনদের কৌতূহলী চোখ প্রধান বিচারপতির দিকে স্থির হয়ে রইল। এ মামলায় সুলতানের বিরুদ্ধে কেমন শাস্তির আদেশ আসে, এই অপেক্ষায় শ্বাসরুদ্ধকর মুহূর্ত পার করছে সবাই।

প্রধান বিচারপতি মামলার রায় ঘোষণা করলেন। সংক্ষিপ্ত আদেশে তিনি বললেন, 'অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় শরিয়তের বিধান মতে সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহের একটি হাত কেটে ফেলা হবে।'

এমন অপ্রত্যাশিত রায়ে আঁতকে উঠল মামলার বাদী প্রকৌশলী। সুলতানের হাত কেটে ফেলা হবে, এমন বিচারের কথা সে কল্পনায়ও ভাবেনি। বরং এই অন্যায়ভাবে হাত কাটার পরিবর্তে তাকে জরিমানা হিসেবে কিছু অর্থকড়ি দেওয়া হবে, এটাই ছিল তার ইচ্ছা। কিন্তু এ কী হয়ে গেল!

কনস্টান্টিনোপল জয়ের মহানায়ক পরাক্রমশালী সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহের হাত কেটে ফেলা হবে একজন বিদেশি প্রকৌশলীর হাত কেটে ফেলার দায়ে! প্রবল বিস্ময় আর ঘোরে নির্বাক হয়ে পড়ল আদালতে উপস্থিত সবাই।

প্রকৌশলী বাদী দেরি না করে তখনই হাত জোড় করে প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তার মিনতি, 'মহামান্য সুলতানের হাত কেটে ফেলা হলে আমার হাত তো আর ফেরত পাব না। তাই এই আদেশ

Scanned with CamScanner

পরিবর্তন করে ক্ষতিপূরণ হিসেবে আমাকে কিছু অর্থ দেওয়া হোক। এতেই আমার লাভ।'

বাদীর অনুরোধে আদেশ পরিবর্তন করলেন প্রধান বিচারপতি। তিনি ঘোষণা করলেন, 'এই প্রকৌশলীকে প্রতিদিন ১০টি করে মুদ্রা দেওয়া হবে। মৃত্যু পর্যন্ত সে এই ক্ষতিপূরণ পেতে থাকবে।'

এই রায় শুনে সুলতানের মুখে হাসির আভা ছড়িয়ে পড়ল। স্বস্তিময় আনন্দ দেখা গেল সবার চোখেমুখে। কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে ওই প্রকৌশলীকে প্রতিদিন ১০টির পরিবর্তে ২০টি করে মুদ্রা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন সুলতান।

উত্তেজনার বশে একজন বিদেশি প্রকৌশলীর হাত কেটে যে অন্যায় করেছেন তিনি, সে জন্য অনুতপ্ত হলেন সুলতান। প্রতিদিন ২০ মুদ্রা করে পেলে জীবিকা নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে না এই প্রকৌশলীর, এই ভেবে কিছুটা স্বস্তি ফিরে পেলেন তিনি।

সুলতানের সম্মান

উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতানদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহ। সুলতান হিসেবে যখন তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন উসমানি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাঁর দরবারে হাজির হতো বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার হাজারো মানুষ। জ্ঞানী, গুণী ও পণ্ডিত থেকে নিয়ে সাধারণ মানুষ–সবাই বিভিন্ন প্রয়োজনে তাঁর দরবারে আসার সুযোগ পেত।

সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহ যখন দরবারে বসতেন, তাঁর চারপাশে উজির এবং অন্য সভাসদেরা থাকতেন। দরবারের ভাবগাম্ভীর্য যেকোনো আগন্তুককে প্রভাবিত করত। কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটত কেবল একজনের বেলায়। তাঁর নাম শামসউদ্দিন। সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহের শিক্ষক ছিলেন তিনি। পাশাপাশি তিনি একজন প্রাজ্ঞ আলেম ও প্রখ্যাত সাধক হিসেবে সেকালে সবার কাছে শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

সাম্রাজ্য পরিচালনার ফাঁকে প্রায়ই সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহ তাঁর শায়খ শামসউদ্দিনের কাছে যেতেন। নানা বিষয়ে মূল্যবান উপদেশ শুনতেন তাঁর কাছ থেকে। শত ব্যস্ততার পরও শায়খের সান্নিধ্যে তিনি নিয়মিত সময় কাটাতেন।

Scanned with CamScanner

শায়খ শামসউদ্দিন যখন কোনো কাজে সুলতানের দরবারে আসতেন, তখন তাঁকে দরবারে ঢুকতে দেখে সুলতান উঠে দাঁড়িয়ে যেতেন। এগিয়ে গিয়ে সম্মান জানাতেন শায়খকে, পরম বিনয়ে সালাম জানাতেন তাঁকে।

অন্যদিকে, সুলতান যখন কিছু শোনা বা শেখার জন্য শায়খ শামসউদ্দিনের কাছে যেতেন, তখন শামসউদ্দিন উঠে দাঁড়াতেন না। অথচ সেকালে আরও অনেক আলেম ও শায়খ বেঁচে ছিলেন, যাঁরা সুলতানকে দেখলে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানাতেন।

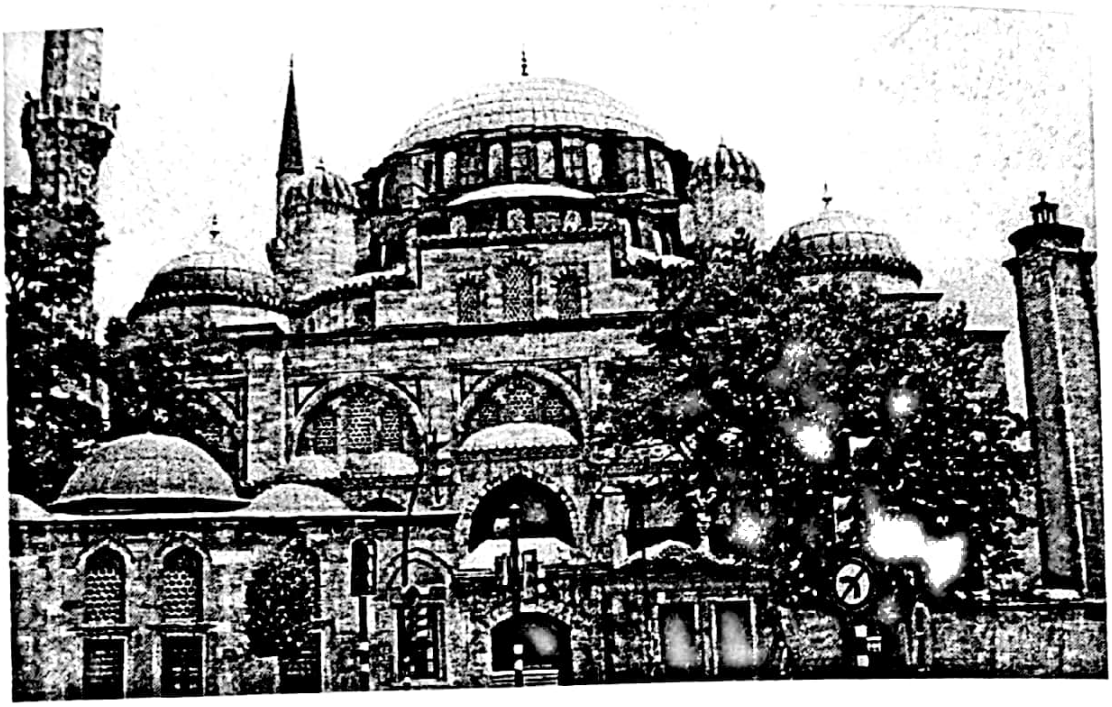
সুলতান যাঁকে দেখলে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান করেন, তিনি কেন সুলতানকে দেখলে নিজে উঠে সম্মান করেন না–এ নিয়ে দরবারে উজির ও সভাসদদের কৌতূহল ছিল। সুলতানের ঘনিষ্ঠ দু-একজন এটি নিয়ে বিব্রতবোধ করতেন।

একদিন দরবারের ছদরে আজম মাহমুদ পাশা সুলতানের কাছে সবিনয়ে এর কারণ জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, 'মহামান্য সুলতান, আপনার কাছে অনেক আলেম ও শায়খ আসেন, আপনি কারও সম্মানে উঠে দাঁড়ান না। অথচ শায়খ শামসউদ্দিন এলে আপনি উঠে দাঁড়ান এবং এগিয়ে যান। কিন্তু আপনি যখন তাঁর কাছে যান, তখন তো তিনি আপনাকে এভাবে সম্মান দেখান না।'

সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহ তাঁর ছদরে আজমের প্রশ্নে অবাক হলেন না। তিনি নিঃসংকোচে বললেন, 'এর রহস্য আমারও অজানা। আমি যখন শায়খ শামসউদ্দিনকে আমার দরবারে আসতে দেখি, আমি নিজেকে তখন ধরে রাখতে পারি না। এক অদৃশ্য টানে আমি উঠে দাঁড়িয়ে যাই। আর বাকি সব শায়খকে আমি আমার কাছে আসার সময় দেখি, তাঁরা নিজেরাই যেন কাঁপছেন। আমার সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁদের মুখে জড়তা তৈরি হয়। কিন্তু আমি যখন শায়খ শামসউদ্দিনের সঙ্গে কথা বলি, তখন আমার মুখে জড়তা আসে। এর কারণ আমি নিজেও ধরতে পারিনি।'

একজন শক্তিমান ও প্রভাবশালী সুলতানের মুখে তাঁর শায়খের সম্মানে এমন সরল স্বীকারোক্তি শুনে নিশ্চুপ হলেন ছদরে আজম মাহমুদ পাশা। আর কোনো দিন কেউ সুলতানের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলেননি।

Scanned with CamScanner



জামে আবু আইয়ুব আনসারি

বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল ঘেরাও করে রেখেছেন উসমানি সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ আলফাতেহ। রোমানদের এই শহরে প্রবেশ না করে ফিরে যাবেন না তিনি। স্বয়ং ইসলামের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ শহর জয়ের সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন, একদল সেরা মানুষের হাতে বিজিত হবে এই শহর।

উসমানি সৈন্যরা দুই মাস ধরে অবরোধ করে রেখেছে এই শহর। যতই দিন গড়াচ্ছে, ততই জয়ের আলোয় উদ্ভাসিত হচ্ছে সুলতানের হাসিমুখ। পতনের ভয় ও পরাজয়ের হতাশায় রোমান সাম্রাজ্য শঙ্কিত ও আতঙ্কিত। খ্রিষ্টান গুরু ও পণ্ডিতদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভয় ও অলীক স্বপ্নের অসাড়তা প্রমাণিত হতে আর বেশি দেরি নেই তখন।

অবরোধ চলাকালে এক রাতে চারপাশজুড়ে যখন কেবলই অন্ধকার, সুলতান তখন হাজির হলেন শায়খ শামসউদ্দিনের তাঁবুতে। সবিনয়ে তাঁকে বললেন, 'নবিজির সাহাবি হজরত আবু আইয়ুব আনসারি রাজিআল্লাহু আনহুর কবর তো এই কনস্টান্টিনোপল শহরের সীমানায়। আপনি দয়া করে আমাকে তাঁর কবরের জায়গাটি চিনিয়ে দিন।'

শায়খ শামসউদ্দিন সুলতানকে নিয়ে বের হলেন। গাঢ় অন্ধকারের পর্দা ভেদ করে তাঁরা দুজন এগিয়ে চললেন। কিছুদূর গিয়ে শহরের সীমানাপ্রাচীরের পাশে একটি জায়গা দেখিয়ে শায়খ শামসউদ্দিন বললেন, সম্মানিত সাহাবি

Scanned with CamScanner

হজরত আবু আইয়ুব আনসারির কবর এখানে। এক অপার্থিব আবহে শ্রদ্ধাবনত হলেন তাঁরা দুজন।

শায়খ বললেন, ৫২ হিজরিতে নবিজির বাণীতে অনুপ্রাণিত হয়ে ৮০ বছর বয়সে এই শহর জয় করতে উমাইয়া বাহিনীর সঙ্গে এসেছিলেন এই মহান সাহাবি। মক্কা থেকে মদিনায় নবিজির হিজরতের পর তাঁর অভ্যর্থনায় প্রথম আপ্যায়নকারী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন এই ভাগ্যবান সাহাবি।

জীর্ণ-শীর্ণ ও অবহেলিত জায়গায় এই মহান সাহাবির কবরের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় দ্রবীভূত হলেন সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ। কৃতজ্ঞতায় অবনতচিত্তে শায়খকে তিনি বললেন, 'এই জায়গায় এক সুবিশাল সুরম্য মসজিদ তৈরি করব আমি। এই মসজিদের নাম হবে হজরত আবু আইয়ুব আনসারি জামে মসজিদ।'

কনস্টান্টিনোপল জয়ের পরপরই সুলতান এখানে মসজিদ তৈরির আদেশ দেন। শুরু হয় এর নির্মাণযজ্ঞ। ১৪৫৮ সালে ইস্তাম্বুলে প্রথম মসজিদ হিসেবে নির্মিত হয় 'জামে আবু আইয়ুব আনসারি'। এর সঙ্গে তৈরি করা হয়েছিল ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মুসাফিরখানা এবং অন্যান্য স্থাপনা।

যুগে যুগে উসমানি সুলতানদের কাছে এই মসজিদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বরকতময় স্থাপনা হিসেবে বিবেচিত হতো। সুলতানদের পাশাপাশি অন্তঃপুরের নারী, দিওয়ানের উজির এবং আমির-ওমারাসহ অনেকেই মৃত্যুর আগে অসিয়ত করে যেতেন, তাঁদের যেন এই মসজিদের পাশে সমাহিত করা হয়। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, নবিজির একজন সম্মানিত সাহাবির দেহ ধারণ করেছে যে মাটি, সেই জায়গা অবশ্যই বরকতপূর্ণ।

সান্নান পাশার মসজিদ

সন্ধ্যার আঁধার গাঢ় হচ্ছে ধীরে ধীরে। সূর্য ডুবেছে বেশ কিছুক্ষণ আগে। সব কোলাহল ভেঙে নীরবতা ছড়িয়ে পড়েছে ইস্তাম্বুল নগরীজুড়ে। শহরের চারপাশজুড়ে সব কটি প্রবেশপথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যায় সূর্যাস্ত থেকে ভোরে সূর্যোদয় পর্যন্ত শহরে প্রবেশের সব ফটক বন্ধ রাখা হবে, এটা সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহের আদেশ।

দীর্ঘ দুই মাসের অবরোধ শেষে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের শত শত বছরের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল শহর জয় করেছেন সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহ। ইস্তাম্বুল শহর এবং এর সীমানালাগোয়া সব দুর্গ ও কেল্লার

Scanned with CamScanner

প্রবেশপথ বন্ধ রাখার আদেশ সুলতানের। সদ্য বিজিত শহর থেকে সূর্যাস্তের পর কেউ বের হতে পারবে না। বাইরে থেকে কেউ ঢুকতে পারবে না।

ইস্তাম্বুল শহরের এক প্রান্তে ওনকাবানিতে একটি ছোট দুর্গের দেয়ালে পাহারা দিচ্ছেন প্রহরী সান্নান পাশা। হঠাৎ তিনি কেল্লার দরজায় আঘাত শুনতে পেলেন। কে যেন হাঁক দিয়ে বলছে, 'সান্নান পাশা!, দরজা খোলো।' নাম ধরে ডাকা এমন আওয়াজে সচকিত হলেন সান্নান পাশা। কে এই আগন্তুক যে তাঁকে আদেশ করছে দরজা খোলার, তিনি ভাবনায় পড়ে গেলেন।

সান্নান পাশা দৌড়ে নিচে নেমে এলেন। অন্ধকারে ওপাশ থেকে কিছুই দেখা যায় না। আঁচ করা যাচ্ছে, কয়েকজন আগন্তুক দরজার বাইরে অপেক্ষমাণ।

সান্নান পাশা জানতে চাইলেন, 'কে আপনি?'

আগন্তুকের উত্তর, মুহাম্মদ আলফাতেহ।

সান্নান পাশা চুপ হয়ে গেলেন। এই নাম তো তাঁর পরিচিত, তবে কি...। এটুকু ভাবতেই আবার নাম ধরে ডাক এবং দরজা খোলার আদেশ ভেসে এল, 'সান্নান পাশা, দরজা খোলো।'

–আপনারা কারা! এই সময়ে শহরে ফিরছেন কেন?

–আমরা কারা তা তোমার জানতে হবে না। তুমি দরজা খোলো।

আগন্তুকের তেজোদ্দীপ্ত উত্তরে সান্নান পাশা কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। বুকে সাহস জমিয়ে তিনি বললেন, 'কেন আমার জানা লাগবে না? সুলতানের আদেশ, সন্ধ্যার পর এই দরজা খোলা যাবে না। আপনি আপনার সঙ্গীদের নিয়ে বাইরে কোথাও অপেক্ষা করুন। রাত পেরিয়ে ভোর হলেই খোলা হবে এই ফটক। সুলতানের আদেশ অমান্য করা যাবে না।'

আগন্তুক এবং তাঁর সঙ্গীদের হাসির শব্দে ভেসে এল আগের কণ্ঠ, 'আরে দরজা খোলো, সুলতানের হাত থেকে তোমাকে বাঁচানোর দায়িত্ব আমি নিচ্ছি।'

'সুলতানের হাত থেকে আমাকে বাঁচানোর আপনি কে! আপনি কি নিজেকে সুলতান ভাবেন এই শহরের!' সান্নান পাশার কণ্ঠে জিজ্ঞাসার সুর।

'আমি তোমাদের সুলতান। সান্নান পাশা, দরজা খোলো এবার।'

এক লহমায় বিস্মিত ও স্তম্ভিত সান্নান পাশা সঙ্গে সঙ্গে ফটক খুলে দিলেন। তাঁর সারা শরীর কাঁপছে। লণ্ঠনের আলোয় সুলতানকে দেখে তিনি

Scanned with CamScanner

হাত জোড় করে ক্ষমা চাইলেন, 'আমাকে ক্ষমা করুন জাহাঁপনা, আমি ভাবিনি, আপনার দেওয়া আদেশের অমান্য হোক, এটা আমি চাইনি বলে... ।'

সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহ তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন। তারপর সান্নান পাশার কাঁধে হাত রেখে মুচকি হেসে বললেন, 'প্রহরী হিসেবে তুমি বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছ। তোমার নিষ্ঠায় আমি খুশি হয়েছি। বলো, কী চাও আমার কাছে?'

সুলতানের এমন সদয় আচরণে বিগলিত সান্নান পাশা। সুলতানের কাছে কিছু চাওয়ার দুর্লভ সুযোগ তাঁর সামনে। কিন্তু কী চাইবেন তিনি? পদোন্নতি? বাড়িঘর? ধনদৌলত? দ্বিধাদ্বন্দ্বে মাথা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে তাঁর।

ক্ষণিকের ঘোর ভেঙে সান্নান পাশা বললেন, 'জনাবে আলা, আপনি আমার নামে একটি বড় মসজিদ নির্মাণ করে দেবেন, এটাই আমার চাওয়া।'

সাধারণ একজন প্রহরীর এমন নির্লোভ আগ্রহে মুগ্ধ হলেন সুলতান। সঙ্গীদের আদেশ দিলেন, 'সান্নান পাশার নামে ইস্তাম্বুল শহরে একটি মসজিদ তৈরি করে দাও।'

এভাবেই তৈরি হলো ইস্তাম্বুল শহরে অবস্থিত সান্নান পাশা মসজিদ। সুন্দর স্থাপত্যে নির্মিত এই মসজিদ আজও একজন সাধারণ প্রহরীর সদিচ্ছার অমর প্রতীক হয়ে আছে যুগ যুগ ধরে।

Scanned with CamScanner

সাধক সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদ

সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহের মৃত্যুর পর উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তাঁর পুত্র ৩৫ বছর বয়সী তরুণ বায়েজিদ। তিনি ছিলেন একাধারে একজন কবি, সাহিত্যিক, সুরকার, গীতিকার ও হস্ত লিপিতে পারদর্শী। তুর্কি ভাষার পাশাপাশি ফারসি ও আরবিতে দক্ষতা ছিল তাঁর।

সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদ তাঁর শাসনামলে ৮৫টি নতুন আইন প্রণয়ন করেন। বলা হয়, আধুনিক বিশ্বে তিনিই প্রথম পৌরসভা আইন প্রবর্তন করেন। সে সময় উসমানি সাম্রাজ্যের বড় বড় শহরগুলো তিনটি পৌরসভায় ভাগ করে দেন তিনি। উসমানি সেনাবাহিনীতে পদাতিক সশস্ত্র শাখা যোগ করেন এবং নৌবাহিনীর শক্তি আগের চেয়ে বৃদ্ধি করেন।

সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদ বই পড়তে ভালোবাসতেন। তাঁর কাছে যেসব বই উপহার হিসেবে আসত, তিনি প্রতিটি বই পড়তেন এবং কোনো বই পড়ে ভালো লাগলে এর লেখককে ডেকে পুরস্কৃত করতেন। পাশাপাশি ব্যক্তি হিসেবে তিনি ছিলেন ধর্মানুরাগী।

সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদের জন্ম ১৪৪৭ সালের ৩ ডিসেম্বর। ১৪৮১ থেকে ১৫১২ সাল পর্যন্ত ৩১ বছর ধরে উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতান ছিলেন দ্বিতীয় বায়েজিদ। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ১৫১২ সালের ২৫ এপ্রিল তিনি তাঁর পুত্র সেলিমের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেন।

৬৭ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। দিনটি ছিল ১৫১২ সালের ২৬ মে। তাঁর মৃত্যুর কারণ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভেদ রয়েছে। ধারণা করা হয়, পুত্র সেলিম বিষপ্রয়োগে তাঁকে হত্যা করেন।

সাধক সুলতান

সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদ তাঁর শাসনামলে নিজের নামে একটি মসজিদ নির্মাণের ইচ্ছা করলেন। দরবারে সংশ্লিষ্টদের ডেকে তিনি তাঁর এই ইচ্ছার

Scanned with CamScanner

কথা জানালেন। সুলতানের ইচ্ছাপূরণে ইস্তাম্বুলে একটি জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে শুরু হলো মসজিদের নির্মাণকাজ।

দীর্ঘদিন ধরে চলা নির্মাণকাজ প্রায় শেষের পথে। এর অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা ও চারপাশে নকশার কাজ শেষ হতে সামান্য বাকি। প্রকৌশলী, নির্মাণশ্রমিক ও স্থপতিদের অবিরাম পরিশ্রম শেষে একদিন মসজিদের যাবতীয় কাজ সমাপ্ত হলো। সুলতানের দরবারে মসজিদের নির্মাণকাজ সমাপ্তির খবর পাঠিয়ে দেওয়া হলো, যাতে সুলতান এই মসজিদের উদ্বোধনের ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

সুলতানের পক্ষ থেকে এই নতুন মসজিদ উদ্বোধনের সময় জানিয়ে দেওয়া হলো। আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি শুরু হলো এবং নির্ধারিত দিন ঘনিয়ে এল। নতুন মসজিদে প্রথম নামাজ আদায় শুরু উপলক্ষে ওই এলাকায় সাজ সাজ রব পড়ে গেল।

মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষে সুলতান উপস্থিত হবেন। এমন সংবাদে ইস্তাম্বুল এবং অন্যান্য শহর থেকে বিশিষ্টজনেরা আসছেন। বিপুলসংখ্যক সাধারণ মানুষ এসে জড়ো হলেন মসজিদের আঙিনায়। কিছুক্ষণ পর সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদ এসে পৌঁছালেন।

মসজিদে উপস্থিত হয়েছেন উসমানি সাম্রাজ্যের প্রখ্যাত কয়েকজন আলেম। এসেছেন শায়খুল ইসলামও। নতুন এই মসজিদে যাঁকে নিয়মিত ইমাম হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন সুলতান, তিনিও হাজির রয়েছেন। সবার ভেতর কৌতূহল, আজ কাকে দিয়ে প্রথম নামাজ আদায় করানো হবে এ মসজিদে।

সুলতানসহ উপস্থিত সবাই মসজিদের ভেতর সারিবদ্ধ হয়ে বসে পড়লেন। অধীর আগ্রহে সবাই অপেক্ষা করছেন, সুলতান কাকে দিয়ে এ মসজিদের উদ্বোধন করাবেন। কার প্রথম তাকবিরে ধ্বনিত হবে নবনির্মিত এই সুন্দর মসজিদ।

সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদের আদেশে ইমাম সামনে এগিয়ে গেলেন। উপস্থিত সবার মুখোমুখি হয়ে তিনি ঘোষণা করলেন, 'আজকের এই নতুন মসজিদে প্রথম ইমামতি করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি এমন একজনকে, জীবনে যাঁর এক ওয়াক্ত ফরজ নামাজ কখনো কাজা হয়নি। আপনাদের মধ্যে যদি এমন কোনো নেক বান্দা থাকেন, জীবনে প্রতিটি ওয়াক্তের নামাজ যিনি সময়মতো আদায় করেছেন, তবে অনুগ্রহ করে তাঁকে সামনে এগিয়ে আসার

Scanned with CamScanner

অনুরোধ করছি। তাঁকে দিয়ে এই মসজিদে নামাজ আদায়ের উদ্বোধন করা হবে।'

নতুন ইমামের এমন ঘোষণায় নড়েচড়ে বসলেন উপস্থিত সবাই। এ কেমন শর্ত, একে অপরের দিকে তাকাচ্ছেন তাঁরা। উজির এবং বিশিষ্টজনেরাও পরস্পরের দিকে চাওয়াচাওয়ি করছেন। সুনসান নীরবতায় কেটে যাচ্ছে সময়। কিন্তু কেউ এগিয়ে আসছেন না। চাপা উত্তেজনা সবার ভেতর, জীবনে এক ওয়াক্ত নামাজও বাদ পড়েনি! বাদ পড়া তো দূরের কথা, কাজাও হয়নি। এই যুগে কে আছেন এমন নেক বান্দা!

হঠাৎ প্রথম সারি থেকে কে যেন উঠে দাঁড়ালেন। সবাই উৎসুক চোখে তাকিয়ে দেখেন, সুলতান বায়েজিদ ধীর কদমে মেহরাবের দিকে এগোচ্ছেন। নির্বাক বিস্ময়ের সর্বোচ্চ মাত্রায় থমকে গেলেন সবাই। মসজিদভর্তি এত আলেম এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সুলতান বায়েজিদ একমাত্র ব্যক্তি, যাঁর জীবনে কোনো দিন এক বেলা নামাজ কাজা হয়নি।

সুলতান কোনো কথা না বলে তাকবির উচ্চারণ করলেন। তাঁর কণ্ঠে আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে উদ্বোধন হলো নতুন এই মসজিদ। সবাইকে নিয়ে দুই রাকাত নামাজ আদায় করলেন সুলতান। সেই থেকে আজও প্রতিদিন পাঁচবার আজান ছড়িয়ে পড়ে এই মসজিদের মিনার থেকে। সময়মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জামাত অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সেদিন থেকে উসমানি সাম্রাজ্যের সাধারণ মানুষ তাদের সুলতানকে চিনল এক নতুন পরিচয়ে। ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় সুলতানের নামের সঙ্গে তারা যোগ করল নতুন উপাধি 'আসসুলতানুল ওলি' বা সাধক সুলতান।

বোতলভর্তি বালুর রহস্য

উসমানি সাম্রাজ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকত। আজ এখানে তো কাল ওখানে। আর এসব যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতেন স্বয়ং সুলতান বায়েজিদ। ইউরোপের খ্রিষ্টানশক্তি তখন উঠেপড়ে লেগেছে উসমানিদের উৎখাতের ষড়যন্ত্রে।

সুলতান বায়েজিদ অকুতোভয় চিত্তে তাঁর সৈন্যদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেন শত্রুর বিরুদ্ধে। শত্রুর ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে অথবা বিদ্রোহীদের দমন করে বিজয়ী হয়ে তিনি ফিরতেন।

প্রতিটি যুদ্ধ শেষে রাজধানীতে ফেরার পথে সুলতান বায়েজিদ একটি বিশেষ কাজ করতেন, যা তাঁর সঙ্গী এবং সৈন্যদের অবাক করত। যুদ্ধ শেষ

Scanned with CamScanner

হওয়ার পর তিনি নিজ হাতে তাঁর বর্ম ও শিরস্ত্রাণে লেগে থাকা ধুলোবালি ঝেড়ে ফেলতেন, এরপর সেগুলো একটি বিশেষ বোতলে ভরে রাখতেন। সুলতানের খাসকামরায় বোতলটি যত্ন করে সাজিয়ে রাখা হতো।

এক রাতে সুলতানের স্ত্রী কুলবাহার বোতলভর্তি ধুলোবালির রহস্য জানতে চাইলেন। এসব এভাবে জমিয়ে রেখে সুলতানের উদ্দেশ্য কী, এ নিয়ে তাঁর কৌতূহল। সুলতানকে খোশ মেজাজে পেয়ে একদিন স্ত্রী শোধালেন, 'মহামান্য সুলতান! আমাকে অভয় দিলে একটি প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে।'

–অভয় দেওয়া হলো। বলো, কী জানতে চাও।

–প্রতিবার যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আপনি যুদ্ধের পোশাক ঝেড়ে ধুলোবালি এই বোতলে রাখেন, এর উদ্দেশ্য কী?

স্ত্রীর প্রশ্নে সুলতান কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। তারপর বললেন, 'কুলবাহার! মৃত্যুর আগে আমি অসিয়ত করে যাব, আমার মৃত্যুর পর এই ধুলোবালি দিয়ে যেন একটি ইট বানানো হয়। সেই ইট যেন কবরে আমার মাথার নিচে রেখে তারপর আমাকে দাফন করা হয়। তুমি কি জানো না, যে শরীর আল্লাহর জন্য যুদ্ধে যায়, তিনি কিয়ামতের দিন ওই শরীরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। সে জন্য আমি চাই, জিহাদ-যুদ্ধে আমার শরীরে লেগে যাওয়া এসব ধুলোবালি যেন আল্লাহর জন্য জিহাদে অংশগ্রহণে আমার প্রমাণ হিসেবে থাকে।'

১৫১২ সালে সুলতান বায়েজিদ মৃত্যুবরণ করেন। সুলতানের মৃত্যুর পর তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী ওই বোতলে জমানো ধুলোবালি ও মাটি দিয়ে একটি ইট বানানো হয়। তারপর সেটি সুলতানের মাথার নিচে রেখে তাঁকে কবরে শোয়ানো হয়। এভাবেই দাফন করা হয় উসমানি সাম্রাজ্যের এই সাধক সুলতানকে।

ইস্তাম্বুল শহরে নিজের নামে যে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন সুলতান বায়েজিদ, সেই মসজিদের আঙিনায় শেষ শয্যায় সমাহিত হন তিনি। উসমানি সাম্রাজ্যের ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে আছেন তাঁর সাহসিকতা, আল্লাহভীতি ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য।

নবিজির রওজায় সুলতানের বাতি

ইস্তাম্বুল থেকে মক্কা-মদিনার পথে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার অভাব এবং সাম্রাজ্য পরিচালনার বিবিধ ব্যস্ততায় উসমানি সুলতানদের হজে যাওয়ার সুযোগ হতো

Scanned with CamScanner

না। কিন্তু হজের মৌসুম এলে নিজের অর্থে আলেম ও দরবেশদের হজে পাঠাতেন তাঁরা।

সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদ যখন উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতান হিসেবে ক্ষমতায়, সে বছর হজে যাচ্ছিলেন সুলতানের সাধক বন্ধু 'বাবা ইউসুফ'। মক্কা-মদিনা ও হেজাজের অন্যান্য অঞ্চল তখনো উসমানিদের শাসনসীমানার অন্তর্গত হয়নি।

হজযাত্রা উপলক্ষে ইউসুফের সঙ্গে দেখা করতে এলেন সুলতান। কুশল বিনিময় ও শুভকামনা করে সুলতান নিজের পকেট থেকে কাপড়ে মোড়ানো কিছু সোনার মোহর বন্ধুর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'এই সোনার মোহরগুলো আমার নিজের হাতে উপার্জিত। দান বা রাজকোষ থেকে নেওয়া নয়। আপনি যখন মদিনায় নবিজির পবিত্র রওজার সামনে দাঁড়াবেন, তখন আমার পক্ষ থেকে নবিজির কাছে আরজ করবেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনার অধম দাস বায়েজিদ এই সোনার টুকরোগুলো নিবেদন করছে আপনার খেদমতে। আপনার এই পবিত্র রওজায় বাতি জ্বালাতে তেল কেনার জন্য তার এই দান আপনি গ্রহণ করুন।"'

Scanned with CamScanner

দুঃখী শাহজাদার ফেরারি জীবন

দ্রুতবেগে ছুটছে ঘোড়সওয়ার। কোথাও থামবার সুযোগ নেই তাঁর। উসমানি সাম্রাজ্যের ছদরে আজম মুহাম্মদ পাশা তাঁকে পাঠাচ্ছেন কারমান প্রদেশে। দ্রুততম সময়ে তাঁকে পৌঁছাতে হবে সেখানে। ছদরে আজম তাঁর মাধ্যমে পয়গাম পাঠিয়েছেন শাহজাদা জিমের কাছে। জিমের বাবা উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতাপশালী ও বিজেতা সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহ মৃত্যুবরণ করেছেন। এ সংবাদ শোনামাত্র তিনি যেন রাজধানী ইস্তাম্বুলের উদ্দেশে রওনা হন, এটাই ছদরে আজমের বার্তা।

ছদরে আজম মুহাম্মদ পাশা শাহজাদা জিমকে স্নেহ করেন। তাঁর ইচ্ছা, সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহের মৃত্যুর পর তাঁর অবর্তমানে শাহজাদা জিম উসমানি সাম্রাজ্যের নতুন সুলতান হিসেবে দায়িত্ব নেবেন। সুলতানের বড় পুত্র শাহজাদা বায়েজিদ যেন কোনোভাবেই পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ইস্তাম্বুলে না আসেন, সে জন্য আগেভাগে দূত পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি শাহজাদা জিমের কাছে।

ছদরে আজমের দূত পথে আনাতোলিয়ার শাসক সান্নান পাশার সঙ্গে দেখা করে। সান্নান পাশা যখন জানতে পারেন, সুলতানের বড় পুত্র বায়েজিদকে সিংহাসন থেকে দূরে রাখতে ছদরে আজম দূত পাঠাচ্ছেন কনিষ্ঠ পুত্র জিমের কাছে, তখন তিনি দূতকে হত্যা করেন। শাহজাদা জিম যথাসময়ে তাঁর পিতার মৃত্যুসংবাদ জানতে পারলেন না। ছদরে আজমের আশা আর পূর্ণ হলো না। বরং আনাতোলিয়ার শাসক তখনই শাহজাদা বায়েজিদকে খবর পাঠিয়ে সংবাদ শোনামাত্র ইস্তাম্বুলে রওনা হতে বলে দিলেন।

সদ্যপ্রয়াত সুলতানের বড় শাহজাদা বায়েজিদের পরিবর্তে ছোট শাহজাদা জিমের প্রতি ছদরে আজমের এমন কাণ্ডের খবরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ইঙ্কেশারি বাহিনীতে। তারা ক্ষুব্ধ হয়ে ছদরে আজম মুহাম্মদ পাশাকে সেদিনই হত্যা করে ফেলে। তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের বাড়িতে লুটপাট শুরু করে দেয় একদল সৈন্য। সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহের উত্তরাধিকারী শাহজাদা

Scanned with CamScanner

বায়েজিদ ইস্তাম্বুলে ফিরে আসা পর্যন্ত তাঁর শিশুপুত্র কুরকুদকে নায়েবে সুলতান হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৪৮১ সালের ৪ মে ছিল সেই দিন।

ততক্ষণে খবর পৌঁছে যায় শাহজাদা বায়েজিদের কাছে। পিতার মৃত্যুসংবাদে সিংহাসনের হাতছানি তাঁর সামনে নিশ্চিত হয়ে পড়ে। ১২ মে বায়েজিদ চার হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে ইস্তাম্বুলের উদ্দেশে রওনা হন।

১৫ দিনের যাত্রাপথ মাত্র নয় দিনে পাড়ি দিয়ে তিনি রাজধানীতে পৌঁছান। পথে একদল সৈন্য তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং তাদের দাবিদাওয়া পেশ করে। সিংহাসন নিশ্চিত করতে শাহজাদা বায়েজিদ তাদের সব দাবি মেনে নেন।

ইস্তাম্বুলে ফিরে মরহুম পিতার দাফন অনুষ্ঠানে অংশ নেন বায়েজিদ। মৃত্যুর দুই সপ্তাহ পর সমাহিত হন ইস্তাম্বুল বিজেতা সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহ।

এরপর উসমানি সাম্রাজ্যের নতুন সুলতান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন সুলতান বায়েজিদ। আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর নাম দাঁড়ায় আসসুলতানুলগাজি বায়েজিদ আছছানি বা সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদ।

এর বেশ কিছুদিন পর পিতার মৃত্যু এবং বড় ভাইয়ের সুলতান হিসেবে সিংহাসনে আরোহণের খবর পান শাহজাদা জিম। ততক্ষণে তাঁর হাত থেকে ছুটে গেছে উসমানি সাম্রাজ্যের সিংহাসনপ্রাপ্তির সুবর্ণ সুযোগ।

আশাহত শাহজাদা জিম ইস্তাম্বুলের আশা ছেড়ে রওনা হন বোর্সা শহর অভিমুখে। রাজধানীর পর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র এই শহর দখল করে নেয় জিমের অনুগত সৈন্যরা। ইঙ্কেশারি বাহিনীর দুই হাজার সদস্যকে পরাজিত করে শহরের নিয়ন্ত্রণ নেয় জিমের নেতৃত্বাধীন বাহিনী।

এরপর বোর্সায় নিজেকে সুলতান হিসেবে ঘোষণা দেন জিম। তিনি আদেশ করেন, তাঁর নামে যেন মুদ্রা তৈরি করা হয় এবং সব মসজিদে শুক্রবার জুমার খুতবায় সুলতান হিসেবে তাঁর নাম উচ্চারণ করা হয়। বোর্সায় নিজের অবস্থান শক্ত করে বিশেষ দূত মারফত বড় ভাই সুলতান বায়েজিদকে সাম্রাজ্য ভাগাভাগির প্রস্তাব পাঠান জিম। তিনি জানান, পিতার রেখে যাওয়া সাম্রাজ্যে এশীয় অঞ্চলগুলোয় সুলতান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন তিনি, আর ইউরোপীয় অঞ্চলের সুলতান থাকবেন বড় ভাই বায়েজিদ।

সদ্য সিংহাসনে বসা সুলতান বায়েজিদ জিমের এমন ঔদ্ধত্য মেনে নিতে পারলেন না। ছোট ভাইয়ের প্রতি তিনি রেগে গেলেন এবং সামরিক যুদ্ধের

Scanned with CamScanner

মাধ্যমে তাঁকে দমনের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি নিজেই সৈন্যদের নিয়ে বোর্সার উদ্দেশে রওনা হলেন।

১৪৮১ সালের ২০ জুন দুই ভাইয়ের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। এ যুদ্ধে বড় ভাইয়ের কাছে হেরে যান ছোট ভাই জিম। প্রাণ বাঁচাতে যুদ্ধের মাঠ ছেড়ে তিনি পালিয়ে যান। পেছন থেকে জিমকে মিসর পর্যন্ত ধাওয়া করেন সুলতান বায়েজিদ ও তাঁর সৈন্যরা।

জিমের নিয়ন্ত্রণ থেকে বোর্সা শহর উদ্ধার হয়। এ সময় সুলতান বায়েজিদের কাছে সৈন্যরা দাবি জানায়, যে শহরবাসী জিমকে শাসক হিসেবে গ্রহণ করেছিল, তাদের সবাইকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। সৈন্যরা সেই শাস্তি র দায়িত্ব নিজেদের হাতে নিতে চাইল। সুলতান বায়েজিদ ছিলেন শান্তিপ্রিয় ও সাধক প্রকৃতির। তিনি ক্ষুব্ধ সৈন্যদের শান্ত করেন এবং তাদের প্রত্যেককে বকশিশ দিয়ে এমন কাজ থেকে বিরত রাখেন। এরপর সবাইকে নিয়ে তিনি ইস্তাম্বুলের পথে রওনা হন।

যাঁর হাতে কনস্টান্টিনোপল শহরের পতন হয়েছিল, সেই মহান সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহের ছোট ছেলে জিম পালিয়ে আসার পর তাঁকে সাদরে বরণ করে নেন মিসরের শাসক সুলতান সাইফুদ্দীন। রাজকীয় সম্মানে জিমকে তিনি আশ্রয় দেন নিজের কাছে।

রাজ্যহারা শাহজাদা জিম এ সময় মিসর থেকে পবিত্র মক্কায় গিয়ে হজ আদায় করেন। উসমানি সুলতানদের পরিবারে প্রথম ও একমাত্র সদস্য হিসেবে তিনি মক্কা ও মদিনা ভ্রমণ করেন। তাঁর পরিবার আবাসস্থল হিসেবে আপাতত বেছে নেয় মিসরের রাজধানী কায়রোকে।

কিছুকাল পর সিরিয়ার হালব শহরে হাজির হন শাহজাদা জিম। সেখান থেকে তিনি কারমানের সাবেক শাসক পরিবারের সদস্য কাসেম বেগের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। জিম তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেন, উসমানি সাম্রাজ্যের সিংহাসন উদ্ধারে সহযোগিতা করলে তিনি কারমান অঞ্চলের শাসন তাঁর হাতে ফিরিয়ে দেবেন। জিমের প্রতিশ্রুতিতে উজ্জীবিত হন কাসেম বেগ। নিজের গোত্রীয় সৈন্যদের জোগাড় করে জিমের নেতৃত্বে তিনি অবরোধ করেন কোনিয়া শহর। এটি তখন উসমানি সাম্রাজ্যের অধীন কারমান প্রদেশের মূল শহর।

কোনিয়ায় নিযুক্ত উসমানি শাসক আহমদ পাশা তাঁর সৈন্যদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন জিম ও কাসেম বেগের ওপর। আবারও পালাতে হয় পরাজিত শাহজাদা জিমকে। উসমানি সাম্রাজ্যের শক্তিমান সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহের ছোট ছেলে হয়েও আবার আত্মগোপনে চলে যেতে হয় তাঁকে।

Scanned with CamScanner

দুবার যুদ্ধে হেরে যাওয়ার পর শাহজাদা জিম শেষবারের মতো তাঁর বড় ভাই সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদের সঙ্গে সমঝোতা করতে আগ্রহী হলেন। বিশেষ দূতের মাধ্যমে তিনি প্রস্তাব পাঠান সুলতান বায়েজিদের কাছে। শাহজাদা জিম এতে অনুরোধ করেন, অন্তত কিছু অঞ্চল যেন সুলতান বায়েজিদ তাঁকে দান করেন। কিন্তু ছোট ভাইকে আর বিশ্বাস করেননি সুলতান বায়েজিদ। তিনি ভাবলেন, দু-একটি অঞ্চল হাতে পেলে আবারও আগের স্বভাবে ফিরে যাবেন জিম। ফলে এ প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

আশাহত জিম আর কোনো উপায় না দেখে আশ্রয় নেন উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতিবেশী অঞ্চল গ্রিসের অন্তর্গত রোদস দ্বীপের প্রধান ধর্মযাজক হান্না অরশালিমের কাছে।

ইউরোপের বাইজেন্টাইন বিজেতা সম্রাট মুহাম্মদ আলফাতেহের কনিষ্ঠ পুত্র জিমকে আড়ম্বরপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতায় বরণ করে নেন রোদসের শাসক। ১৪৮২ সালের ২৩ জুলাই থেকে জিম রোদস দ্বীপকে নিজের আশ্রয়স্থল হিসেবে বেছে নেন। তাঁর পরিবার তখনো কায়রোয় বাস করতে থাকে। শুরু হয় পরাজিত শাহজাদা জিমের নিঃসঙ্গ জীবনের এক করুণ অধ্যায়।

রোদস দ্বীপে জিমের আশ্রয় নেওয়ার খবর জানতে পারেন সুলতান বায়েজিদ। তাঁর গোয়েন্দারা যোগাযোগ করে রোদসের শাসকের সঙ্গে। তাঁকে জানানো হয়, জিমকে যত দিন তিনি কঠিন পাহারায় রাখতে পারবেন, তত দিন উসমানি সেনাবাহিনী রোদস দ্বীপে কোনো অভিযান চালাবে না। শুধু তা-ই নয়, বরং জিমকে আটকে রাখতে পারলে প্রতিবছর ৪৫ হাজার দোকা (অর্থ) পাবেন তিনি।

রোদসের শাসক উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতান বায়েজিদের এমন লোভনীয় প্রস্তাব লুফে নেন। মরহুম সুলতান আলফাতেহের দুই পুত্রের মধ্যে এ বিবাদ তাঁর জন্য স্বস্তি ও নিরাপত্তা বয়ে আনে। ইউরোপের খ্রিষ্টান জাতির আতঙ্ক সুলতান আলফাতেহের ছেলে শাহজাদা জিম রোদসের শাসকের জিম্মায়, এমন খবরে হাঙ্গেরির সম্রাট তাঁকে পেতে মরিয়া হয়ে ওঠেন। রোদসের শাসকের কাছ থেকে এই শাহজাদাকে কিনে নেওয়ার প্রস্তাব পাঠান তিনি।

জিমকে ব্যবহার করে উসমানি সাম্রাজ্য থেকে স্বার্থ উদ্ধার করা যাবে, এই ইচ্ছায় জার্মানির রাজাও রোদসের শাসকের কাছে জিমকে কেনার প্রস্তাব দেন। দুটি শক্তিশালী দেশের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন রোদসের ধর্মযাজকেরা।

Scanned with CamScanner

সাফ জানিয়ে দেন, কোনো অর্থমূল্যে শাহজাদা জিমকে তাঁরা বিক্রি করবেন না। উসমানি সাম্রাজ্যের শাহজাদা জিম ইউরোপীয় রাজা ও সম্রাটদের কাছে অমূল্য শিকার হয়ে ওঠেন। তাঁকে দিয়ে উসমানি সাম্রাজ্যের ওপর প্রতিশোধ নিতে ব্যাকুল হয়ে পড়েন ইউরোপীয় খ্রিষ্টান রাজারা।

বিভিন্ন দেশের চাপ বাড়তে থাকায় রোদসের ধর্মযাজকেরা জিমকে পাঠিয়ে দেন ফ্রান্সে। ছয়-সাত বছর ফ্রান্সে একরকম বন্দিজীবন কাটান জিম। ১৪৮৯ সালে ফ্রান্সের ধর্মযাজকেরা তাঁকে তুলে দেন ইতালির রোমে পোপের হাতে। জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনে রোম বরণ করে নেয় শাহজাদা জিমকে।

ইউরোপের ত্রাস মরহুম সুলতান আলফাতেহের পুত্রকে দেখার জন্য সর্বস্তরের খ্রিষ্টানরা ভিড় করে রাজপথে। ইতালির শাহজাদা, ধর্মযাজকসহ শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা জিমকে তাঁদের আশ্রয়ে স্বাগত জানান। একটি বিশেষ প্রাসাদ বরাদ্দ করা হয় জিমের আবাস হিসেবে।

পরদিন পোপ সাক্ষাৎ করতে আসেন শাহজাদা জিমের সঙ্গে। পোপের কর্মকর্তারা জিমকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন পোপকে মাথা ঝুঁকে সম্মান জানান। স্বয়ং ইতালির সম্রাটও পোপকে এভাবে কুর্নিশ করেন। বিধর্মী কারও সামনে এভাবে মাথা নত করে সম্মান জানানোর প্রস্তাবে রেগে ওঠেন জিম। তিনি জানিয়ে দেন, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এবং আমার বাবা মরহুম সুলতান ছাড়া আমি কারও সামনে মাথা নত করতে শিখিনি।

১৪৮৯ থেকে ১৪৯৫ সাল পর্যন্ত রোমে বাস করেন জিম। এ সময় তিনি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। দূর থেকে তাঁকে সতর্ক প্রহরায় রাখা হতো। একপর্যায়ে পোপ তাঁকে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের প্রস্তাব দেন। পোপ তাঁকে প্রলোভন দেখান, খ্রিষ্টান হলে তাঁর পরিবারকে মিসর থেকে এখানে নিয়ে আসা হবে এবং ধর্মযাজকের পদ দেওয়া হবে।

পোপের এমন প্রস্তাবে প্রবল আপত্তি জানান শাহজাদা জিম। তিনি জানিয়ে দেন, 'শুধু ধর্মযাজক পদ নয়, আমাকে খ্রিষ্টানদের পোপ বানিয়ে পুরো পৃথিবী হাতে তুলে দিলেও আমি ইসলাম ছাড়ব না।'

কিছুকাল পর ফ্রান্সের সম্রাট অষ্টম চার্লস যখন রোম অবরোধ করেন, তখন তিনি শাহজাদা জিমকে চেয়ে পোপের কাছে অনুরোধ পাঠান। শক্তিধর সম্রাটের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিতে পারেননি পোপ। কিন্তু জিমকে ব্যবহার করে কেউ যেন আর স্বার্থ আদায়ের নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত না হয়, সে জন্য

Scanned with CamScanner

ফ্রান্সের সম্রাটের হাতে তুলে দেওয়ার আগে জিমের খাবারে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয় পোপের আদেশে। এরপর তাঁকে সমর্পণ করা হয় সম্রাটের হাতে।

ফ্রান্সের সম্রাটের সঙ্গে রোম থেকে নাপোলি যাওয়ার পরপরই জিম বিষক্রিয়ায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। ১৪৯৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি তিনি মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৩৫ বছর ৩ মাস। শাহজাদা জিমের জন্ম ১৪৫৯ সালের ২২ ডিসেম্বর।

ছোট ভাই জিমের মৃত্যুসংবাদে উসমানি সাম্রাজ্যে তিন দিনের শোক ঘোষণা করেন সুলতান বায়েজিদ। প্রথমে নাপোলিতে তাঁকে দাফন করা হয়। এর চার বছর পর তাঁর লাশ তুলে বোর্সায় নিয়ে আসা হয় এবং সেখানে তাঁকে শেষবারের মতো দাফন করা হয়।

বড় ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদ ও দ্বন্দ্বে জড়িয়ে ১৪ বছর ভিনদেশে নিঃসঙ্গ বন্দিজীবন কাটিয়েছেন শাহজাদা জিম। সাম্রাজ্যের মোহ ও লোভ দুই ভাইয়ের অকৃত্রিম ভ্রাতৃত্ব ভুলিয়ে দিয়ে তাঁদের চিরশত্রুতে পরিণত করেছিল।

Scanned with CamScanner

বিজেতা সুলতান প্রথম সেলিম

১৫১২ থেকে ১৫২০ সাল পর্যন্ত সুলতান প্রথম সেলিম মাত্র আট বছর উসমানি সাম্রাজ্য শাসন করেছেন। তিনিই প্রথম উসমানি সুলতান, যাঁর নামের আগে আমিরুল মুমিনীন উপাধি ব্যবহার করা হয়েছিল। উসমানি সাম্রাজ্যের নবম সুলতান হিসেবে উসমানি ইতিহাসে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কারণ, এই আট বছরে সুলতান সেলিম যে অসাধ্য সাধন করেছেন, তা অন্য কারও পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

১৪৭০ সালের ১০ অক্টোবর আমাসিয়া শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৫২০ সালের ২২ সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

সুলতান প্রথম সেলিমের শাসনামলে মিসর, সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও উত্তর ইরাকসহ হেজাজের অন্যান্য অঞ্চল উসমানি মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়। তাঁর দক্ষ নেতৃত্ব এবং দুর্দান্ত অগ্রযাত্রায় উসমানি সাম্রাজ্যের সীমানা দূর-দূরান্তে বিস্তৃত হয়।

সুলতানের বিনয়

১৫১৬ সালে দামেস্ক জয় করেন সুলতান সেলিম। প্রথমবারের মতো তিনি জুমার জামাতে অংশ নেন দামেস্কের সবচেয়ে বড় মসজিদে। সেদিন মসজিদে ছিল উপচে পড়া জনতার ভিড়। মসজিদের ভেতরে মেহরাবের সামনের অংশজুড়ে উপস্থিত হন সুলতান, আমির-ওমারা, দামেস্কের গুণী ও বরেণ্য ব্যক্তি এবং উচ্চপদস্থ সামরিক কর্তারা।

যথাসময়ে জুমার খুতবা শুরু হলো। মসজিদের খতিব তাঁর খুতবায় দামেস্ক বিজেতা মহান সুলতান সেলিমের নাম উচ্চারণ করে দোয়া করলেন। এর মধ্য দিয়ে প্রথমবারের মতো কোনো উসমানি সুলতানের নাম মুসলিম বিশ্বে জুমার খুতবায় উচ্চারিত হলো।

Scanned with CamScanner

খুতবার শেষাংশে খতিব বললেন, 'হে মহান আল্লাহ, আপনি মক্কা ও মদিনার শাসক মহামান্য সুলতান সেলিমকে সর্বময় সাহায্য করুন।' খতিবের মুখে এ প্রার্থনা শুনে সুলতান সেলিম খতিবকে উদ্দেশ করে বললেন, 'সম্মানিত খতিব, মক্কা ও মদিনার "শাসক" নয়, বরং "সেবক" বলুন।'

সুলতান সেলিমের আকস্মিক সংশোধনীতে হকচকিয়ে গেলেন খতিব। নিজেকে সামলে খুতবা শুধরে তিনি দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ, আপনি মক্কা ও মদিনার সেবক সুলতান সেলিমকে সাহায্য করুন।'

মূল্যবান শেরওয়ানি

মিসর ও শাম অঞ্চল জয়ের পর সুলতান সেলিম বিজিত অঞ্চলগুলোতে নতুন শাসক নিয়োগ দেন। এ সময় তিনি মিসরের কায়রোতে এক মাস অবস্থান করেন। সেখানে শহরবাসীর পক্ষ থেকে আয়োজিত বিভিন্ন সংবর্ধনা গ্রহণ করেন এবং সেনাবাহিনী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে উপহার বিতরণ করেন। মক্কার শাসক মুহাম্মদ আবু নামি কায়রোতে এসে সুলতান সেলিমের আনুগত্য মেনে নেন। পবিত্র কাবা শরিফের চাবি তুলে দেওয়া হয় তাঁর হাতে। এসব আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে মুসলিম বিশ্বের খলিফা হিসেবে নতুন পরিচয়ে অভিষিক্ত হন সুলতান সেলিম। মিসরের পর তিনি সিরিয়ার দামেস্ক ও হালবে কয়েক মাস অবস্থান করেন।

এরপর ইস্তাম্বুলের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন সুলতান সেলিম। সাধারণত সুলতানি শোভাযাত্রায় কয়েক সারি নিরাপত্তাবেষ্টনীর পর সবার অগ্রভাগে থাকতেন সুলতান। তাঁর ডানে-বামে এবং পেছনে থাকতেন উসমানি পরিবারের আমির, দরবারের উজির এবং সেনাবাহিনীর সামরিক নেতারা। সুলতান সেলিম যাত্রাপথে সেকালের প্রখ্যাত আলেম শায়খ ইবনুল কামালকে তাঁর পাশে রাখতেন। যাত্রাপথে পুরো সময় তিনি এই প্রখ্যাত আলেমের সঙ্গে কথা বলতেন। ফলে সুলতান ও শায়খের ঘোড়া পাশাপাশি থাকত পুরো যাত্রাপথে।

একদিন কোথাও যাত্রাকালে সুলতানের কাফেলা যে পথ পাড়ি দিয়ে সামনে এগোচ্ছিল, সেটি ছিল কাদায় ভরা। যথারীতি সেদিনও সুলতান সেলিম যাত্রাপথে নানা বিষয়ে কথা বলছেন শায়খ ইবনুল কামালের সঙ্গে। তাঁরা দুজন দুটি ঘোড়ায় চড়ে পাশাপাশি এগিয়ে যাচ্ছেন সামনের দিকে। পেছনে সুলতানের সভাসদ ও সফরসঙ্গীরা।

Scanned with CamScanner

সুলতানের পাশাপাশি শায়খ ইবনুল কামাল যখন কাদায় ভরা পথ অতিক্রম করছেন, তখন তাঁর ঘোড়ার ক্ষুরের আঘাতে কাদা ছিটকে সুলতানের পোশাকে লেগে যাচ্ছিল। ফলে বেশ কিছুদূর যেতে যেতে সুলতানের গায়ে পরিহিত রাজকীয় শেরওয়ানির বিভিন্ন অংশ ফোঁটা ফোঁটা কাদায় নোংরা হয়ে পড়ে।

এ দৃশ্য দেখে সুলতানের সেবক ও প্রহরীরা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। শায়খের ঘোড়ার কারণে নোংরা হয়ে যাচ্ছে সুলতানের পোশাক, সুলতান যখন এটা টের পাবেন, তখন এমন কাণ্ড কি তিনি মেনে নেবেন! কিছুক্ষণ পর শায়খ ইবনুল কামালের চোখেও ব্যাপারটা ধরা পড়ে। তিনি ঘোড়ার লাগাম টেনে সুলতানের কাছে এ জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

সুলতানের শেরওয়ানিতে এমন কাদা মাখামাখি দেখে অন্যরা যখন বিচলিত, তখন তিনি যে স্বাভাবিক আচরণ করলেন, তা দেখে সবাই বিস্মিত হলেন। ঘোড়ার লাগাম টেনে নিচে নামলেন সুলতান সেলিম। ব্যক্তিগত সেবক ডেকে অন্য আরেকটি পোশাক পরলেন তিনি। তারপর কাদা লেগে থাকা শেরওয়ানিটি হাতে নিয়ে শায়খ ইবনুল কামালকে বললেন, 'আপনার মতো আলেমের ঘোড়ার ক্ষুরের আঘাতে কাদা লেগেছে এই শেরওয়ানিতে, এটি আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। আমি অসিয়ত করছি, মৃত্যুর পর যেন এই কাদামাখা শেরওয়ানি পরিয়ে আমার লাশ দাফন করা হয়।'

পরবর্তী সময়ে সুলতান সেলিমের মৃত্যুর পর তাঁর অসিয়ত রক্ষার্থে শেরওয়ানিটিসহ তাঁকে দাফন করা হয়েছিল।

বিজয় মিছিল হবে না

মিসরসহ পার্শ্ববর্তী অন্যান্য অঞ্চলে সুদীর্ঘ সামরিক অভিযান এবং সফল বিজয় শেষে সুলতান সেলিম যখন ইস্তাম্বুলে ফিরে আসছেন, তখন ইস্তাম্বুল শহরবাসী সুলতানকে অভ্যর্থনা জানাতে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সুলতানের সঙ্গে থাকা সেনাবাহিনীর পরিবারের সদস্যরা ইস্তাম্বুল শহরের প্রবেশপথে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে তাঁদের স্বাগত জানাতে অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকে। সুলতানের প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে শহরজুড়ে সাজ সাজ রব এবং জয়ের আমেজ আনন্দের বন্যা বইয়ে দেয় সব বয়সী সবার মনে।

ইস্তাম্বুলের বাসিন্দাদের এমন প্রস্তুতি ও আনন্দ মিছিলের খবর পেলেন সুলতান সেলিম। দীর্ঘ পথ পেরিয়ে সুলতানের বহর ও সেনাদল যখন দিনের

Scanned with CamScanner

মধ্যদুপুরে রাজধানীর একেবারে কাছাকাছি, তখন সুলতান যাত্রাবিরতির নির্দেশ দিলেন। সবাইকে জানিয়ে দিলেন, ইস্তাম্বুল শহরের এই অংশ দিয়ে নয়, বরং অন্য দিক দিয়ে এই কাফেলা প্রবেশ করবে। অর্থাৎ, শহরবাসী সুলতান ও তাঁর সেনাবাহিনীকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বিজয় মিছিলের প্রস্তুতি নিয়েছিল যে প্রান্তে, এর বিপরীত প্রান্তের প্রবেশপথে শহরে ঢুকবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন সুলতান সেলিম।

সুলতান সেলিমের এমন আকস্মিক সিদ্ধান্তে বিস্মিত হলেন সবাই। আর কিছুক্ষণ কাফেলার যাত্রা অব্যাহত থাকলে দিনের আলোয় শহরে প্রবেশ করা যেত। কিন্তু এখানে এই যাত্রাবিরতি এবং প্রবেশপথ পরিবর্তনের আদেশে কোনো যুক্তি খুঁজে পেলেন না সুলতানের মন্ত্রী ও দরবারের অন্য লোকেরা। পরিবারের সদস্যদের অভ্যর্থনা এবং সবাইকে নিয়ে বিজয় শোভাযাত্রায় শহরে ঢোকার যে আনন্দ, সবার মন থেকে তা উড়ে গেল।

বিস্ময় আর পিনপতন নীরবতায় তাঁবু টানানো হলো। নৈশভোজ ও বিশ্রামের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হলো সবাই। সবার মনে চাপা আকুতি, কেউ যদি গিয়ে একটু সুলতানকে তাঁর মত পরিবর্তনের আরজি জানাত!

একপর্যায়ে কয়েকজন উজিরের অনুরোধে সুলতানের শ্রদ্ধার পাত্র প্রাজ্ঞ আলেম ইবনুল কামাল রাজি হলেন সুলতানকে বোঝাতে। সবার বিশ্বাস, ইবনুল কামালের অনুরোধ নিশ্চয়ই সুলতান ফিরিয়ে দেবেন না।

সুলতান সেলিম তখন তাঁবুতে বিশ্রাম নিচ্ছেন। প্রহরীর মাধ্যমে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করলেন ইবনুল কামাল। সালাম দিয়ে সুলতানকে বললেন, 'সবার পক্ষ থেকে আপনাকে একটি অনুরোধ করতে চাই।' সুলতান সায় দিয়ে বললেন, 'বলুন।'

এবার ইবনুল কামাল বলতে থাকলেন, 'আপনার সঙ্গী এবং সৈন্যদের ইচ্ছা, তারা তাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আনন্দ উদ্‌যাপন করে বিজয় শোভাযাত্রার মাধ্যমে ইস্তাম্বুল নগরীতে প্রবেশ করবে। তাদের স্বাগত জানাতে পরিবারের সদস্যরা ইতিমধ্যে সেখানে জড়ো হয়েছেন এবং অধীর আগ্রহে সবাই অপেক্ষা করছেন। আপনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলে সাধারণ মানুষ আনন্দিত হবে। আপনার প্রতি তাদের ভালোবাসা ও সম্মান দেখানোর সুযোগ পাবে।'

ইবনুল কামালের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনলেন সুলতান। তারপর বললেন, 'শায়খ! আপনিও কি এখনো আমাকে চেনেননি! এই সুখ্যাতি ও

Scanned with CamScanner

আনন্দ উদ্‌যাপনের জন্য কি আমরা দেশে দেশে যুদ্ধ করছি! আমরা তো কেবল আল্লাহর জন্য এসব অভিযানে যাই। কাজেই এই বিজয় শোভাযাত্রা এবং আনন্দ-ফুর্তি আমার কাম্য নয়।'

দিনের আলো শেষে চারপাশে যখন অন্ধকার নেমে এল, তখন সুলতান আবারও যাত্রা শুরুর নির্দেশ দিলেন। সবাইকে নিয়ে ফসফরাস প্রণালির অন্য পাশ ধরে তিনি ইস্তাম্বুলে ঢুকে সোজা চলে গেলেন রাজপ্রাসাদে। কেউ টেরও পেল না বিজয়ের নায়ক সুলতান সেলিম কখন কোন দিক দিয়ে ফিরে এসেছেন এই নগরে।

সুলতানের হুকুম

ইস্তাম্বুল শহরে বাস করত নানা ধর্মের মানুষ। এদের কেউ আর্মেনীয়, কেউ ইতালিয়ান, আবার অনেকে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা অভিবাসী ইহুদি। উসমানি সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে ইস্তাম্বুলে দিনে দিনে বিধর্মীদের সংখ্যা বাড়ছিল। সংখ্যায় বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি তাদের কিছু ঔদ্ধত্যও প্রকাশ পাচ্ছিল। কোনোভাবেই যেন তারা মুসলমানদের নেতৃত্ব ও সাফল্য মেনে নিতে পারছিল না। উসমানি সাম্রাজ্যের যে শত্রুরা সব সময় বাইরে থেকে চক্রান্তে লিপ্ত থাকত, তাদের অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল এই বিদেশিদের।

ইস্তাম্বুলে প্রায়ই নানা ধরনের হামলা ও আক্রমণের গুজব ছড়িয়ে পড়ত। এতে শহরবাসীর মধ্যে একধরনের অস্থিরতা তৈরি হতো। এসব গুজবের পেছনে বিদেশি বিধর্মীদের হাত থাকত। শহরের শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সামাজিক নিরাপত্তায় সমস্যা দেখা দিত তখন। উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতান সেলিমের দরবারে বিদেশিদের এ-জাতীয় নানা কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে নালিশ জমা হতো।

প্রতিনিয়ত এসব নালিশ শুনতে শুনতে বিরক্ত হতেন সুলতান সেলিম। একদিন কোনো এক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হলেন তিনি। সেদিনই হুকুম করলেন, ইস্তাম্বুলে যেসব বিধর্মী বাস করে, তাদের সবাইকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যেতে হবে। যে বিধর্মী ইসলাম ধর্ম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাবে, তাকে হত্যা করা হবে।

সুলতানের এই আদেশে উত্তেজনা ও ভয় ছড়িয়ে পড়ে বিধর্মীদের মধ্যে। মুহূর্তে শহরবাসীর মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে বিষয়টি। লোক মারফত খবর পেলেন শায়খুল ইসলাম আলি জামালি আফেন্দি। সুলতানের এই আদেশ শুনে মর্মাহত হলেন তিনি। কারণ, কোনো অমুসলিমকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে জোর

Scanned with CamScanner

করার বিধান ইসলামে নেই। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সুলতানের আদেশ ইসলাম অনুমোদন করে না।

কিন্তু সুলতানকে কে বোঝাবে বিষয়টি! যাঁর প্রতাপে দরবারের সবাই এবং প্রজারা থরথর করে কাঁপে, তাঁর আদেশের বিরুদ্ধে কথা বলা তো দূরের কথা, অমান্য করার সাধ্য নেই কারও।

শায়খুল ইসলাম তখন রওনা হলেন দরবারের উদ্দেশে। তিনি জানেন, সুলতানকে বোঝানোর গুরুদায়িত্ব তাঁকেই পালন করতে হবে।

দরবারে পৌঁছে ভেতরে ঢোকার অনুমতি চাইলেন শায়খুল ইসলাম। সুলতান অনুমতি দিলেন। ধীর পায়ে সুলতানের কাছে এগিয়ে গেলেন শায়খুল ইসলাম। তারপর বলা শুরু করলেন, 'আমি শুনেছি, আপনি শহরের সব বিধর্মীকে মুসলমান হতে আদেশ করেছেন।'

সুলতান তখনো উত্তেজিত। শায়খুল ইসলামের কথার উত্তরে বললেন, 'আপনি ঠিক শুনেছেন।'

শায়খুল ইসলামের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সাহসিকতা দরবারের সবার জানা। তাই সুলতান ও শায়খের এমন কথোপকথনে কেউ অবাক হলেন না। দরবারের সব নীরবতা ভেঙে শায়খুল ইসলাম সুলতানকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আপনার এই আদেশ ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। আপনার পূর্বপুরুষ সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহ এই ইস্তাম্বুল বিজয়ের পর এই শহরের কোনো বিধর্মীকে মুসলমান হতে বাধ্য করেননি। বরং প্রতিটি ধর্মের অনুসারীদের স্বাধীনতা দিয়েছেন তাঁদের নিজ নিজ ধর্ম পালনের। আপনাকেও ইসলামের এই বিধান মানতে হবে। আপনার পূর্বপুরুষেরা যে পথে চলেছেন, সেটি আপনারও অনুসরণীয়।'

এসব শুনেও রাগ কমেনি সুলতান সেলিমের। শায়খুল ইসলামের বিরোধিতা তিনি যেন মেনে নিতে পারছিলেন না। তাই বলে ফেললেন, 'দেখুন শায়খ আলি আফেন্দি, আপনি এখন রাষ্ট্রীয় আদেশের মধ্যে হস্তক্ষেপ করা শুরু করেছেন।'

সুলতানের প্রতি-উত্তরে আগের মতোই শান্ত শায়খুল ইসলাম। নির্ভয়ে তিনি বললেন, 'আমি কেবল আমার দায়িত্ব পালন করছি, মাননীয় সুলতান। ন্যায়ের আদেশ এবং অন্যায় থেকে আপনাকে বিরত রাখছি। এ ছাড়া আমার অন্য উদ্দেশ্য নেই।'

Scanned with CamScanner

সুলতান বললেন, 'দেখুন, রাষ্ট্রীয় আদেশ ও নিষেধের বিষয় আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন।'

শায়খুল ইসলাম উত্তর দিলেন, 'কখনোই না, মহামান্য সুলতান। আপনার পরকালীন কল্যাণের বিষয়গুলো দেখা আমার দায়িত্ব। আপনার আখেরাত ধ্বংস হতে দেব না। প্রয়োজনে যদি আমাকে অন্য পথ বেছে নিতে হয়, তবে আমি তা-ই করব।'

সুলতান নড়েচড়ে বসলেন, অন্য পথ?

শেষবারের মতো শায়খুল ইসলাম সুলতানের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'বিষয়টি অমান্য করলে আমি আপনাকে পদচ্যুত করার ব্যাপারে ফতোয়া দেব। কারণ, আপনি ইসলামি শরিয়ত লঙ্ঘন করে তখন অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত হবেন। কোনো অপরাধী মুসলমানদের সুলতান হতে পারেন না।'

শায়খুল ইসলামের শেষ কথাটি শুনে চুপ হয়ে গেলেন সুলতান সেলিম।

শায়খুল ইসলাম দরবার থেকে বের হয়ে যাচ্ছেন। ধীর গতিতে তাঁর প্রস্থানের দৃশ্য দেখছেন সুলতান এবং দরবারভর্তি সভাসদেরা।

Scanned with CamScanner

মহামতি সুলতান সুলায়মান

দীর্ঘদিন ধরে স্পেনের শাসন ছিল নেদারল্যান্ডসের বিভিন্ন অঞ্চলে। সুলতান সুলায়মান তখন উসমানি সাম্রাজ্যের সুবিস্তৃত অঞ্চলের প্রতাপশালী শাসক। নেদারল্যান্ডসের সীমান্তবর্তী একটি অঞ্চল দখলের প্রস্তুতি নিচ্ছিল স্পেন বাহিনী। এ আক্রমণ থেকে বাঁচতে ওই অঞ্চলবাসী সুলতান সুলায়মানের কাছে আশ্রয় চেয়ে সাহায্য প্রার্থনা করল। তাদের আরজি ছিল, 'আমরা খুব সংকটে দিন পার করছি। স্পেনের দখল থেকে আমাদের বাঁচান। আপনার উসমানি সেনাবাহিনী থেকে একদল সাহসী সেনা পাঠিয়ে আমাদের রক্ষা করুন।'

নেদারল্যান্ডসের ওই গ্রামবাসীর অনুরোধে সাড়া দিলেন সুলতান সুলায়মান। তবে সৈন্য পাঠিয়ে নয়, বরং তিনি দূত মারফত উসমানি সেনাবাহিনীর ব্যবহৃত ৪০টি পোশাক পাঠিয়ে দেন তাদের কাছে। সুলতান তাদের বলে দেন, 'তোমাদের সৈন্যদের গায়ে এই পোশাক পরিয়ে দাও। তোমাদের সুরক্ষার জন্য এ পোশাকই যথেষ্ট।'

গ্রামবাসী এই পোশাক পরিয়ে দিল তাদের প্রহরীদের গায়ে। এরপর ৩০ বছর ধরে ওই অঞ্চল অভিমুখে সেনা পাঠায়নি স্পেনের দখলদার শক্তি।

সুলতান সুলায়মানের শাসনামলে খ্যাতি ও শক্তির শীর্ষ চূড়ায় উসমানিদের অবস্থান কেমন ছিল, তা বোঝাতে এই ছোট ঘটনাটিই যথেষ্ট। ইউরোপের খ্রিষ্টানশক্তির কাছে মূর্তিমান আতঙ্ক সুলতান সুলায়মান ছিলেন একজন প্রজ্ঞাবান ও প্রতাপশালী সুলতান। তাঁর হাতে উসমানি সাম্রাজ্যের পরিধি যেমন সুদূর অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, তেমনিভাবে এর ভিতও আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে শক্তিশালী ও সুরক্ষিত হয়।

১৪৯৪ সালের ৬ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন সুলতান সুলায়মান। ১৫২০ সালের ২২ সেপ্টেম্বর তিনি উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতান হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। শাসনকালে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন ও সংকলনে তিনি গুরুত্ব দিতেন বলে তাঁর নামের শেষে 'আলকানুনি' উপাধি যুক্ত হয়।

Scanned with CamScanner

উসমানি সাম্রাজ্যের পরিধি বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ সাহসী ভূমিকা ছিল তাঁর। একাধারে ১৩টি যুদ্ধে তিনি সশরীরে অংশগ্রহণ করেন এবং নেতৃত্ব দেন। সুদীর্ঘ ৪৮ বছর ধরে তিনি উসমানি সাম্রাজ্যের প্রভাবশালী সুলতান হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

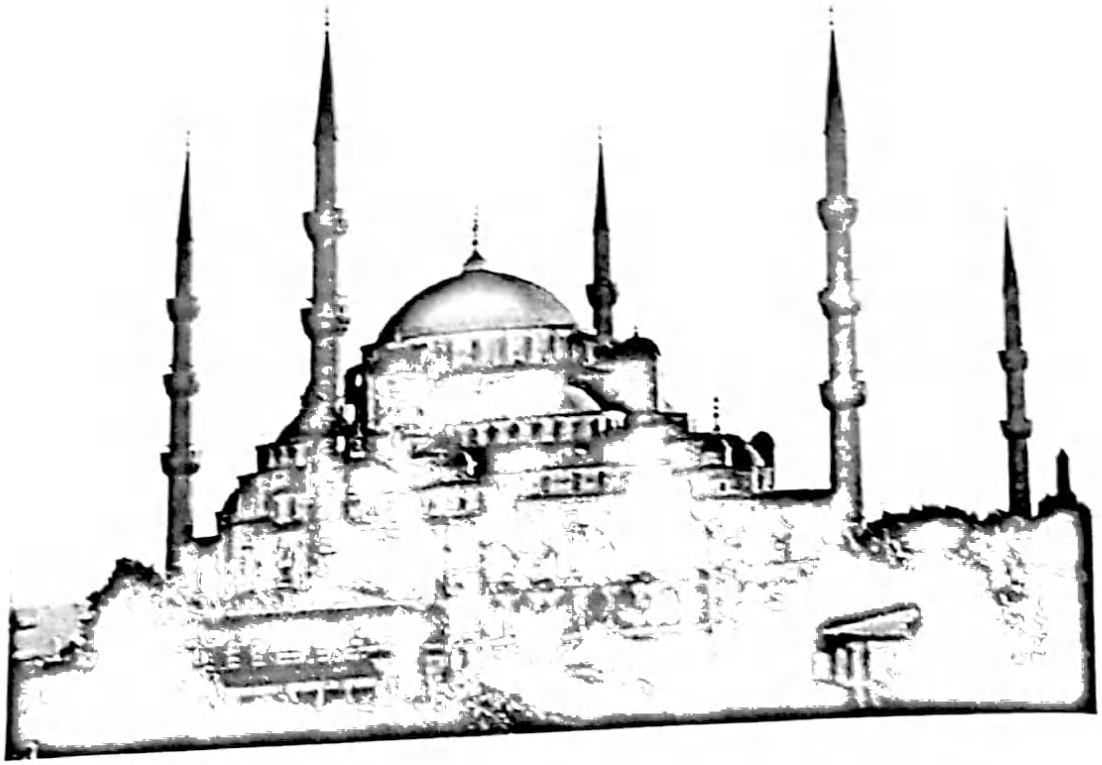
তাঁর শাসনামলে উসমানি সাম্রাজ্যের পরিধি এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি সর্বকালের সীমানা ছাড়িয়ে যায়। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি আইনকানুন প্রণয়ন করেন এবং সর্বত্র আইনের শাসন নিশ্চিত করেন। তাঁর প্রবর্তিত ২০০ বিধিবিধান-সংবলিত গ্রন্থ *আলকাওয়ানিনুল উসমানিয়া* নামে ১২ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

সুলতান সুলায়মানের শাসনামলে উসমানি সাম্রাজ্যের বড় বড় শহরে মদপানের পানশালা ছিল। এসব পানশালায় অমুসলিমদের জন্য মদপানের ব্যবস্থা থাকত। এমনকি অমুসলিম প্রজাদের জন্য শূকরের মাংস কেনাবেচা ও খাওয়ার অনুমতি ছিল। মদ ও শূকরের মাংস আমদানিকারক ও ব্যবসায়ীরা নিয়মিত উসমানি কোষাগারে কর জমা দিতেন।

সুলতান সুলায়মান যখন জানতে পারলেন, মদের পানশালা খোলা থাকায় কিছু মুসলিম যুবক-তরুণ মদপানের সুযোগ পাচ্ছে, তখন তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। নতুন ফরমান জারি করে উসমানি সাম্রাজ্যের সব শহরে মদের পানশালা অবৈধ ঘোষণা করেন। মদ তৈরি ও আমদানি নিষিদ্ধ করে তিনি কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

সুলতান সুলায়মান ৭২ বছর বয়সেও যুদ্ধের মাঠে উপস্থিত থেকে অভিযান পরিচালনা করতেন। এমনকি ৭৪ বছর বয়সে অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসকের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তিনি যুদ্ধের উদ্দেশে রওনা হন। ১৫৬৬ সালের ৭ সেপ্টেম্বর হাঙ্গেরিতে একটি দুর্গ অবরোধকালে তাঁর মৃত্যু হয়। তৎকালীন সেনাপ্রধান মুহাম্মদ পাশা তিন সপ্তাহ পর্যন্ত সুলতানের মৃত্যুসংবাদ গোপন রাখেন। পরে সুলতানের লাশ ইস্তাম্বুলে আনা হয় এবং দাফন করা হয়।

Scanned with CamScanner



জামে সোলায়মানের নেপথ্য কাহিনি

উসমানি সাম্রাজ্যের রাজধানী ইস্তাম্বুল শহরের কর্মকর্তারা ব্যস্ত সময় পার করছেন। দিনরাত তাঁরা শহর চষে বেড়াচ্ছেন। পুরো শহরে তাঁরা এমন জায়গার সন্ধান করছেন, যা মনোরম ও দর্শনীয় স্থান হিসেবে সবার পছন্দ হবে।

উপযুক্ত একটি জায়গা খুঁজে পাওয়া তাঁদের ভীষণ প্রয়োজন। কারণ, উসমানি সাম্রাজ্যের অধিপতি সুলতান সুলায়মান সম্প্রতি একটি মসজিদ নির্মাণের ইচ্ছা পোষণ করছেন। সুলতানের ইচ্ছা বাস্তবায়নে দরবারের সভাসদ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দিয়েছেন দ্রুততম সময়ে একটি চমৎকার জায়গা খুঁজে বের করার।

বিভিন্ন এলাকায় অনুসন্ধান করে সার্বিক বিবেচনায় ইস্তাম্বুল শহরের একটি জায়গা বেছে নেওয়া হলো। সুলতানের ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা এবং দরবারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সবার পছন্দ হলো জায়গাটি। ফলে সুলতানকে জানানো হলো, 'আপনার ইচ্ছা অনুসারে একটি মসজিদ নির্মাণের জন্য উপযুক্ত জায়গা আমরা নির্বাচন করেছি।'

সুলতান সুলায়মানের সম্মতি পাওয়ার পর স্থানীয় মালিকের কাছ থেকে ওই জায়গা কিনে নেওয়ার প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শুরু হলো। কিন্তু শুরুতেই

Scanned with CamScanner

বিপত্তি বেধে গেল। সুলতানের ইচ্ছা অনুসারে মসজিদ তৈরির জন্য যে পরিমাণ জায়গা নির্বাচন করা হয়েছে, এর সীমানায় একটি কুঁড়েঘর এই পরিকল্পনায় বাধা হয়ে দাঁড়াল। জানা গেল, কুঁড়েঘরটি এক ইহুদির এবং তিনি এ জায়গা ছেড়ে কোথাও যাবেন না। দরবারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মাথায় এবার আকাশ ভেঙে পড়ল।

সুলতানের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন পদস্থ ব্যক্তি এ সমস্যার সমাধানে মাঠে নামলেন। তাঁরা ওই কুঁড়েঘরে গেলেন এবং মালিকের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন। দরবার থেকে লোক এসেছে শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এল ইহুদি লোকটি। তারপর দুই পক্ষের মধ্যে কথোপকথন শুরু হলো–

–মহামান্য সুলতান সুলায়মানের দরবার থেকে এসেছি আমরা। আমাদের অধিপতি একটি মসজিদ তৈরি করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। সুলতানের ইচ্ছাপূরণে সেই মসজিদের জন্য আমরা কাজ করছি।

–খুব ভালো। কিন্তু তাতে আমার কী? আমি তো রাজমিস্ত্রি বা ঠিকাদার নই।

–তোমার কাছে এসেছি, কারণ এ জায়গায় যে মসজিদটি তৈরি হবে, তাতে তোমার এই জায়গাটিও আমাদের প্রয়োজন। তুমি এটি আমাদের কাছে বিক্রি করবে। এর বিনিময়ে তুমি কত মূল্য চাও, আমরা তা জানতে এসেছি।

–আমি এ জায়গা বিক্রি করব না। এটা আমার বড় পছন্দের জায়গা।

–এই ভাঙা ঘরে আর কদিন থাকবে তুমি! তোমাকে যে অর্থ দেওয়া হবে, তা দিয়ে তুমি অন্য জায়গায় বড় একটি বাড়ি কেনার সুযোগ পাবে। কাজেই এ জায়গাটুকু তুমি বিক্রি করে দাও।

–হোক এটা কুঁড়েঘর। কিন্তু আমার এখানে থাকতে ভালো লাগে। তা ছাড়া আমার দোকান থেকে এ জায়গাটি কাছে। যাতায়াতে সুবিধা। আমি এটা বিক্রি করব না।

নাছোড়বান্দা ইহুদিকে রাজি করাতে উসমানি দরবারের লোকেরা কয়েক গুণ বেশি দাম দেওয়ার প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু ওই ইহুদি কোনোভাবেই রাজি হলো না। খালি হাতে ফিরে এসে সুলতান সুলায়মানকে সবকিছু অবগত করলেন তাঁরা।

সুলতানের সামনে ঘটনার বিবরণ তুলে ধরা হলো। তাঁকে জানানো হলো, এক ইহুদির ছোট একটি কুঁড়েঘরের কারণে ওই জায়গাটি কাজে লাগানো যাচ্ছে না। সবকিছু শুনে তিনি নীরব থাকলেন।

সুলতানের অনুমতি চেয়ে একজন উপদেষ্টা প্রস্তাব দিলেন, 'মহামান্য সুলতান, আপনি আদেশ করলে ওই ইহুদি বেটাকে এ জায়গা থেকে উচ্ছেদ

Scanned with CamScanner

করা কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার। তাকে তাড়িয়ে ওর ঘরটি ভেঙে আমরা সেখানে মসজিদ তৈরির কাজ শুরু করতে পারি।'

উসমানি সাম্রাজ্যের প্রবল শক্তিধর সুলতান সুলায়মান এমন প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। তিনি বললেন, 'আমরা মসজিদ তৈরি করতে গিয়ে কারও সঙ্গে তো অন্যায় করতে পারি না। এর একটি সুষ্ঠু সমাধান আমাদেরই খুঁজে বের করতে হবে।'

পরদিন সুলতান দরবারের শায়খুল ইসলামের কাছে বিষয়টি জানিয়ে সমাধান চাইলেন। শায়খুল ইসলাম জানালেন, এসব ব্যাপারে ইসলামের বিধান অত্যন্ত স্পষ্ট। ইহুদি লোকটি তার সম্পত্তি বিক্রি করতে না চাইলে তাকে জোর করে বিক্রি করানো অথবা তাকে কোনো শাস্তি দেওয়া সুলতানের জন্য বৈধ নয়। বলপ্রয়োগ করে কোনো উপায়ে তাকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করা ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ। ইহুদি লোকটি মারা গেলে এ সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারীরা পাবে। তাদেরও এ জায়গা বিক্রির ব্যাপারে জোর করা যাবে না। বরং এ জায়গাটি পেতে হলে একমাত্র সমাধান হলো, যেকোনো মূল্যে ইহুদিকে তার জায়গাটি বিক্রি করতে রাজি করানো।

শায়খুল ইসলামের উত্তর পেয়ে কিছুক্ষণ ভাবলেন সুলতান সুলায়মান। তারপর সংশ্লিষ্টদের বললেন, 'আমি নিজে ওই ইহুদির কাছে যাব এবং তার ওই জায়গা কেনার ব্যাপারে প্রস্তাব দেব।'

পরদিন স্বয়ং সুলতান হাজির হলেন ইহুদি লোকটির ঘরে। দরজার কড়া নেড়ে সুলতান জানতে চাইলেন, মালিক আছেন ভেতরে?

দরজা খুলে সুলতানকে দেখে অবাক হয়ে গেল ইহুদি গৃহকর্তা। সুলতান তাকে বললেন, 'এখানে আমি একটি মসজিদ তৈরি করতে চাই। তোমার এ জায়গাটুকু না পেলে সেই কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। তুমি তোমার এই ঘর এবং জমি আমার কাছে বিক্রি করো। এর বিনিময়ে তোমাকে সাধারণ বাজারদরের চেয়ে বেশি মূল্য দেওয়া হবে।'

স্বয়ং সুলতানের মুখে এমন প্রস্তাব আর এত অর্থের কথা শুনে ইহুদি লোকটি তখনই রাজি হয়ে গেল। সানন্দে সে তার জমি বিক্রিতে সম্মতি দিল। খুশিমনে ফিরে এলেন সুলতান সুলায়মান এবং তাঁর সঙ্গীরা।

অল্প কদিনের মধ্যে কিনে নেওয়া হলো ইহুদির ভাঙা ঘর এবং তার জমি। চমৎকার অবস্থানে পুরো জায়গায় মসজিদ তৈরিতে কোনো বাধা-বিপত্তি থাকল না আর। ১৫৫০ সালে এর নির্মাণকাজ শুরু হয়ে প্রায় আট বছর ধরে

Scanned with CamScanner

চলে এর নির্মাণযজ্ঞ। ১৫৫৭ সালে এর উদ্বোধন করা হয়। জামে সুলায়মান নামে আজও এই মসজিদ প্রতিদিন হাজারো পর্যটককে মুগ্ধ করে।

উসমানি সাম্রাজ্যের বিখ্যাত স্থাপত্যবিদ সান্নান পাশা এই মসজিদের নকশা ও নির্মাণের কাজ দেখাশোনা করেন। সেকালে উসমানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল থেকে প্রসিদ্ধ প্রকৌশলী ও মিস্ত্রিদের আনা হয়েছিল এর নির্মাণকাজে অংশ নিতে। মসজিদটি তৈরি হওয়ার পর সান্নান পাশা বলেছিলেন, 'এ পর্যন্ত আমি যেসব কাজ করেছি, এর মধ্যে সবচেয়ে সেরা কাজের নিদর্শন হয়ে থাকবে এই মসজিদ।'

সুলতানের নির্দেশে এ মসজিদের চারপাশে তৈরি করা হয় কবরস্থান, হাসপাতাল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্থাপনা। বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা না থাকায় ২৭৫টি মশালের আলোয় আলোকিত করা এ দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্য।

সুলতান সুলায়মানের তৈরি উসমানি স্থাপত্যশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন হিসেবে আজ অবধি তা মাথা উঁচু করে আছে সগৌরবে। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সুলতান সুলায়মানের ন্যায়পরায়ণতা ও চারিত্রিক উদারতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পুত্রঘাতক সুলতান সুলায়মান

বড় অস্থির সময় পার করছেন সুলতান সুলায়মান। তিনি চিন্তিত ও ভীত। এই চিন্তা ও ভয়ের কারণ তাঁর পুত্র মুস্তফা। শাহজাদা মুস্তফার কর্মকাণ্ডে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতাপশালী অধিপতি সুলতান সুলায়মানের শরীর ও মন ভালো নেই বেশ কিছুকাল ধরে। ইরানের কুচক্রী শাসক শাহের বিরুদ্ধে আক্রমণের প্রস্তুতি এবং শাহজাদা মুস্তফার ব্যাপারে অস্বস্তি তাঁকে অস্থির করে রেখেছে।

সুলতান সুলায়মানের ঔরসজাত পুত্র মুস্তফা, তাঁর মৃত্যুর পর যিনি হবেন এই সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী, তাঁকে নিয়ে সুলতানের দুশ্চিন্তা, সন্দেহ ও ভয়ের আগুনে কয়েক বছর ধরে ঘি ঢালছেন তাঁরই স্ত্রী খুররম সুলতান। সুলতানের অন্য স্ত্রীদের মধ্যে খুররমের গর্ভে জন্ম নিয়েছেন তিন শাহজাদা : বায়েজিদ, জাহাঙ্গীর ও সেলিম। বায়েজিদ ও জাহাঙ্গীর দুটি প্রদেশের আঞ্চলিক শাসক হিসেবে ব্যস্ত থাকলেও সেলিমের এসব নিয়ে কোনো মোহ নেই। দিনরাত সঙ্গী ও সখীদের নিয়ে আনন্দ বিনোদনে মত্ত সময় পার করেন এই কনিষ্ঠ শাহজাদা।

Scanned with CamScanner

অন্যদিকে শাহজাদা মুস্তফার মায়ের নাম মাহ দাওরান খাসেকি, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে তিনি খুররমের চেয়ে কম। সুলতানের স্ত্রী হিসেবে যেটুকু সম্মান তাঁর প্রাপ্য, তিনি তাতেই সন্তুষ্ট।

সুলতান সুলায়মান জানেন, তাঁর দাপুটে স্ত্রী খুররম ও দরবারের ছদরে আজম রুস্তম পাশা এবং রাজপ্রাসাদের কয়েকজন প্রভাবশালী সদস্য চাচ্ছেন, সুলতানের মৃত্যুর পর শাহজাদা বায়েজিদ যেন উসমানি সাম্রাজ্যের নতুন সুলতান হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু সেনাবাহিনীর সামরিক নেতা এবং সাম্রাজ্যের আলেমদের কাছে শাহজাদা মুস্তফা বেশি জনপ্রিয়। অন্য দুজন শাহজাদা জাহাঙ্গীর ও সেলিম, এঁদের নিয়ে কারও চিন্তা নেই, দুশ্চিন্তাও নেই।

সুলতানের তিন শাহজাদার জননী খুররম সুলতান শাহজাদা মুস্তফাকে নানা কারণে পছন্দ করেন না। উসমানি সাম্রাজ্যের সিংহাসনে ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী হিসেবে নিজের পুত্র শাহজাদা বায়েজিদকে দেখতে চান তিনি। সুলতান সুলায়মানের কন্যা মেহেরমাহ সুলতানের স্বামী এবং ছদরে আজম রুস্তম পাশার মতামতও খুররমের পক্ষে।

সুলতানের স্ত্রী ও কন্যার জামাতাসহ আরও কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সদস্য মিলে পরিকল্পনা করলেন, যেভাবেই হোক পথের কাঁটা মুস্তফাকে সরিয়ে ফেলতে হবে। সুলতানের চোখে তাঁর বড় পুত্র শাহজাদা মুস্তফাকে ভয়ংকর শত্রু হিসেবে তুলে ধরতে হবে এখন থেকে।

সুলতান সুলায়মান যখন ইরানের বিরুদ্ধে তৃতীয়বারের মতো যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তখনই এর মোক্ষম সুযোগ এল। সুলতানের স্ত্রী, জামাতা এবং ঘনিষ্ঠ লোকেরা সরাসরি শাহজাদা মুস্তফার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ অবস্থান নেন। সবাই মিলে পরিকল্পনা করে সুলতানের কাছে ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে খবর পাঠাতে লাগল, শাহজাদা মুস্তফা সুলতানের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ইরানের শাসক শাহের সঙ্গে মুস্তফার চুক্তি হয়েছে। ফলে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালে সুলতান সুলায়মানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবেন তাঁর ভরসার পুত্র মুস্তফা। এরপর ইরানের শাহের কন্যার সঙ্গে শাদি হবে তাঁর, এমন পরিকল্পনাও চূড়ান্ত।

অন্তঃপুর ও দরবারের ছদরে আজমসহ বেশ কয়েকজন উজিরের কাছ থেকে একই সংবাদ বারবার পেতে পেতে বৃদ্ধ সুলতানের মনেও সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বীজ জন্ম নেয়। এক কান দুই কান করে এই গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হলো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কাছে। সেনাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে এ নিয়ে নানা কথাবার্তা শুরু হলো।

Scanned with CamScanner

সুলতান সুলায়মান বার্ধক্যের কারণে দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছেন। প্রতিদিন তাঁর কাছে দরবারের ব্যক্তিরা এসে শাহজাদা মুস্তফাকে নিয়ে একই গল্প শোনাচ্ছেন। প্রথম দিকে এমন কথা শুনে বিশ্বাস করতে চাননি তিনি। বরং বলেছিলেন, 'আমার পুত্র কখনোই এমন অন্যায় করতে দুঃসাহস করবে না। কুচক্রী মহল তাদের স্বার্থ উদ্ধারে এসব ছড়াচ্ছে।'

ধীরে ধীরে শাহজাদা মুস্তফাবিরোধী বলয় শক্তিশালী হতে থাকে। অন্তঃপুর থেকে খুররম সুলতানের বহুমুখী প্ররোচনা ও অব্যাহত গুজবে সুলতান সুলায়মান একপর্যায়ে প্রভাবিত হলেন। সন্দেহের দানা বাঁধল তাঁর মনে, যা শোনা যাচ্ছে, তবে কি শাহজাদা মুস্তফা তাঁর পুত্র হয়েও ক্ষমতার লোভে ইরানের শাহের সঙ্গে চক্রান্ত করছে! তাঁকে হত্যা করে সিংহাসন দখলের পাঁয়তারা হচ্ছে মুস্তফার নেতৃত্বে!! সুলতানের মনে পুত্রের প্রতি অবিশ্বাসের ছায়া গাঢ় হতে থাকে দিনে দিনে।

শাহজাদা মুস্তফার বয়স তখন ৪০। বৃদ্ধ পিতার ইরান আক্রমণে তিনি তাঁর সঙ্গে যেতে চাইলেন। উসমানিদের চিরশত্রু ইরানি বাহিনীকে শায়েস্তা করতে নিজের উদ্যোগে ৩০ হাজার সৈন্য জোগাড় করলেন ইরান আক্রমণের জন্য। শাহজাদা মুস্তফার এ আগ্রহ ও উদ্যমী তৎপরতা সুলতান সুলায়মানকে সন্দেহপ্রবণ করে তোলে।

ওদিকে অন্তঃপুরের ভেতর থেকে স্ত্রী খুররম, সুলতানের কন্যা, জামাতা রুস্তম পাশাসহ অনেকেই অব্যাহতভাবে সুলতানকে উসকে দিচ্ছেন। তাঁদের দাবি, শাহজাদা মুস্তফা অতি আগ্রহ দেখিয়ে যে ৩০ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করছেন, এরা শাহজাদা মুস্তফার অনুগত থাকবে। আপনি যখন ইরানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন, তখন এরা আপনার ওপর চড়াও হবে।

বৃদ্ধ সুলতান সুলায়মানের মনে হতে থাকল, সুলতানদের ইতিহাসে পুত্রের হাতে পিতার মৃত্যু খুব স্বাভাবিক বিষয়। ফলে শাহজাদা মুস্তফাকে ঘিরে কোনো সন্দেহ এখন আর উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সুলতান তাঁর পুত্র শাহজাদা মুস্তফাকে জীবন-মরণের শত্রু ভাবতে শুরু করলেন।

উসমানি সাম্রাজ্যের প্রবল প্রতাপশালী সুলতান সুলায়মান নিজের পুত্রভয়ে ভীত হয়ে পড়লেন। সন্দেহ, অবিশ্বাস, শঙ্কা তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত অস্থির করে তুলল।

সাম্রাজ্যের মূল কর্তা সুলতান যখন ভুল পথে হাঁটেন, তখন তাঁর সঙ্গে পুরো সাম্রাজ্যও যেন ভুল পথে পা বাড়ায়। পুত্রকে নিয়ে সন্দেহ ও ভয়ের বশবর্তী হয়ে সুলতান সেকালের শায়খুল ইসলাম আবু সউদ আফেন্দির কাছে

Scanned with CamScanner

ফতোয়া চাইলেন এ ব্যাপারে করণীয় জানতে চেয়ে। শায়খুল ইসলাম ফতোয়া দিলেন, সাম্রাজ্য বিনাশ এবং বিদ্রোহের আশঙ্কা থাকলে শাহজাদা মুস্তফাকে হত্যা শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ বলে গণ্য। এমন ফতোয়ার পর শাহজাদা মুস্তফাকে হত্যা করার পথে আর কোনো বাধা থাকল না চক্রান্তকারীদের সামনে।

১৫৫৩ সাল বা ৯৬০ হিজরির শাওয়াল মাসের কোনো এক প্রহরে পিতা সুলতান সুলায়মানের সঙ্গে তাঁর তাঁবুতে দেখা করতে গেলেন পুত্র শাহজাদা মুস্তফা। সুলতানের জামাতা ও ছদরে আজম রুস্তম পাশার অনুগত প্রহরীরা সেখানে তাঁকে ধরে ফেলে এবং সুলতানের সামনে এনে তাঁকে হত্যা করে।

ইতিহাস এই ভুল ক্ষমা করেনি। নিরপরাধ শাহজাদা মুস্তফাকে হত্যার খবরে উসমানি সাম্রাজ্যের গুণী ব্যক্তিদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। উসমানি বাহিনীর শীর্ষ পদস্থ নেতারা সুলতানের এমন কাণ্ডে নাখোশ হন।

ইতিহাসবিদদের অনেকে লিখেছেন, মিথ্যা সন্দেহ ও পারিবারিক প্ররোচনায় শাহজাদা মুস্তফাকে হত্যা করে সুলতান সুলায়মান যেন উসমানি সাম্রাজ্যের পতন ডেকে আনলেন। কারণ, পরবর্তী সময়ে হিসাব করে দেখা গেছে, উসমানি সাম্রাজ্যে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ, বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ে মূলত শাহজাদা মুস্তফাকে হত্যার পর থেকে। ধীরে ধীরে অস্থির সময় গ্রাস করে পুরো সাম্রাজ্যকে।

পিতার আদেশে নির্দোষ ভাইয়ের এমন মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড মেনে নিতে পারেননি শাহজাদা জাহাঙ্গীর। বরং পরিবার ও দরবারের কুচক্রী মহলের এই অন্যায় আচরণ তাঁকে শঙ্কিত করে তোলে। ভাইয়ের মৃত্যুতে শোক ও ষড়যন্ত্রকারীদের ভয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন জাহাঙ্গীর। একই বছর কিছুদিন পর মৃত্যুবরণ করেন এই শাহজাদা।

শাহজাদা মুস্তফাকে হত্যার মূল ইন্ধনদাতাদের অন্যতম একজন সুলতান সুলায়মানের জামাতা ও ছদরে আজম রুস্তম পাশা ছিলেন শাহজাদা মুস্তফা হত্যাকাণ্ডের অন্যতম হোতা। উসমানি সেনাবাহিনীর ভেতর তাঁকে নিয়ে অসন্তোষ শুরু হওয়ায় সুলতান সুলায়মান তাঁকে পদচ্যুত করেন। এভাবেই বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন মহলে।

যে শাহজাদা বায়েজিদকে ভবিষ্যতের সুলতান হিসেবে নিশ্চিত করতে শাহজাদা মুস্তফাকে হত্যার এই নির্মম কাণ্ড ঘটালেন সুলতান সুলায়মানের স্ত্রী খুররম ও অন্য ঘনিষ্ঠজনেরা, সেই শাহজাদা বায়েজিদের ভাগ্যে জোটেনি উসমানি সাম্রাজ্যের সিংহাসন। এর পেছনে রয়েছে করুণ ইতিহাস।

Scanned with CamScanner

১৫৫৮ সালে সুলতান সুলায়মান এক ফরমান জারি করেন। এতে শাহজাদা বায়েজিদকে কোতাহিয়া অঞ্চল থেকে আমসিয়া অঞ্চলে বদলি করা হয় শাসক হিসেবে। আর শাহজাদা সেলিমকে বদলি করা হয় মেগনিসা থেকে কোনিয়াতে। কিন্তু কিছু মানুষের কথায় সুলতান পিতার এই ফরমান প্রত্যাখ্যান করেন শাহজাদা বায়েজিদ।

পুত্রের অবাধ্যতায় ক্ষুব্ধ হন সুলতান সুলায়মান। তিনি সেনাবাহিনী পাঠান তাঁকে শায়েস্তা করার জন্য। পিতার পাঠানো উসমানি বাহিনীর সামনে যুদ্ধ করে টিকতে পারেননি শাহজাদা বায়েজিদ। তিনি পালিয়ে আশ্রয় নেন ইরানের শাহের কাছে।

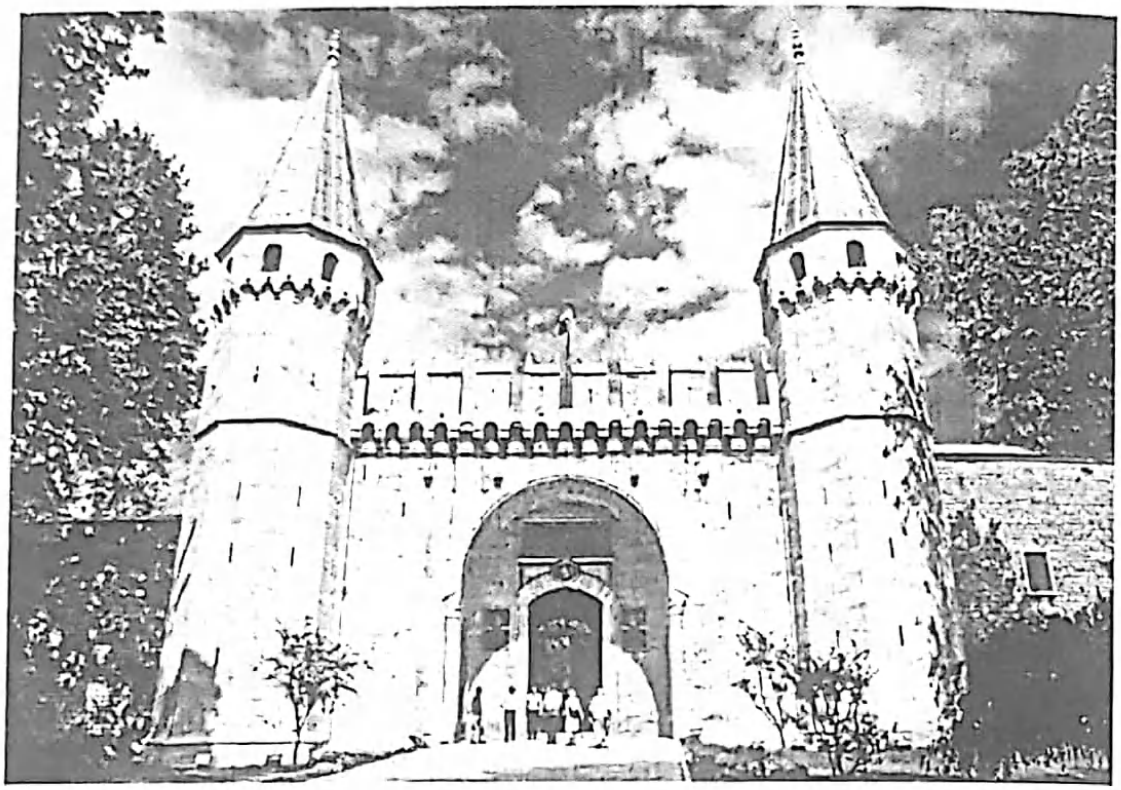
সুলতান সুলায়মানের পক্ষ থেকে শাহজাদা বায়েজিদকে হস্তান্তরের প্রস্তাব পাঠানো হয় ইরানের শাহের কাছে। আলাপ-আলোচনার পর শাহজাদা বায়েজিদকে তাঁর পিতার হাতে তুলে দেন শাহ। বিদ্রোহী পুত্রের অন্যায় এবং ঔদ্ধত্য ক্ষমা করেননি সুলতান সুলায়মান।

১৫৬২ সালে শাহজাদা বায়েজিদ এবং তাঁর চার পুত্রকে একসঙ্গে হত্যা করা হয় সুলতানের আদেশে। এবারও এ হত্যার বৈধতা দিয়ে ফতোয়া দেন শায়খুল ইসলাম আবু সউদ আফেন্দি। যদিও শাহজাদা বায়েজিদ সত্যিই বিদ্রোহ করেছিলেন বলে এই হত্যার পক্ষে দলিল খুঁজতে বেগ পেতে হয়নি শায়খুল ইসলামের।

সুলতান সুলায়মান ছিলেন উসমানি সাম্রাজ্যের প্রসিদ্ধ এবং প্রতাপশালী সুলতানদের মধ্যে অন্যতম একজন। কিন্তু যেভাবে তিনি স্ত্রী ও পরিবারের সুবিধাবাদী সদস্যদের প্ররোচনায় নিজের ঔরসজাত পুত্র শাহজাদা মুস্তফাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছেন, তা কোনোভাবেই মেনে নেওয়ার নয়। নির্দোষ শাহজাদা মুস্তফার রক্তের ফোঁটা অভিশাপ হয়ে গ্রাস করে উসমানি পরিবার ও সাম্রাজ্য।

সুলতান সুলায়মান একে একে তাঁর তিন পুত্রকে হারালেন জীবদ্দশায়। বাকি থাকলেন কেবলই শাহজাদা সেলিম, আলস্যে ভোগ-বিলাস আর আনন্দ-ফুর্তি ছিল যাঁর প্রিয়। ফলে সুলতান সুলায়মানের মৃত্যুর পর তাঁর আর কোনো পুত্র জীবিত না থাকায় এই অযোগ্য শাহজাদার হাতেই অর্পিত হয় উসমানি সাম্রাজ্যের শাসনভার। উসমানিদের পতনপর্বের শুরু তাঁর হাত ধরেই।

Scanned with CamScanner



সুলতান সুলায়মানের অসিয়ত

উসমানি সুলতানদের জন্য নির্মিত তোপকাপি প্রাসাদে বাস করেন সুলতান সুলায়মান। প্রাসাদের সীমানাজুড়ে গাছ-গাছালিঘেরা সবুজ বাগান। সুলতানের প্রাসাদ ও উদ্যান পরিচর্যা করেন কয়েকজন মালি। সুলতান সুলায়মান অবসরে বাগানে এসে বসেন, প্রকৃতির সান্নিধ্যে সময় কাটাতে ভালোবাসেন তিনি।

বাগানের মালিরা দেখতে পেলেন, তোপকাপি প্রাসাদ-লাগোয়া বাগানে বেশ কিছু গাছের শিকড়ে পিঁপড়ার দল বাসা বেঁধেছে। গাছ বেয়ে ওপরে উঠছে অসংখ্য পিঁপড়ার সারি, আবার নিচে নামছে আরেক সারি। বিভিন্ন কীটনাশক ও ওষুধ প্রয়োগ করে পিঁপড়ার বিপদ ঠেকানো যাচ্ছে না। ফলে উপায় না দেখে উসমানি দরবারের বাগান বিশেষজ্ঞদের জানানো হলো এ সমস্যার কথা। তাঁরা জানালেন, গাছের আগা থেকে চুন ঢেলে দিতে হবে। এতে পিঁপড়ার উৎপাত চিরতরে বন্ধ হবে।

বাগান পরিচর্যায় সংশ্লিষ্ট প্রধান মালি সুলতান সুলায়মানের কাছে বিষয়টি জানালেন। চুন ব্যবহার করে বাগানে পিঁপড়া সমস্যা সমাধানের অনুমতি চাইলেন তাঁর কাছে।

সুলতান সুলায়মান বললেন, এ ব্যাপারে শায়খুল ইসলামের মতামত নেওয়া হোক। তারপর তিনি সিদ্ধান্ত দেবেন।

Scanned with CamScanner

সুলতান ব্যক্তিগত দূত মারফত একটি পত্র পাঠালেন শায়খুল ইসলাম আবুল বারাকাত তুর্কির কাছে। এতে তিনি কবিতার ছন্দে এই সমস্যা এবং বাগান বিশেষজ্ঞের দেওয়া সমাধান উল্লেখ করে জানতে চাইলেন, এভাবে চুন ব্যবহার করে পিঁপড়া ধ্বংস করা ইসলামে বৈধ কি না।

সুলতানের পত্র পেয়ে শায়খুল ইসলামও কবিতার ভাষায় উত্তর পাঠালেন। সুলতান সুলায়মান ওই কবিতা পড়ে বুঝতে পারলেন, এভাবে পিঁপড়া ধ্বংস করে সমস্যার সমাধান ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ নয়।

সামান্য পিঁপড়া মেরে ফেলার ব্যাপারে যে সুলতান সুলায়মানের এমন সাবধানতা, তাঁকে নিয়ে নানা রকম কল্পকাহিনি ও বানোয়াট গল্প সাজানো হয়েছে ইউরোপীয়দের লেখা গ্রন্থে। সেসব পড়লে সাধারণ পাঠকের মনে হতে পারে, সুলতান সুলায়মান ছিলেন একজন বর্বর, নির্দয় ও ক্ষমতালোভী শাসক।

ব্যক্তিগত জীবন এবং সাম্রাজ্য পরিচালনা-সম্পর্কিত ছোট-বড় সব বিষয়ে সুলতান সুলায়মান দ্বারস্থ হতেন তাঁর শিক্ষক আবুল বারাকাতসহ সাম্রাজ্যের অন্য আলেমদের। তাঁদের মতামত ও অনুমতি নিয়ে তিনি সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতেন।

দীর্ঘ ৪৮ বছর ধরে উসমানি সাম্রাজ্য শাসন করার পর সুলতান সুলায়মান যখন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন, তখন তিনি রাজধানী ইস্তাম্বুলের বাইরে এক যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। পথে তাঁর মৃত্যু হয়। সৈন্যদের মনোবল যাতে ভেঙে না পড়ে অথবা সুযোগসন্ধানী কুচক্রীরা যেন সুযোগ পেয়ে না যায়, সে জন্য উসমানি বাহিনীর সেনাপ্রধান সুলতান সুলায়মানের মৃত্যুসংবাদ গোপন রাখেন।

কিছুদিন পর সুলতানের লাশ ইস্তাম্বুলে নিয়ে আসার পর যখন কাফন-দাফনের প্রস্তুতি শুরু হয়, তখন অন্তঃপুর থেকে জানানো হয়, সুলতান মৃত্যুর আগে অসিয়ত করেছিলেন, তাঁর খাসকামরায় একটি ছোট বাক্স রাখা আছে, সেটি যেন তাঁর সঙ্গে কবরে দাফন করা হয়।

সুলতান সুলায়মানের এমন অসিয়তের খবরে কৌতূহল ছড়িয়ে পড়ে তাঁর ঘনিষ্ঠজন এবং দরবারের উজিরদের মধ্যে। সবার জিজ্ঞাসা, কী আছে এই বাক্সের ভেতরে! অর্থ-কড়ি, মণি-মুক্তা নাকি এর চেয়েও মূল্যবান কিছু!

সুলতানের পরিবার এবং দরবারের পক্ষ থেকে শায়খুল ইসলামের কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলো। সুলতানের অসিয়ত অনুযায়ী তাঁর লাশের সঙ্গে এই বাক্স কবরে রাখা যাবে কি না, এ মর্মে শায়খুল ইসলামের ফতোয়ার অপেক্ষা শুরু হলো।

Scanned with CamScanner

অন্য আলেমদের সঙ্গে পরামর্শ করে শায়খুল ইসলাম জানালেন, যদি এতে মূল্যবান সম্পদ রাখা থাকে, তবে মাটির নিচে দাফন করে তা নষ্ট করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে সুলতানের অসিয়ত কার্যকর করা হবে না। তাই প্রথমে বাক্সটি খুলে দেখা দরকার, এর ভেতরে কী রাখা আছে। বাক্সের ভেতরে থাকা বস্তু সম্পর্কে না জেনে সুলতানের শেষ ইচ্ছা পূরণ করার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া যাবে না।

শায়খুল ইসলাম এবং অন্য আলেমদের উপস্থিতিতে সুলতানের খাসকামরা থেকে নিয়ে আসা হলো বাক্স। দরবারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং উজিরদের উপস্থিতিতে খোলা হলো সেটি। বাক্সের ভেতর যা পাওয়া গেল, তা দেখে শায়খুল ইসলাম এবং আলেমরা বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেলেন। সুলতানের পরিবার ও দরবারের লোকেরাও হতবাক হয়ে পড়ল।

অবাক বিস্ময়ে সবাই তাকিয়ে দেখে, বাক্সটি ভর্তি হয়ে আছে শায়খুল ইসলাম ও অন্য আলেমদের দেওয়া বিভিন্ন ফতোয়া-সংবলিত টুকরো টুকরো কাগজে। সাম্রাজ্য পরিচালনার বিভিন্ন বিষয়ে নানা সময়ে সুলতান সুলায়মান দরবারের শায়খুল ইসলাম এবং অন্য আলেমদের কাছে যেসব সমাধান চাইতেন, সেসবের উত্তরে লেখা তাঁদের ফতোয়াগুলো এই বাক্সে সযত্নে জমিয়ে রেখেছিলেন সুলতান।

পরিবারের কাছে তিনি অসিয়ত করে বলেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর এই ফতোয়াগুলো যেন তাঁর কবরে দাফন করা হয়। কিয়ামতের মাঠে মহান আল্লাহ যখন তাঁকে সাম্রাজ্যের শাসন বা কোনো আদেশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন, তখন তিনি আলেমদের এ ফতোয়াগুলোকে তাঁর সিদ্ধান্তের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরবেন।

সুলতানের এ আচরণ দেখে উপস্থিত শায়খুল ইসলামের দুই চোখ বেয়ে নীরবে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। অন্য আলেমরা তখন অবাক নয়নে তাকিয়ে আছেন সুলতানের নীরব চেহারার দিকে। শায়খুল ইসলাম সুলতানের মরদেহের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর মৃত সুলতানের মুখোমুখি হয়ে তিনি বললেন, 'আমাদের ফতোয়াগুলোকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে নিজেকে রক্ষা করার কী চমৎকার বুদ্ধি আপনার! কিন্তু এসব সমাধান দেওয়ার বেলায় আমাদের যদি ভুল হয়ে থাকে, তবে কে বাঁচাবে আমাদের!!'

দুই হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়লেন শায়খুল ইসলাম।

Scanned with CamScanner

দুর্বলচিত্তের তিন সুলতান

সুলতান দ্বিতীয় সেলিম

প্রবল প্রতাপশালী সুলতান সুলায়মানের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে উসমানি সাম্রাজ্যের শৌর্যবীর্যের অধ্যায় শেষ হয়। ১৫৬৬ সালে সুলতানের মৃত্যুর ২৩ দিন পর ইস্তাম্বুলে উসমানি সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র সুলতান দ্বিতীয় সেলিম। ইস্তাম্বুলে রাজকীয় আনুষ্ঠানিকতায় বরণ করে নেওয়া হয় ৪২ বছর বয়সী নতুন সুলতানকে।

এরপর সুলতান সেলিম যান বেলগ্রেডে। সেখানে আবারও তাঁর সিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষে সেনাবাহিনীর জন্য রাজকীয় উৎসবের আয়োজন করা হয়। কিন্তু চাহিদামতো বকশিশ না পাওয়ায় নতুন সুলতানের ওপর ক্ষুব্ধ হয় সেনাবাহিনীর সদস্যরা। ফলে ছড়িয়ে পড়ে অস্থিরতা। উসমানি সাম্রাজ্যের বিপদের ঘনঘটা এখান থেকেই শুরু হলো।

সুলতান দ্বিতীয় সেলিমের জীবন ও চরিত্র আগেকার সব সুলতানের চেয়ে ভিন্ন ছিল। সুলতানি বুদ্ধিমত্তা ও শাসকসুলভ দূরদর্শিতা এবং ব্যক্তিত্ব গুণাবলি তাঁর ছিল না। পুরো শাসনামলে তিনি কোনো যুদ্ধে নিজে নেতৃত্ব দেননি।

সুলতান দ্বিতীয় সেলিমের শাসনামলে সাম্রাজ্য পরিচালনায় মূল ভূমিকা পালন করেছেন ছদরে আজম সুকুল্লু মুহাম্মদ পাশা। যোগ্য ছদরে আজমের মেধা ও বুদ্ধির বদৌলতে সুলতান দ্বিতীয় সেলিম নিশ্চিন্তে রাজকীয় জীবনযাপনের সুযোগ পান।

উসমানি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর প্রথমবারের মতো উসমানি সেনাবাহিনী যুদ্ধে পরাজিত হয় সুলতান দ্বিতীয় সেলিমের শাসনামলে। ১৫৭১ সালে ইনাবখতি যুদ্ধে খ্রিষ্টানশক্তির সামুদ্রিক বহরের সামনে পরাজয়বরণ করে। এর মধ্য দিয়ে ইউরোপজুড়ে উসমানি সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যদিও এর কিছুদিন পরই নতুনভাবে উসমানি বাহিনী শক্তি সঞ্চয় করে এবং মস্কো জয় করতে সক্ষম হয়।

Scanned with CamScanner

সুলতান দ্বিতীয় সেলিমের শাসনামলে সন্ধিচুক্তির সংখ্যা বেড়ে যায়। সামরিক অভিযানে নতুন অঞ্চল জয়ের পরিবর্তে ভিনদেশি শাসকদের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করাই যেন উসমানি সাম্রাজ্যের নিয়মিত কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

সুলতান সুলায়মান উসমানি সাম্রাজ্যে মদের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন, সুলতান দ্বিতীয় সেলিম তা উঠিয়ে দেন। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন শহরে আবারও মদের পানশালা খুলে দেওয়া হয় তাঁর আদেশে। ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রশাসনে ঘুষ ও দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ে মহামারি আকারে।

১৫৭৪ সালে ৫০ বছর বয়সে নিজের প্রাসাদে মৃত্যুবরণ করেন সুলতান দ্বিতীয় সেলিম। তিনিই প্রথম উসমানি সুলতান, যাঁর জন্ম ও মৃত্যু দুটোই ইস্তাম্বুল শহরে হয়েছিল।

ব্যক্তিজীবনে তিনি সংগীত ও চিত্রকলাচর্চায় আগ্রহী ছিলেন। সুলতান হয়েও এসবে মগ্ন থাকতে ভালোবাসতেন বেশি। ভোগবিলাসে আসক্ত সুলতান দ্বিতীয় সেলিমকে নিয়ে বিভিন্ন কেচ্ছাকাহিনি ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়।

সুলতান তৃতীয় মুরাদ

সুলতান দ্বিতীয় সেলিমের মৃত্যুর পর ১৫৪৬ সালে উসমানি সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসেন সুলতান তৃতীয় মুরাদ। পিতার মতো তিনিও দুর্বলচিত্তের অধিকারী ছিলেন। সামান্য বিষয়ে তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়তেন। তাঁর দাদা সুলতান সুলায়মানের আমল থেকে ছদরে আজম হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী মুহাম্মদ পাশা পাশে থাকায় প্রথম কিছুদিন নির্বিঘ্নে কেটে যায় তাঁর।

ছদরে আজমের মৃত্যুর পরপরই বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হয়। অন্তঃপুর থেকে সুলতানের মা নুরবানু সাম্রাজ্য পরিচালনায় হস্তক্ষেপ শুরু করেন। শুরু হয় দরবারের চারপাশে স্বার্থ ও সুবিধাবাদী লোকদের আনাগোনা। সাম্রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে অস্থিরতা এবং প্রশাসনিক স্থবিরতা।

সাম্রাজ্য পরিচালনায় সুলতান তৃতীয় মুরাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা না থাকলেও তাঁর শাসনামলে ১৫৭৬ সালে উত্তর আফ্রিকার মরক্কো উসমানি সাম্রাজ্যের মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়। একই সময়ে ১৫৭৫ সালে পোল্যান্ড জয় করে উসমানি সেনাবাহিনী।

দরবারের ব্যস্ততা এবং মানুষের সঙ্গ থেকে দূরে থাকতে ভালোবাসতেন ২৮ বছর বয়সী তরুণ সুলতান তৃতীয় মুরাদ। দীর্ঘ ২১ বছর ধরে তিনি

Scanned with CamScanner

রাজপ্রাসাদের এক কামরায় অলস জীবনযাপন করেছেন। এমনকি জুমার নামাজও তিনি প্রাসাদের বাইরে গিয়ে আদায় করতেন না। সাম্রাজ্য পরিচালনায় অনীহা থাকলেও ঘনিষ্ঠ লোকদের প্ররোচনায় নিজের পাঁচ ভাইকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেন সুলতান মুরাদ।

নারীদের নিয়ে দিন ও রাতের বেশির ভাগ সময় কেটে যেত সুলতান তৃতীয় মুরাদের। চার স্ত্রীসহ ৪০ জন নারীর সঙ্গে তিনি নিশিযাপন করতেন। উসমানি সুলতানদের মধ্যে নারীলোভী সুলতান হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। এমনকি অতিরিক্ত নারীসঙ্গের কারণে শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ায় তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে সুলতান তৃতীয় মুরাদ ১৯ জন পুত্র এবং ৩০ জন কন্যা রেখে যান।

সুলতান তৃতীয় মুরাদের শাসনামলে তাঁর মা ও স্ত্রী তো বটেই, অন্তঃপুরের দাসীরাও সাম্রাজ্য পরিচালনায় প্রশাসনের নানা বিষয়ে হস্তক্ষেপ শুরু করে। জানফেদা নামের এক দাসী সুলতানের মা নুরবানু এবং সুলতানের স্ত্রী সাফিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিবাদ ছড়িয়ে দেয়। এই দাসীর প্ররোচনায় সুলতান তৃতীয় মুরাদ তাঁর অযোগ্য ভাই ইবরাহিমকে একটি প্রদেশের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেন।

ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, সুলতান তৃতীয় মুরাদের স্বভাব ও চরিত্র তাঁর বাবার মতো অযোগ্যতা এবং বিলাসিতায় ভরা ছিল। তবে পিতা ও পুত্রের মধ্যে দুটি বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য ছিল।

সুলতান তৃতীয় মুরাদের বাবা সুলতান দ্বিতীয় সেলিম জনসঙ্গ থেকে দূরে থাকলেও সাম্রাজ্য পরিচালনার ভার যোগ্য লোকদের হাতে ন্যস্ত ছিল। কিন্তু সুলতান তৃতীয় মুরাদের বেলায় তাঁর ঢিলেঢালা স্বভাবের সুযোগে অযোগ্য লোক ও নারীদের হাতে উসমানি সাম্রাজ্যের ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়ে পড়ে।

সুলতান তৃতীয় মুরাদের চেয়ে তাঁর বাবা সুলতান দ্বিতীয় সেলিম যৌবনের ভোগ ও বিলাসিতায় বেশ কিছু বিষয়ে সীমা লঙ্ঘন করেছেন। কিন্তু পিতার চেয়ে সুলতান তৃতীয় মুরাদের চরিত্র ছিল কিছুটা ভিন্ন। তিনি আরবি ও ফারসি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন এবং কবিতা লিখতেন। তবে পিতার মতো নারীভোগে তাঁরও আসক্তি ছিল প্রবল। এক শর বেশি সন্তান জন্মদান এবং ৪০ জনের বেশি নারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক তাঁর এ আসক্তির প্রমাণ বহন করে।

Scanned with CamScanner

সুলতান তৃতীয় মুহাম্মদ

সুলতান তৃতীয় মুরাদের মৃত্যুর পর ১৫৯৫ সালে উসমানি সাম্রাজ্যের নতুন অধিপতি হন সুলতান তৃতীয় মুহাম্মদ। দাদা ও পিতার মতো তিনিও ছিলেন দুর্বল মানসিকতার সুলতান। বিনা দোষে তিনি পরিবারের ভাই ও পুত্রকে হত্যা করেন অন্যায়ভাবে। অতিরিক্ত সন্দেহপ্রবণতা ও অস্থিরতার ফলে বেশ কিছু বিষয়ে তাঁর বাড়াবাড়ি উসমানি সাম্রাজ্যের ইতিহাসে কালো অধ্যায় হয়ে আছে।

সুলতান তৃতীয় মুহাম্মদের শাসনামলে একের পর এক যুদ্ধে উসমানি বাহিনীর পরাজয়ের সংবাদে সাম্রাজ্যের চারপাশ সংকীর্ণ হয়ে আসে। প্রশাসনে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ে। অযোগ্য লোকদের প্রভাব বেড়ে যায় বিভিন্ন অঙ্গনে।

তিনি কবিতা লিখতে ভালোবাসতেন। কেউ কেউ তাঁকে সাধক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু নির্দোষ ১৯ ভাই এবং এক পুত্রকে যে সুলতান বিনা দ্বিধায় হত্যা করেন, ধর্মীয় সাধনার সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র কীভাবে, তা বোধগম্য নয়।

Scanned with CamScanner

নবিপ্রেমিক সুলতান প্রথম আহমদ

১৪ বছর বয়সে উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতান হিসেবে সিংহাসনে সমাসীন হন সুলতান প্রথম আহমদ। ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি প্রথা ভেঙে তাঁর ভাই মুস্ত ফাকে হত্যার আদেশ করেননি। বরং প্রাসাদের বন্দিশালায় তাকে সমর্পণ করেছিলেন সুন্দরী দাসীদের সান্নিধ্যে। নারীভোগে মত্ত থেকে ক্ষমতার চিন্তা যেন তার মাথায় না আসে, সে জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নতুন এই সুলতান।

তরুণ সুলতান প্রথম আহমদ যখন ক্ষমতা গ্রহণ করেন, তখন উসমানি সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। বিভিন্ন রাজ্যে বিদ্রোহ ও অস্থিরতায় মুষড়ে পড়েন সুলতান আহমদ। একদিকে ইরানের শাহ আব্বাসের অব্যাহত ষড়যন্ত্র, অন্যদিকে ইউরোপে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে লেগে থাকা যুদ্ধে উসমানি সাম্রাজ্য তখন গভীর সংকটকাল অতিক্রম করছিল।

ভেতর ও বাইরের শত্রুদের বহুমুখী চক্রান্তে বিপর্যস্ত অবস্থায়ও পুরোপুরি মনোবল না হারিয়ে অটল থাকতে প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন তিনি। এ ছাড়া অন্তঃপুরের নারীদের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে যোগ্য লোকদের হাতে সাম্রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন সুলতান।

চারদিকে চরম অস্থিরতার দুঃসময়ে গভীর রাতে সুলতানি প্রাসাদ তোপকাপির সবাই যখন ঘুমে, তখন সুলতান নীরবে উঠে হাজির হতেন প্রাসাদের আমানতখানায়। সেখানকার একটি বিশেষ কক্ষে সুরক্ষিত ছিল নবিজির জুতা মোবারকসহ বেশ কিছু ব্যবহৃত সামগ্রী।

তরুণ সুলতান আহমদ গভীর রাতে আমানতখানায় যেতেন। তারপর সেখানে রাখা নবিজির জুতাজোড়া পরম শ্রদ্ধায় চোখেমুখে লাগাতেন তিনি। নবিজির ভালোবাসায় বিগলিত হয়ে এই জুতাজোড়া বুকে জড়িয়ে কিছুক্ষণ নীরব থাকতেন। তারপর অশ্রুসজল কণ্ঠে ফরিয়াদ করতেন, 'দয়ার সাগর প্রিয় নবি, আপনার এই পবিত্র জুতা যদি আমার মাথার মুকুট হয়ে থাকত, আপনার

Scanned with CamScanner

এই পদস্মৃতি যদি আমি সব সময় এই চেহারায় স্পর্শ করার সুযোগ পেতাম, আমার হৃদয় শান্তিময় হয়ে থাকত।'

গভীর রাতে একাকী প্রহরে সুলতান আহমদ অনুভব করতেন, এক অপার্থিব আবেশে প্রশান্ত হচ্ছে তাঁর অস্থির মন। ভোরের আলো ফোটার আগে তিনি নিজের কামরায় ফিরে আসতেন। প্রায় প্রতি রাতে সুলতান আহমদ এভাবে নিজের মানসিক শক্তি ও শান্তির সন্ধানে হাজির হতেন ওই আমানতখানায়।

নবিজির ভালোবাসায় সুলতানের লেখা বেশ কিছু কবিতা তুর্কি সাহিত্যে আজও স্মরণীয় হয়ে আছে।

হঠাৎ করেই জটিল জ্বরে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন তরুণ সুলতান আহমদ। মৃত্যুর আগে তিনি তার ভাই মুস্তফাকে পরবর্তী সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন।

১৬১৭ সালের ২২ নভেম্বর ২৮ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন সুলতান প্রথম আহমদ। তাঁর শাসনামল ছিল মাত্র ১৪ বছর।

Scanned with CamScanner

প্রতিবন্ধী সুলতান মুস্তফা

১৬১৭ সালের ২২ নভেম্বর। উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতান প্রথম আহমদ মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে সাম্রাজ্যজুড়ে শোকের আবহ। কিন্তু এরই মধ্যে সুলতানের প্রাসাদে চলছে অন্য ষড়যন্ত্র। এর সব কলকাঠি নাড়ছেন সদ্যপ্রয়াত সুলতানের স্ত্রী কোসম সুলতান।

সুলতান আহমদের মৃত্যুর পর কে হবেন সিংহাসনের নতুন উত্তরাধিকারী, এ নিয়ে চারপাশে চলছে জল্পনা-কল্পনা। কোসম সুলতানের ইচ্ছা, উসমানি সাম্রাজ্যের নতুন সুলতান হবেন মরহুম সুলতানের ভাই মুস্তফা। দরবারের আমির ও উজিররা তাঁর এমন সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট নন, কিন্তু মুখ খুলে কেউ প্রতিবাদের সাহস করছেন না।

মুস্তফার স্বভাব-চরিত্রের বিষয়ে সবার ভেতর উদ্বেগ আছে। ২৬ বছর বয়সী তরুণ মুস্তফার আচার-আচরণ শিশুসুলভ। কখনো কখনো তা কেবল হাস্যকর নয়, বরং বিরক্তিকরও। মুস্তফার জীবন কেটেছে রাজপ্রাসাদের কঠিন পাহারায়। মুস্তফা নিজেও সিংহাসনের ব্যাপারে আগ্রহী নন। এমন অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষমতার সিংহাসনে বসিয়ে কোসম সুলতান চাচ্ছেন, তাঁর সতিনের ছেলে দ্বিতীয় উসমানকে ক্ষমতার বৃত্ত থেকে দূরে রাখতে।

কোসম সুলতানের বুদ্ধি ও তৎপরতায় মুস্তফাকে বসিয়ে দেওয়া হয় উসমানি সাম্রাজ্যের সিংহাসনে। ১৫তম সুলতান হিসেবে তাঁর হাতে ন্যস্ত হলো উসমানি সাম্রাজ্য পরিচালনার ভার। অনিচ্ছাসত্ত্বেও নতুন সুলতানকে মেনে নিলেন দরবারের সভাসদেরা। পর্দার আড়াল থেকে কোসম সুলতানের প্রভাব বিস্তারের শুরু এখান থেকেই।

মাত্র তিন মাস ক্ষমতার আসনে টিকে থাকার ভাগ্য জোটে সুলতান মুস্ত ফার। তাঁর পাগলামি ও অপরিপক্ব আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে শায়খুল ইসলাম আসাদ আফেন্দি এবং দরবারের উজিররা তাঁকে পদচ্যুত করেন।

Scanned with CamScanner

উসমানি সাম্রাজ্যের ভেতর ও বাইরে তখন বিপদঘেরা দুঃসময়। সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসার মতো যোগ্য কেউ নেই উসমানি রাজপ্রাসাদে। বড় অস্থির সময়ে নতুন সুলতান হিসেবে মনোনীত করা হয় ১৩ বছর বয়সী শিশু দ্বিতীয় উসমানকে।

চলমান সংকটকালে উসমানি সেনাবাহিনীর সবচেয়ে প্রভাবশালী দল ইঙ্কেশারির সদস্যদের বিশৃঙ্খলা চারপাশে আরও বেশি অস্থিরতা ছড়িয়ে দেয়। চার বছর ধরে উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতান ছিলেন দ্বিতীয় উসমান। দরবারের আশপাশে এ সময় চক্রান্তকারীদের পাল্লা ভারী হতে থাকে। অন্তঃপুরের কেউ কেউ এসব ষড়যন্ত্রের আগুনে ঘি ঢালেন ভেতর থেকে। একপর্যায়ে সামান্য অজুহাতে একদল ক্ষমতালোভী ও উচ্ছৃঙ্খল সেনাসদস্যের হাতে নৃশংসভাবে প্রাণ হারান নতুন সুলতান দ্বিতীয় ওসমান।

উসমানি সাম্রাজ্যের হাল ধরার মতো আর কেউ নেই। ফলে ১৬২২ সালের মে মাসে দ্বিতীয়বারের মতো আবারও ক্ষমতার সিংহাসনে বসানো হয় সুলতান মুস্তফাকে। স্বভাবে আগের মতোই উন্মাদনা, অস্থিরতা এবং অস্বাভাবিক আচরণ তাঁর। ইঙ্কেশারি সেনাবাহিনীর কুচক্রী কর্তারা মুস্তফাকে ক্ষমতায় রেখে তাঁর দুর্বলতার সুযোগ নিতে আগ্রহী। সুলতানের অগোচরে নিজেদের সুযোগ-সুবিধা ভোগে কেউ তাদের বাধা দেওয়ার নেই। এ ছাড়া যতবার সুলতান বদল, ততই সেনাবাহিনীর লাভ। কারণ, প্রত্যেক নতুন সুলতান সিংহাসনে বসেই সেনাবাহিনীর সদস্যদের জন্য বিশেষ বকশিশ ঘোষণা করেন।

এবার প্রায় এক বছর চার মাস সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকেন সুলতান মুস্ত ফা। তত দিনে তাঁকে নিয়ে সবার বিরক্তি চরমে পৌঁছায়। বরং তাঁর দুর্বলতার সুযোগে অন্তঃপুরের নারীদের প্রভাব অনেক বেড়ে যায়। পুরো সাম্রাজ্য তখন পরিচালিত হতো পর্দার অন্তরাল থেকে।

কোসম সুলতান সিদ্ধান্ত নিলেন, তাঁর পুত্র চতুর্থ মুরাদকে সিংহাসনে বসানোর সময় এসেছে। সুলতান মুস্তফাকে আবারও সরিয়ে দেওয়া হলো ক্ষমতার মসনদ থেকে। পদচ্যুতকালে তাঁর আরজি ছিল, সুলতান দ্বিতীয় উসমানের মতো তাঁকে যেন সৈন্যরা মেরে না ফেলে।

সুলতান মুস্তফাকে পদচ্যুত করে তাঁর জন্য একটি বিশেষ প্রাসাদ বরাদ্দ দেওয়া হয়। ১৬৩৯ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সেখানেই বন্দিজীবন কাটান।

Scanned with CamScanner

দু-দুবার সিংহাসনে বসার সৌভাগ্য হয়েছিল সুলতান মুস্তফার। কিন্তু ভাগ্য তাঁকে সাফল্য দেয়নি। মানসিকভাবে অপরিপক্ব ও কিছুটা উন্মাদ এই তরুণ উসমানি সুলতান কারও কাছেই মর্যাদা পাননি। বরং তাঁকে ব্যবহার করে নিজেদের আখের গোছায় ষড়যন্ত্রকারী ও অন্তঃপুরের নারীরা।

Scanned with CamScanner

কীর্তিমান সুলতান চতুর্থ মুরাদ

ভ্রাতৃঘাতক সুলতান

সুলতান মুস্তফাকে সরিয়ে দেওয়ার পর কোসম সুলতান ও দরবারের উজিরদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিংহাসনে বসানো হয় ১৪ বছর বয়সী চতুর্থ মুরাদকে। উসমানি সাম্রাজ্যের ১৭তম সুলতান হিসেবে দায়িত্ব নেন এই শিশু।

ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থেকে ছড়ি ঘোরানোর সুযোগ খুলে যায় কোসম সুলতানের কপালে। নিজের শিশুপুত্রকে সুলতান উপাধি দিয়ে তিনি ধারণ করেন সুলতানজননী উপাধি। সুলতানের পর তাঁরই তখন সবচেয়ে বেশি প্রভাব ও প্রতিপত্তি।

১৬০৯ সালের ২৯ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন সুলতান মুরাদ। জন্মের কিছুদিন পরই তাঁর পিতা সুলতান আহমদ মারা যান। মা এবং অন্য ওস্তাদদের কাছে তাঁর শৈশব কাটে শিক্ষাদীক্ষায়। ছোটবেলা থেকে উসমানি সাম্রাজ্যের দুঃসময় এবং তাঁর মা ও পরিবারের অন্য সদস্যদের লোভ ও হিংসা দেখে দেখে বড় হন তিনি।

শিশু সুলতান মুরাদকে সিংহাসনে বসানোর পর নিজের ইচ্ছেমতো সাম্রাজ্য শাসন পরিচালনা করেন সুলতানজননী কোসম সুলতান। ক্ষমতার সবকিছু চলে তাঁর কথামতো। যেকোনো বিষয়ে তাঁর আদেশ-নিষেধই চূড়ান্ত।

এভাবে পেরিয়ে যায় আট বছর। শিশু থেকে বড় হয়ে ওঠেন সুলতান মুরাদ। ধীরে ধীরে মায়ের সঙ্গে দ্বন্দ্ব শুরু হয় তাঁর। বিবাদে জড়িয়ে পড়েন সুলতানজননী এবং তরুণ সুলতান।

একপর্যায়ে মায়ের বলয় থেকে মুক্তি চান সুলতান চতুর্থ মুরাদ। সুকৌশলে সুলতানজননী কোসম সুলতানকে সরিয়ে দিতে তৎপর হয়ে ওঠেন সুলতান এবং তাঁর ঘনিষ্ঠরা। সুলতান ঘোষণা করেন, সাম্রাজ্য পরিচালনায় কারও কথা শুনবেন না তিনি। মাকে সাফ জানিয়ে দেন, 'আপনি রাজনীতির

Scanned with CamScanner

কলকাঠি নাড়ানো ছেড়ে দিন। নইলে পুত্র হয়েও আপনাকে দূরে নির্বাসনে পাঠাব আমি। অনেক হয়েছে, আর নয়।'

সাম্রাজ্যজুড়ে সংস্কার অভিযান শুরু করেন সুলতান মুরাদ। বিদ্রোহী ও ষড়যন্ত্রকারীদের একে একে হত্যা করেন। অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান করে তিনি মনোযোগ দেন বাইরের শত্রুদের ওপর। আবারও ফিরে আসতে থাকে উসমানিদের গৌরবময় অধ্যায়। বাগদাদ দখলসহ বেশ কয়েকটি দুর্গ ও অঞ্চল বিজিত হয় সুলতান মুরাদের শাসনামলে।

কবিতা ও সংগীতপ্রেমী এই সুলতান উসমানি সাম্রাজ্যের প্রবল শক্তিধর শাসকদের একজন হিসেবে ইতিহাসে আলোচিত হয়ে আছেন। মা কোসম সুলতানকে সরিয়ে সাম্রাজ্যের ভেতর ইঙ্কেশারি বাহিনীর সদস্যদের দমনে তাঁর সাহসী ভূমিকা সেকালে সবার কাছে প্রশংসিত হয়। সাম্রাজ্যজুড়ে মদ ও তামাক নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন তিনি। রাতে ছদ্মবেশে কখনো কখনো ইস্তাম্বুল নগরীর অলিগলিতে ঘুরে বেড়াতেন এই সাহসী তরুণ সুলতান।

ঐতিহাসিকেরা দাবি করেন, সাম্রাজ্যের ভেতর বিশৃঙ্খলা দমন ও বাইরের শত্রুদের পরাজিত করে উসমানি সাম্রাজ্য বিস্তারে অবিস্মরণীয় ভূমিকা ছিল সুলতান মুরাদের। অন্তঃপুরের নারীদের প্রভাব থেকে মুক্ত করেন দরবার ও সিংহাসন। এমনকি নিজের মাকেও সাম্রাজ্য পরিচালনায় কোনো বুদ্ধি দিতে নিষেধ করে দেন।

উসমানি সাম্রাজ্যের ভেতর বা বাইরে কোথাও বিদ্রোহের আশঙ্কা থাকলেই সন্দেহভাজনদের হত্যার আদেশ দিতেন সুলতান মুরাদ। এমনকি নিজের পরিবারেও কাউকে ছাড় দেননি তিনি। তাঁকে সরিয়ে যেকোনো সময় সিংহাসন দখল করতে পারেন তাঁর ভাইয়েরা, এই আশঙ্কায় নিজের ভাই এবং সাম্রাজ্যের পরবর্তী উত্তরাধিকার হিসেবে যাঁকে ভাবা হতো, সেই বায়েজিদকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেন তিনি। বায়েজিদের বয়স তখন ২৩। এরপর হত্যা করেন আরেক নিরপরাধ ভাই সুলায়মানকে। নির্দোষ তৃতীয় ভাই কাসেমও রেহাই পাননি তাঁর হিংসাত্মক ভ্রাতৃহত্যা থেকে। মা কোসম সুলতানের আকুতি-মিনতিতে প্রাণে রক্ষা পেয়ে যান আরেক ভাই ইবরাহিম। ইবরাহিমকে তিনি রাজপ্রাসাদের এক বন্দিশালায় আমৃত্যু আটক রাখার আদেশ দেন।

এমন ভ্রাতৃহত্যার পরিণতি ভালো হয়নি সুলতান 'মুরাদের। পরবর্তী সময়ে তাঁর নিজের কোনো পুত্রসন্তানই বেঁচে থাকেনি। বরং জন্মের কিছুদিন

Scanned with CamScanner

পরই রহস্যজনকভাবে মারা যেত তাঁর ঔরসজাত প্রত্যেক শিশুপুত্র। মৃত্যুকালে তাঁর এমন কোনো পুত্রসন্তান ছিল না, যাকে তিনি উসমানি সাম্রাজ্যের পরবর্তী উত্তরাধিকার হিসেবে ঘোষণা দেবেন।

১০৩৯ হিজরিতে প্রবল বৃষ্টি ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় পবিত্র মক্কা নগরীর মসজিদুল হারাম। সে সময় তিনি পুরো মসজিদের সংস্কার ও পুনর্নির্মাণের আদেশ দেন। মিসরের গভর্নরকে লিখে পাঠান, মক্কা ও মদিনার অধিবাসীদের অভাব ও সমস্যা পূরণে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা যেন গ্রহণ করা হয়।

সুলতানের বয়স যখন ২৭ অথবা ৩০, তখন গেঁটে বাত রোগ বাসা বাঁধে তাঁর শরীরে। ১৬৪০ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়। মোট ১৬ বছর ১১ মাস তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তবে শেষের আট বছর তিনি নিজের সিদ্ধান্তে সাম্রাজ্য শাসন করেন। উসমানি সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা হিসেবেও তাঁকে উল্লেখ করেছেন কেউ কেউ। শারীরিক শক্তির পাশাপাশি তাঁর বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণতা ছিল প্রচণ্ড।

সুলতানের কৌশল

১৬১২ থেকে ১৬৪০ সাল পর্যন্ত উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতান ছিলেন মুরাদ। ইতিহাসের পাতায় তিনি সুলতান চতুর্থ মুরাদ হিসেবে পরিচিত। তাঁকে নিয়ে এই গল্প।

সুলতান মুরাদের কাছে অভিযোগ এল, ইস্তাম্বুল পৌরসভার প্রধান মেয়র জনসাধারণের কাছ থেকে ঘুষ নেন। অভিযোগ তদন্তের জন্য সুলতান তাঁর দরবারের একজন কর্মকর্তাকে ডেকে বললেন, 'আজ থেকে এক মাস তুমি ইস্তাম্বুলের মেয়রের কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করবে। মাস শেষে তার বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে জানাবে।'

এক মাস পেরিয়ে গেল। সুলতানের নিযুক্ত করা কর্মকর্তা এসে জানাল, 'তার ভেতর আমি সন্দেহজনক কিছু দেখিনি। মনে হচ্ছে, অভিযোগ মিথ্যা ও সন্দেহপ্রসূত।'

সুলতান এমন উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। মনে মনে তিনি ভাবলেন, ধোঁয়া যেহেতু উঠেছে, কাজেই সামান্য হলেও আগুন রয়েছে। কর্মকর্তাকে বললেন, 'তুমি যাও। আমি দেখছি।'

কিছুদিন পর স্বয়ং সুলতান ওই মেয়রকে ডেকে পাঠালেন। সুলতানের আদেশে উপস্থিত হলো ওই কর্মকর্তা। সুলতান তাকে মুদ্রাভর্তি একটি ছোট

Scanned with CamScanner

থলে দিয়ে বললেন, 'আমি তোমাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে পাঠাচ্ছি। আমি শুনেছি, আয়া সুফিয়া মসজিদে একজন অসহায় মানুষ প্রতিদিন ফজরের নামাজের পর মসজিদের কোনায় একটি খুঁটির আড়ালে বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকেন। তুমি তাঁর কাছে যাবে এবং তাঁকে এই থলে পৌঁছে দেবে।'

সুলতানের আদেশে সবিনয় সম্মতি দিয়ে কর্মকর্তা বলল, 'আপনার হুকুম শিরোধার্য। আমি কালই যাব।'

পরদিনই ওই কর্মকর্তা আয়া সুফিয়া মসজিদে গিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করল। তারপর যথাস্থানে একটি খুঁটির আড়ালে একজন অসহায়কে দেখতে পেল সে। তার কাছে গিয়ে সে বলল, 'এই থলেটি রাখো। সুলতান তোমার কাছে এই অর্থ পাঠিয়েছেন।'

উৎফুল্ল চেহারায় অসহায় লোকটি সুলতানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলল, 'মহান করুণাময় সুলতানের জীবন সুদীর্ঘ করুন।'

এর পরদিন সুলতান ওই কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করার আদেশ জারি করলেন। তাকে জেলখানায় বন্দী করে রাখার হুকুম দিলেন তিনি।

ইস্তাম্বুল শহরে এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে স্বস্তি ও খুশি ফিরে এল। কারণ, ঘুষখোর এক কর্মকর্তার হাত থেকে তাদের নগরজীবন মুক্তি পেয়েছে।

কিন্তু সুলতানের মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের মধ্যে বিস্ময় দেখা দিল। উপদেষ্টারাও ভাবছেন, সুলতান কীভাবে একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে হঠাৎ করে এমন পদচ্যুতি ও আটক করার ঘোষণা দিলেন! তিনি তো নিশ্চিত না হয়ে কোনো পদক্ষেপ নেন না। তবে তিনি নিশ্চিত হলেন কীভাবে!

স্বয়ং সুলতান তাঁর সভাসদদের এমন কৌতূহল দেখে নিজেই এর ব্যাখ্যা দিলেন। বললেন, 'আমি সেদিন ভোরে তাকে আয়া সুফিয়া মসজিদে পাঠিয়েছিলাম এক অসহায় ব্যক্তিকে আমার দান পৌঁছে দেওয়ার জন্য, সেই অসহায় লোকটি ছিল আমারই এক গোয়েন্দা। ছদ্মবেশে সে সেদিন ফজরের নামাজ শেষে আমার বলে দেওয়া জায়গায় বসে ছিল। আমি ইস্তাম্বুল পৌরসভার এই কর্মকর্তাকে ৫০ স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলাম তাকে দেওয়ার জন্য। কিন্তু সে তাকে যে থলি দিয়েছিল, তাতে মাত্র পাঁচ স্বর্ণমুদ্রা ছিল। আমি তখনই নিশ্চিত হয়েছি, এই লোক সত্যিই দুর্নীতিবাজ এবং অসৎ প্রকৃতির। কাজেই তাকে শাস্তির সিদ্ধান্ত নিতে আমার আর দেরি হয়নি।'

সুলতানের এমন বিচক্ষণ বুদ্ধিতে অবাক হলো তাঁর উজির এবং অন্যরা।

Scanned with CamScanner

মদ্যপ এবং লম্পট

দিনভর দরবারের নানা ব্যস্ততা শেষে সন্ধ্যার পর ছদ্মবেশে বের হয়েছেন সুলতান চতুর্থ মুরাদ। চারপাশে নীরব ইস্তাম্বুল নগরীর পথঘাট। আজ সুলতানের সঙ্গে বের হয়েছেন তাঁর ব্যক্তিগত প্রহরীদের প্রধান রক্ষী।

এক গলি পার হয়ে অন্য গলিতে তাঁরা হেঁটে বেড়াচ্ছেন দুজন। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন সুলতান। রাস্তার পাশে পড়ে আছে মৃতপ্রায় একটি দেহ। লোকটি জীবিত না মৃত, বোঝা যাচ্ছে না।

সুলতান কাছে এগিয়ে গেলেন। লোকটিকে ধরে তিনি বুঝতে চাইছেন, সে বেঁচে আছে কি না। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে কয়েকজন পথচারী, কারও ভ্রুক্ষেপ নেই এদিকে। ছদ্মবেশধারী সুলতান কয়েকজন পথচারীকে ডাকলেন, 'এই যে শুনুন আপনারা, এদিকে একটু আসুন।'

অপরিচিত আগন্তুকের ডাকে এগিয়ে এল কয়েকজন পথচারী। তাদের নির্বিকার কণ্ঠ, বলুন, কী চান আপনি?

'এই লোকটি এখানে মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। আপনারা হেঁটে যাচ্ছেন পাশ দিয়ে কিন্তু কেউ খেয়ালও করছেন না? তাকে কি আপনারা চেনেন না?' ছদ্মবেশধারী সুলতানের জিজ্ঞাসা।

–এই ব্যাটা মদ্যপ ও লম্পট। মদের পানশালা আর বেশ্যাদের কাছে যাওয়া-আসাই ছিল তার কাজ। সে এখানে মরে পড়ে থাকলে আমাদের কী করার আছে!

–যা-ই হোক, লোকটি তো নবিজির একজন উম্মত। দয়া করে চলুন আমরা তাকে উঠিয়ে নিয়ে যাই। তার ঘরটি দেখিয়ে দিন আমাদের।

অচেনা লোকটির এমন কথায় মন গলল লোকগুলোর। তারা কয়েকজন লাশটি কাঁধে তুলে ছদ্মবেশধারী সুলতানকে নিয়ে রওনা হলো। কিছুদূর যেতেই একটি জীর্ণ ঘরের সামনে লাশ রেখে তারা বিদায় নিল। যাওয়ার সময় বলে গেল, এটাই এই নষ্ট লোকটির ঘর। আপনি খুঁজে নিন তার পরিবারকে, আমরা চললাম।

ঘরের দরজায় কড়া নাড়লেন সুলতান মুরাদ। বেরিয়ে এলেন একজন নারী। লাশ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি। সুলতান বুঝতে পারলেন, এই নারী মৃত লোকটির স্ত্রী।

লাশের পাশে বসে বিলাপ করছেন অসহায় নারীটি। মৃত স্বামীকে উদ্দেশ করে তিনি বলছিলেন, 'তুমি সত্যিই আল্লাহর ওলি। তোমার কথাই সত্যি। হায়, আজ আমাকে একা রেখে তুমি চলে গেলে!

Scanned with CamScanner

স্বামীহারা স্ত্রীর এমন কথায় সুলতান এবং তাঁর সঙ্গী অবাক হলেন। সুলতান জানতে চাইলেন, 'আপনি কী বলছেন এসব, এই লোক আল্লাহর ওলি হয় কীভাবে! লোকে বলল, সে মদপান করত, পতিতাদের ভোগ করত। তাকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেও কেউ এগিয়ে এল না। আর আপনি বলছেন সে আল্লাহর ওলি, এর রহস্য কী!'

স্বামীর লাশ সাদা কাপড়ে ঢেকে স্ত্রী সুলতানের সামনে এসে দাঁড়ালেন। চোখ মুছে বললেন, 'আমি জানতাম, এই মহল্লার কোনো পথেঘাটে ওর মৃত্যু হলে এমন অবস্থাই হবে। আমার স্বামী প্রতি সন্ধ্যায় মদের দোকানে যেত। বেশ কয়েক বোতল মদ কিনে সে ঘরে ফিরত। তারপর মদের সব পানীয় সে হাম্মামখানায় ঢেলে দিত। সে তখন বলত, "আজ অন্তত কয়েকজন মুসলমান মদ কম পাবে। আজকের রাতে এ শহরে কিছুটা হলেও কম মদপান হবে।" শুধু তা-ই নয়, প্রায় রাতে সে পতিতাদের বাড়িতে যেত। তাদের হাতে কিছু অর্থ দিয়ে বলত, আজ এই রাতে অন্যদের কাছে নিজের দেহ বিক্রি করে তোমরা যা পেতে, আমি তা দিয়ে দিলাম। এখন তুমি দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকবে। এরপর ঘরে ফিরে সে বলত, "কিছু বেশ্যা অন্তত আজ রাতে ব্যভিচার থেকে দূরে থাকবে। এর ফলে কিছু যুবকের পাপাচার আজ বন্ধ থাকবে।"'

সুলতান ও তাঁর সঙ্গী তন্ময় হয়ে শুনছেন এমন আশ্চর্যজনক গল্প। ওই নারী তখনো বলে চলেছেন, 'একদিন আমি তাকে বলেছিলাম, মহল্লাবাসী তোমাকে প্রতি সন্ধ্যায় মদের দোকানে দেখে, রাতে পতিতাদের ঘরে যেতে দেখে, তোমার মৃত্যুর পর এরা কেউ তোমার জানাজায়ও আসবে না। সে আমাকে বলেছিল, "এ নিয়ে তুমি ভাববে না। বরং শুনে রাখো, এই মুসলিম সাম্রাজ্যের মহামান্য সুলতান আমার জানাজায় উপস্থিত হবেন, এই শহরের আলেম ও দরবেশরা আমার জানাজায় অংশ নেবেন।"'

ছদ্মবেশী সুলতান মুরাদের চোখে অশ্রু। তিনি বিগলিত হলেন লোকটির কাণ্ড শুনে। তারপর বললেন, 'আপনার স্বামী সত্য বলেছিলেন। আমি সুলতান মুরাদ আজ এখানে উপস্থিত। কাল তাঁর লাশ গোসল করানো হবে, আমরা সবাই মিলে যথাযোগ্য মর্যাদায় তাঁর দাফন-কাফনে অংশ নেব।'

পরদিন মহাসমারোহে এক অচেনা লোকের জানাজা অনুষ্ঠিত হলো ইস্তাম্বুল শহরে। সুলতান এবং দরবারের সভাসদসহ শায়খুল ইসলাম এবং অন্য বিশিষ্ট লোকেরা অংশ নিলেন জানাজার নামাজে। সুলতান বিশেষ মর্যাদায় তাঁকে দাফনের ব্যবস্থা করেন।

Scanned with CamScanner

ঘোড়াপ্রেমিক সুলতান

ঘোড়ার প্রতি সুলতান চতুর্থ মুরাদের আকর্ষণ ছিল। উন্নতজাতের ঘোড়া কেনা এবং প্রতিপালনে তিনি শৌখিন ছিলেন। তাঁর ঘোড়ার জিন ও লাগাম তৈরি করা হতো খাঁটি রুপা দিয়ে। কোথাও যাওয়ার বেলায় তাঁর সঙ্গে থাকত অনেকগুলো ঘোড়ার সুসজ্জিত বহর।

সুলতানি আস্তাবলে এই সুলতানের ঘোড়ার সংখ্যা জানলে অবাক হতে হয়। সুলতানের পছন্দে বিশেষ জাতের বাছাই করা উন্নত ঘোড়ার সংখ্যা ছিল ৮০০। এগুলো ছিল কেবল তাঁর আরোহণের জন্য।

এ ছাড়া কোথাও যাত্রাকালে সুলতানের মালামাল বহন করার জন্য ছিল আরও ৮০০ তেজি ঘোড়া। সুলতানের পরিবারের মালপত্র বহনের জন্য বরাদ্দ ছিল আলাদা ৫০০ ঘোড়া। সুলতানের কোষাগার বহন করার জন্য ব্যবহৃত হতো ৬০০ শক্তিশালী ঘোড়া। আর রাতযাপন বা বিশ্রামের জন্য তাঁবু খাটাতে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম বহনের জন্য নির্ধারিত ঘোড়ার সংখ্যা ছিল ৮৮০। সুলতানের দাসদের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য ছিল ৩০টি করে ঘোড়া।

১৬৪০ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি মাত্র ২৯ বছর বয়সে মৃত্যু হয় তরুণ সুলতান চতুর্থ মুরাদের। উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতান হিসেবে তাঁর শাসনকাল ছিল ১৭ বছর।

Scanned with CamScanner

নারীলোভী সুলতান ইবরাহিম

২৫ বছরের টগবগে তরুণ ইবরাহিম। তাঁর দুই ভাই পর্যায়ক্রমে পুরো উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতান হিসেবে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁর কোনো অপরাধ ছিল না, অথচ দুই ভাইয়ের শাসনামলজুড়ে তাঁর দিন কেটেছে বিলাসবহুল রাজকীয় বন্দিশালায়, সশস্ত্র সৈন্যদের কঠিন পাহারায়।

ইবরাহিমের চোখের সামনে একে একে তাঁর চার ভাইকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। পরিবারে ক্ষমতার মোহ এবং ভাইদের প্রতি এমন নৃশংসতা ধীরে ধীরে তাঁকে মানসিকভাবে অসুস্থ করে তোলে। প্রতিনিয়ত ভয় ও আশঙ্কা তাঁকে অস্থির করে রাখত। চারপাশের মুক্ত জগৎসংসারের কোনো ভোগবিলাসে তিনি সুখ খুঁজে পেতেন না।

সশস্ত্র প্রহরীদের কঠিন পাহারায় কাটে ইবরাহিমের দিবস ও রজনী। এই বন্দিশালা থেকে আদৌ তাঁর মুক্তি মিলবে কি না, তিনি নিজেও এ নিয়ে ভাবেন না। চারপাশের ভয় ও উৎকণ্ঠা থেকে ইবরাহিমের স্বভাবে জন্ম নেয় অস্থিরতা ও উন্মাদনা, যা জীবনভর তাঁর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল।

উসমানি সাম্রাজ্যের তৎকালীন শাসক ও তাঁর ভাই সুলতান চতুর্থ মুরাদের মৃত্যুর পরপর দরবার থেকে কয়েকজন লোক আসে ইবরাহিমের বন্দিশালায়। তারা প্রচণ্ড শব্দে দরজায় কড়া নাড়তে থাকে। এতে কেঁপে ওঠেন ইবরাহিম। মৃত্যুর আশঙ্কায় দুই চোখ বন্ধ হয়ে আসে তাঁর।

দরজার ওপাশ থেকে আগন্তুকেরা তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে বলে, 'আপনার ভাই আর পৃথিবীতে বেঁচে নেই, আপনি এখন আমাদের সুলতান। বেরিয়ে আসুন জনাবে আলা, আপনার ভয় নেই।' চমকে ওঠেন ইবরাহিম। কিন্তু বিশ্বাস হয় না তাঁর। বরং আকস্মিক এমন সুসংবাদে সন্দেহ জাগে ইবরাহিমের মনে। তিনি ভাবেন, এটা হয়তো তাঁর ভাই সুলতান মুরাদের নতুন ষড়যন্ত্র। তিনি পরখ করতে চাইছেন, আমি ক্ষমতালোভী কি না।

Scanned with CamScanner

ইবরাহিম ভেতর থেকে জানিয়ে দেন, 'ক্ষমতার প্রতি আমার কোনো লোভ নেই, ওই সিংহাসন আমার দরকার নেই। আমি একা এখানে ভালো আছি।' কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে ইবরাহিম এক শ্বাসে কথাগুলো বলে ঢোক গেলেন।

ফিরে যায় আগন্তুকেরা। কিছুক্ষণ পর বন্দিশালার দরজায় আসেন ইবরাহিমের মা কোসম সুলতান। তিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন সুলতান মুরাদের লাশ। ইবরাহিমকে মমতার সুরে ডাকেন তাঁর মা। বের হয়ে আসেন ইবরাহিম। কোসম সুলতান তাঁকে সুলতান মুরাদের লাশ দেখালেন। ভাইয়ের লাশ সামনে দেখে মায়ের কথায় ইবরাহিম আশ্বস্ত হন, সুলতান মুরাদ এখন মৃত। উসমানি সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী এখন তিনি।

ইবরাহিম তৈরি হলেন। দরবারের লোকজন এসে সম্মান জানিয়ে ইবরাহিমকে নিয়ে বসালেন সিংহাসনে। সেদিনই শহরের জামে আবু আইয়ুব আনসারি মসজিদে শপথ অনুষ্ঠান হয়। দীর্ঘদিনের বন্দিজীবন শেষে তরুণ ইবরাহিম উসমানি সাম্রাজ্যের ১৮তম সুলতান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৪ বছর। দিনটি ছিল ১৬৪০ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি।

ভাইদের মধ্যে ক্ষমতার বিবাদ ও পারস্পরিক সন্দেহে শৈশব থেকে বন্দী ছিলেন ইবরাহিম। ফলে পড়ালেখা করার সুযোগ পাননি সুলতান ইবরাহিম। কোনো সামরিক যোগ্যতাও ছিল না তাঁর। কিন্তু সুলতান মুরাদের মৃত্যুর পর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হওয়ার মতো উসমানি পরিবারে ইবরাহিম ছাড়া কোনো পুরুষ তখন বেঁচে ছিল না। অগত্যা সুলতান ইবরাহিমই এখন পরিবার ও দরবারের একমাত্র মুকুট।

দীর্ঘদিন বন্দী জীবনযাপনে ইবরাহিমের ভেতর যে স্থায়ী মানসিক অস্থিরতা তৈরি হয়, সুলতান হওয়ার পরও তিনি তা ছেড়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে পারেননি। বরং তাঁর পাগলামো স্বভাব ধীরে ধীরে প্রভাব ফেলতে শুরু করে দরবারের দৈনন্দিন কাজেকর্মে। সুলতান ইবরাহিম প্রথম উসমানি সুলতান, কোনো জ্ঞান বা সামরিক যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণ ছাড়া যিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

এর পরও থেমে থাকেনি উসমানি সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড। খ্রিষ্টানদের সঙ্গে উসমানি সৈন্যদের যুদ্ধ চলছিল সেনাপ্রধান ও ছদরে আজমের নেতৃত্বে। সুলতান ইবরাহিমের শাসনামলে বন্দুকিয়াদের দখলে থাকা কিরিত দ্বীপটি উসমানি সাম্রাজ্যের দখলে আসে। এই বিজয়ের পর বন্দুকিয়ার খ্রিষ্টানরা গ্রিসে উসমানিদের বন্দরে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে

Scanned with CamScanner

প্রতিশোধ নিতে সুলতান ইবরাহিম ইস্তাম্বুলের সব খ্রিষ্টানকে হত্যার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তৎকালের শায়খুল ইসলাম সাইদ আফেন্দি তাঁকে কঠিনভাবে সতর্ক করেন।

সুলতান ইবরাহিমের অস্থিরতা ও উন্মাদনার সুযোগে প্রশাসনিক কাজে হস্তক্ষেপ শুরু করেন তাঁর মা কোসম সুলতান। পুত্র ভোগবিলাসে ব্যস্ত থাকুক, এটা ছিল তাঁর ইচ্ছা। ধীরে ধীরে সাম্রাজ্য শাসনের নানা বিষয়ে অন্তঃপুরের অন্য নারীদের প্রভাব বাড়তে থাকে।

এমন অবস্থায় ছদরে আজম মুস্তফা পাশার সঙ্গে ধীরে ধীরে দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে সুলতান ইবরাহিমের। এসব দেখেও তাঁর মা কোসম কিছু বলতেন না। বরং পুত্রের আনন্দ আয়োজন ও ভোগবিলাসের সবকিছু জোগান দিয়ে তাঁকে মত্ত করে রাখতেন। একপর্যায়ে ছদরে আজমকে হত্যা করেন সুলতান ইবরাহিম। এর এক মাস পর মৃত্যুবরণ করেন শায়খুল ইসলাম ইয়াহইয়া আফেন্দি। অথচ এ দুজন ব্যক্তি সুলতান ইবরাহিমের সহযোগিতায় বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন।

এ দুই যোগ্য ব্যক্তিত্বের মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে সাম্রাজ্য পরিচালনার দায়িত্বে সক্রিয় হতে থাকে স্বার্থপর ও ক্ষমতালোভী মহল। এদের সঙ্গে যোগ দেন কোসম সুলতান এবং অন্তঃপুরের অন্য কয়েকজন নারী সহযোগী।

সুলতান ইবরাহিমের মা এবং দরবারের অন্য লোকেরা চিন্তিত ছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর কে হবে এই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী? সুলতান ইবরাহিমের পুত্রসন্তান জন্ম না হলে এই সাম্রাজ্য টিকবে না, এই আশঙ্কায় অন্তঃপুরের নারীরা তরুণ সুলতান ইবরাহিমকে নারীদের সঙ্গে যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে উত্তেজিত করে তুলতেন। সাম্রাজ্য পরিচালনার চেয়ে স্ত্রী ও সুন্দরী দাসীদের নিয়ে সুলতান মত্ত হয়ে থাকুক, এটাই তাঁদের ইচ্ছা।

উসমানি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চিকিৎসকদের জড়ো করে সুলতানের যৌনশক্তি বাড়াতে ওষুধ তৈরি করান তাঁর মা কোসম। এসব ওষুধ সেবনের পর সুলতান ইবরাহিম ক্রমেই নারীসঙ্গ পেতে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। দিনরাতের বেশির ভাগ সময় তিনি সুন্দরী রমণীদের নিয়ে যৌনলীলায় ডুবে থাকতেন।

চিকিৎসকদের ওষুধের প্রভাবে দিন দিন সুলতান ইবরাহিমের যৌনক্ষুধা বেড়ে যায়। তাঁর চাহিদা মেটাতে অন্তঃপুরে প্রতিনিয়ত বাড়তে থাকে বিদেশি রূপবতী দাসীর সংখ্যা। এঁদের মধ্যে সুলতানের প্রিয় যাঁরা, ধীরে ধীরে তাঁদের

Scanned with CamScanner

প্রভাব বেড়ে যায়। সুলতানের কাছে তাঁদের মাধ্যমে সুপারিশ করিয়ে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করত দরবারের ক্ষমতালোভী চক্র।

একপর্যায়ে সুলতান ইবরাহিম সব ব্যস্ততা ভুলে ডুবে গেলেন নারীসুখে। সুলতানি কোষাগার থেকে বেহিসাবি অর্থ ব্যয় করতে শুরু করলেন রমণীদের মনোরঞ্জনে। তালালি নামের এক সুন্দরী দাসীকে বিয়ে করার সময় তাঁকে মোহরানা হিসেবে পুরো মিসরের রাষ্ট্রীয় কোষাগার দিয়ে দেন তিনি। অন্য দাসী এবং স্ত্রীদের নিয়মিত বেতন, ভাতা ও চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় কোষাগার শূন্য হওয়ার উপক্রম হলো। উসমানি সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ রক্ষার নামে সুলতানের মা এবং দরবারের স্বার্থান্ধ মহল এভাবে সুলতানকে মত্ত রাখতে সফল হলো।

শারীরিক গঠনে মোটা রমণীদের প্রতি ভীষণভাবে আসক্ত ছিলেন সুলতান ইবরাহিম। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বাঁদী আর্মেনীয় বংশোদ্ভূত সাজিরবারার ওজন ছিল দেড় শ কেজি। দরবারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এই দাসীর কথায় গুরুত্ব দিতেন সুলতান। একপর্যায়ে সুলতানের মা কোসম এই সাজিরবারাকে হত্যা করে সুলতানকে জানিয়ে দেন, আকস্মিকভাবে মৃত্যু হয়েছে তাঁর, এ নিয়ে চিন্তার কিছু নেই।

তরুণ সুলতান ইবরাহিম নিজের যৌনচাহিদা পূরণে উন্মত্ত হয়ে গেলেন। দিনের বেশির ভাগ সময় কাটাতেন বাগান ও বিলাসবহুল সুসজ্জিত কামরায়। তিন শর বেশি দাসীর সঙ্গে নিয়মিত যৌনলীলায় সুখ খুঁজে পেতেন তিনি। নিজের ইচ্ছেমতো এদের ভোগ করতেন তিনি। কখনো সবাইকে উলঙ্গ করে তাঁর চারপাশে চক্রাকারে ঘুরতে বলতেন। এই বিপুলসংখ্যক নারীর গর্ভে জন্ম হয়েছিল সুলতান ইবরাহিমের শতাধিক সন্তান।

সুলতানের এসব অনৈতিক কর্মকাণ্ডে ধীরে ধীরে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে ইঙ্কেশারি সৈন্যদের মধ্যে। এমন খবর পেয়ে সুলতান ইবরাহিম নিজের লোকদের নিয়ে সমূলে তাদের উৎখাত করতে ছক আঁকেন। কিন্তু এই খবর জেনে যায় বিদ্রোহীরা। সুলতানের প্রস্তুতি শুরু হওয়ার আগেই তাঁর ওপর হামলে পড়ে একদল ক্ষুব্ধ সৈন্য। তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষমতাচ্যুত করে প্রাসাদের একটি কামরায় বন্দী করা হয় সুলতান ইবরাহিমকে। তাঁর পুত্র সাত বছর বয়সী মুহাম্মদকে সিংহাসনে বসিয়ে তাঁকে সুলতান হিসেবে ঘোষণা দেয় বিদ্রোহীরা।

বন্দী করার ১০ দিন পর হত্যা করা হয় সুলতান ইবরাহিমকে। এই হত্যার বৈধতায় ফতোয়া দিয়েছিলেন সেকালের নতুন শায়খুল ইসলাম আব্দুর

Scanned with CamScanner

রহিম আফেন্দি। পুত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং ষড়যন্ত্র প্রতিরোধে কোনো ভূমিকা রাখেননি মা কোসম। কারণ, রাষ্ট্রীয় কাজে তাঁর ক্ষমতা খর্ব করতে বেরেকবার চেষ্টা করেছিলেন সুলতান ইবরাহিম।

আট বছর নয় মাস সিংহাসনে ছিলেন সুলতান ইবরাহিম। ১৬৪৮ সালের ১৮ আগস্ট তিনি নিহত হন। তাঁর বয়স তখন মাত্র ৩৩ বছর। চাচা সুলতান মুস্তফার পাশে ইস্তাম্বুলে জামে আয়া সুফিয়া মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁকে দাফন করা হয়।

Scanned with CamScanner

উসমানি সাম্রাজ্যের লৌহমানবী

সুলতান আহমদের মৃত্যুর পর থেকে উসমানি সাম্রাজ্যের দরবারে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে ওঠেন অন্তঃপুরের এক বিদেশি নারী। সুলতান আহমদের স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিলেন তিনি। তাঁর নাম কোসম সুলতান। দরবারে এবং অন্তঃপুরে এই নারীর কথার বাইরে একচুল নড়ার ক্ষমতা ছিল না কারও।

সুলতান আহমদের মৃত্যুর পর কোসম সুলতানের ইচ্ছায় ক্ষমতায় বসানো হয় সুলতান মুস্তফাকে। এরপর ঘটে নানা ঘটনা ও দুর্ঘটনা। সুলতান মুস্তফাকে পদচ্যুত করে ক্ষমতায় বসানো হয় সুলতান দ্বিতীয় উসমানকে। কিছুদিন পর নির্মমভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়।

নৃশংস এমন হত্যাকাণ্ডের পর কোসম সুলতানের পরিকল্পনায় ক্ষমতায় বসানো হয় তাঁর পুত্র সুলতান চতুর্থ মুরাদকে। পুত্র তাঁর বাধ্যগত না হওয়ায় কিছুদিনের জন্য তিনি নিষ্ক্রিয় থাকেন। তবে সুলতান চতুর্থ মুরাদের মৃত্যুর পর আবারও সক্রিয় হয়ে ওঠেন এই নারী। ক্ষমতার কলকাঠি আবারও ফিরে আসে তাঁর হাতে। রাজনীতির দৃশ্যপটে নতুন করে হাজির হন কোসম সুলতান।

সুলতান চতুর্থ মুরাদের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই ইবরাহিম ছাড়া সাম্রাজ্যের হাল ধরার জন্য অন্য কোনো পুরুষ বেঁচে ছিল না উসমানি পরিবারে। বন্দিখানায় আটক ইবরাহিম তখন মানসিকভাবে প্রায় অসুস্থ। ফলে সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ নেতা এবং দরবারের উজিরদের সঙ্গে পরামর্শ শেষে উসমানি পরিবারের একমাত্র জীবিত পুরুষসদস্য তরুণ ইবরাহিমকে বসানো হয় উসমানি সাম্রাজ্যের সিংহাসনে।

প্রথা অনুযায়ী বাহ্যিকভাবে সুলতান ইবরাহিমকে সিংহাসনে বসানো হলেও পর্দার অন্তরাল থেকে সাম্রাজ্য পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন কোসম সুলতান। সুলতানের অযোগ্যতা এবং অন্তঃপুরের নারীদের হাতে ক্ষমতা চলে যাওয়ায় উসমানি সাম্রাজ্যের দরবারে সুবিধাভোগী ও স্বার্থপর গোষ্ঠীর আনাগোনা বেড়ে যায়।

Scanned with CamScanner

মানসিকভাবে অসুস্থ হলেও সুলতান ইবরাহিম বুঝতে পারেন, তিনি কেবল তাঁর মা কোসম সুলতানের খেলার পুতুল। আবারও বিবাদ দেখা দেয় মা ও পুত্রের মধ্যে। ইবরাহিম তাঁর মাকে নির্বাসনে পাঠানোর হুমকি দেন। অযোগ্য পুত্রের এই অসদাচরণ মেনে নিতে পারেননি কোসম সুলতান। যাকে তিনি মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন, সে তাঁকে হুমকি দেয় আজ! কোসম সুলতান তাঁর পুত্র ইবরাহিমকে ভর্ৎসনা করে জানিয়ে দেন, ক্ষমতা থেকে তিনি একচুলও নড়বেন না।

কোসম সুলতান তাঁর অযোগ্য পুত্র সুলতান ইবরাহিমকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা শুরু করেন। তিনি জানেন, এবার তাঁর হাত থেকে ক্ষমতা ফসকে গেলে আর সুযোগ হবে না। সুলতান ইবরাহিমের নানা কর্মকাণ্ডে নাখোশ উজির ও শায়খুল ইসলামের সঙ্গে পরামর্শ করেন কোসম। সিদ্ধান্ত হয়, ইবরাহিমকে সরিয়ে কোসম সুলতানের নাতি ছয় বছর বয়সী মুহাম্মদকে বসানো হবে সিংহাসনে।

উসমানি সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আবারও পরিবর্তন আসে। সুলতান ইবরাহিমকে পদচ্যুত করে ক্ষমতায় বসানো হয় শিশু সুলতান মুহাম্মদকে। অবাধ্য পুত্র ইবরাহিমকে শায়েস্তা করতে কোসম সুলতান নিজেই তাঁকে তুলে দেন জল্লাদের হাতে। ১৬৪৮ সালের ১৮ আগস্ট হত্যা করা হয় সুলতান ইবরাহিমকে।

ইবরাহিমের পুত্র চতুর্থ মুহাম্মদকে উসমানি সাম্রাজ্যের নতুন সুলতান ঘোষণার মধ্য দিয়ে নতুন রূপে হাজির হন কোসম সুলতান। কারণ, শিশু নাতিকে সহযোগিতা করতে সর্বময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিজের হাতে নেন কোসম সুলতান। নতুন সুলতান মুহাম্মদের মা খাদিজা তারখানকে উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতানজননী হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। খাদিজা ও কোসম সুলতানের মধ্যে হিংসা ও দ্বন্দ্বের নতুন সূচনা হয় এখান থেকে।

তিন বছর ধরে প্রচণ্ড বৈরিতা চলে দুজন নারীর মধ্যে। এই দুই নারীর পারস্পরিক রেষারেষির কাছে অসহায় হয়ে পড়ে পুরো উসমানি দরবার। শিশু সুলতান মুহাম্মদ তখন শুধুই তাঁর মা ও নানির খেলার পুতুল। অন্তঃপুরের সুলতানজননী খাদিজা এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী কোসম সুলতানের মধ্যে দ্বন্দ্বের প্রভাব পড়ে সর্বত্র। পরস্পরবিরোধী দুটি দলে ভাগ হয়ে পড়ে উসমানি সেনাবাহিনী ও দরবারের সভাসদ। এই দুই নারীর অভ্যন্তরীণ বিদ্বেষ সর্বত্র নতুন বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতার জন্ম দেয়।

Scanned with CamScanner

ছাড় দেওয়ার পাত্র নন কোসম সুলতান। নতুন করে পরিকল্পনা করেন শিশু সুলতান মুহাম্মদকে সরিয়ে প্রয়াত সুলতান ইবরাহিমের আরেক স্ত্রীর সন্তান সুলায়মানকে ক্ষমতায় বসানোর। ষড়যন্ত্রের খেলায় খাদিজাও তখন বেশ পটু। কোসম সুলতানের চক্রান্ত ধরা পড়ে তাঁর কাছে। নিজের ছেলে সুলতান মুহাম্মদকে সিংহাসনে টিকিয়ে রাখতে সুলতানজননী খাদিজা তখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন, এই নারীকে আর বেঁচে থাকতে দেওয়া হবে না।

১৬৫১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে একদল সশস্ত্র প্রহরী কোসম সুলতানের কামরায় ঢুকে পড়ে। ঘুমিয়ে থাকা কোসম সুলতানকে হত্যা করা হয় সেখানেই। নিথর হয়ে পড়ে থাকে ৬২ বছর বয়সী কোসম সুলতানের রক্তাক্ত দেহ। স্বামী মরহুম সুলতান আহমদের কবরের পাশে সমাহিত করা হয় তাঁকে।

প্রভাবশালী নারী কোসম সুলতানের হত্যার খবরে বিস্ময় ছড়িয়ে পড়ে সাম্রাজ্যের সাধারণ মানুষের মধ্যে। দীর্ঘকাল ধরে যে নারীর ইশারায় উসমানি সাম্রাজ্যের সিংহাসনে পালাবদল হতো, তাঁর এই হত্যাকাণ্ড মিশ্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয় সবার মনে। কারও কাছে তিনি লৌহমানবী হিসেবে নন্দিত, আবার কারও কাছে কুচক্রীদের সম্রাজ্ঞী হিসেবে নিন্দিত।

উসমানি সাম্রাজ্য ও সুলতানদের ইতিহাসজুড়ে নারীদের মধ্যে কোসম সুলতান একমাত্র লৌহমানবী হিসেবে খ্যাত। তাঁকে ঘিরে নানা গল্প ও ইতিহাস আজও তুর্কিদের মুখে মুখে ছড়িয়ে আছে। একদিকে তিনি যেমন ছিলেন প্রচণ্ড বুদ্ধিমতী ও মেধাবী, তেমনি অন্যদিকে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রে সূক্ষ্ম পারদর্শী।

১৬১৭ সাল থেকে সুদীর্ঘ সময় ধরে পুরো উসমানি সাম্রাজ্য তিনি একাই পরিচালনা করেছেন। কখনো প্রকাশ্যে, কখনো অন্তঃপুরে পর্দার আড়াল থেকে। ক্ষমতার মসনদ ধরে রাখতে তাঁর বুদ্ধি ও কৌশলের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছে উসমানি দরবারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব।

কোসম সুলতানের দুই পুত্র উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতান হয়েছিলেন। তাঁরা হলেন চতুর্থ মুরাদ ও প্রথম ইবরাহিম। দুই পুত্রের শাসনকালের পুরো সময়ে (১৬২৩-১৬৪৮ সাল) 'সুলতানজননী' উপাধি ধারণ করে সাম্রাজ্য পরিচালনায় মূল ভূমিকা পালন করেন তিনি।

পরবর্তী সময়ে তাঁর নাতি চতুর্থ মুহাম্মদকে ক্ষমতায় বসিয়ে ১৬৪৮ থেকে ১৬৮৭ সাল পর্যন্ত উসমানি সাম্রাজ্য পরিচালনার সব দায়িত্ব একাই সামাল দেন তিনি।

Scanned with CamScanner

উসমানি ইতিহাসের আলোচিত ও সমালোচিত কোসম সুলতানের আসল নাম 'আনাস্তাসিয়া'। বসনিয়ায় এক খ্রিষ্টান পরিবারে তাঁর জন্ম ১৫৯০ সালে। তাঁর বাবা বসনিয়ার অন্তর্গত তিনোস দ্বীপের পাদরি ছিলেন বলে জানা যায়। যুদ্ধবন্দী হিসেবে উসমানিদের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর দাসী হিসেবে তাঁকে নিয়ে আসা হয় ইস্তাম্বুলে। ১৫ বছর বয়সে সুলতান আহমদের হারেমে তাঁর আশ্রয় হয়। সুলতান তাঁকে দেখে মুগ্ধ হন এবং তাঁকে বিয়ে করেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর তাঁর নাম রাখা হয় 'খাসেকি কোসম মাহবেকার'। মাহবেকার শব্দের অর্থ 'চাঁদমুখ'।

সুলতান আহমদ ১৫ বছর বয়সী এই কিশোরীর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে যখন তাঁকে বিয়ে করতে চান, তখন সুলতানের মা হানদান এবং অন্তঃপুরের সম্রাজ্ঞী সুফিয়া এ বিয়ের ব্যাপারে বাধা দেন। কিন্তু সুলতান কারও কথাই শোনেননি। বরং অন্তঃপুরের সব প্রথা ভেঙে বিয়ে করেন মাহবেকারকে। এরপর তাঁকে বিশেষ পদমর্যাদা দেন অন্তঃপুরের নারীদের মধ্যে।

নিজের প্রভাব ও ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করতেন না কোসম সুলতান। এ বিষয়ে কারও প্রতি কোনো দয়া ও করুণা ছিল না তাঁর। তবু জনহিতকর কাজে তাঁর অবদান ছিল। প্রজাদের মধ্যে যারা ঋণের দায়ে অসহায়, তাদের ঋণ শোধ করতেন তিনি।

প্রতি আরবি বর্ষের শাবান মাসে তিনি কেন্দ্রীয় কারাগার পরিদর্শনে যেতেন এবং ঋণের দায়ে যারা বন্দী থাকত, নিজের পক্ষ থেকে তাদের সব ঋণ শোধ করে তাদের মুক্ত করে দিতেন। প্রজাদের মধ্যে অর্থের অভাবে যারা কন্যাদের বিয়ে দিতে অপারগ থাকত, তাদের অর্থ সহায়তা দিতেন কোসম সুলতান। নিজের অর্থে রাজপ্রাসাদের অনেক দাসীর বিয়ে দিয়েছেন তিনি।

ওসকোদার এলাকায় বিপুল অর্থ খরচ করে একটি সুন্দর মসজিদ তৈরি করিয়েছিলেন কোসম সুলতান। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষালয় ও পানির কূপ তৈরি করে দিতেন তিনি। পবিত্র নগরী মক্কাগামী যাত্রীদের সেবা ও আতিথেয়তার জন্য তাঁর অধিকাংশ সম্পদ তিনি ওয়াকফ করেছিলেন ১৬৪০ সালে।

Scanned with CamScanner

শিকারী সুলতান চতুর্থ মুহাম্মদ

ভোগবিলাস ও নারীসঙ্গে আসক্ত সুলতান ইবরাহিমকে হত্যার মধ্য দিয়ে শেষ হয় উসমানি সাম্রাজ্যের অস্থির এক অধ্যায়। এরপর সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসানো হয় তাঁর সাত বছর বয়সী পুত্র মুহাম্মদকে। ১৬৪২ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

১৬৪৮ সালের আগস্ট মাসে উসমানি সাম্রাজ্যের ১৯তম সুলতান হিসেবে সিংহাসনে সমাসীন হন শিশু সুলতান চতুর্থ মুহাম্মদ। অন্তঃপুরের নারীদের প্রভাব ও দরবারের ছদরে আজম এবং অন্যান্য লোকদের স্বেচ্ছাচারিতায় উসমানি সাম্রাজ্যজুড়ে তখন চরম বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য বিরাজ করছিল।

দীর্ঘ ৪০ বছর ৫ মাস ধরে উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতান ছিলেন চতুর্থ মুহাম্মদ। উসমানি সাম্রাজ্যের স্বপ্নদ্রষ্টা আরতুগরুল, সাম্রাজ্যের জনক সুলতান উসমান ও সুলতান সুলায়মানের পর সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে উসমানি সাম্রাজ্য শাসনের সুযোগ পেয়েছিলেন এই তরুণ সুলতান।

সুলতান চতুর্থ মুহাম্মদের শাসনামলের প্রথম কয়েক বছর ছিল তাঁর মাতামহ কোসম সুলতানের জন্য স্বর্ণযুগ। নাতিকে ক্ষমতার আসনে প্রতীকী অর্থে বসিয়ে ইচ্ছেমতো উসমানি সাম্রাজ্য শাসন করেছেন এই নারী।

১৬৮৭ সালের ৮ নভেম্বর তাঁকে পদচ্যুত করা হয়। কিছুদিন নির্বাসনে থাকার পর ১৬৯২ সালের ১৭ ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর।

শিকারের প্রতি সুলতান চতুর্থ মুহাম্মদ প্রবলভাবে আসক্ত ছিলেন। তাঁকে শিকারি সুলতান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় আজও। নিজ শাসনামলে তিনি সাম্রাজ্যের সব পানশালা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করতেন।

Scanned with CamScanner

সাম্রাজ্যের সব শাখা-প্রশাখায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেও শেষ পর্যায়ে ব্যর্থ হন সুলতান চতুর্থ মুহাম্মদ। একসময় দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ে উসমানি সাম্রাজ্যে। এতে বিপুলসংখ্যক লোকের মৃত্যু হয়।

একই সময়ে ইস্তাম্বুল শহরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। সাধারণ মানুষের এই বিপৎকালে সুলতান শিকারের নেশায় মত্ত ছিলেন। ফলে এ নিয়ে ক্ষোভের দানা বাধে ইঙ্কেশারি সৈন্যদের মধ্যে।

শুরু হয় বিদ্রোহ। অসহায় হয়ে পড়েন সুলতান চতুর্থ মুহাম্মদ। একপর্যায়ে তাঁকে পদচ্যুত করা হয়। তাঁর স্থলে নতুন সুলতান হিসেবে সমাসীন হন তাঁর ভাই সুলায়মান।

Scanned with CamScanner

সুলতান দ্বিতীয় সুলায়মান

১৬৪২ সালের ১৫ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন সুলতান দ্বিতীয় সুলায়মান। শৈশব থেকেই তাঁকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল রাজপ্রাসাদের কারাগারে। সুলতান চতুর্থ মুহাম্মদকে পদচ্যুত করার পর ছদরে আজম মুস্তফা পাশা হাজির হন বন্দিখানায়। এ সময় তিনি 'আমাদের মহামান্য জাহাঁপনা' বলে ডাক দেন সুলায়মানকে। কিন্তু এমন সম্বোধনে ভয় পেয়ে চুপ থাকেন সুলায়মান।

ছদরে আজম তখন তাঁর সামনে উপস্থিত হন এবং পুরো পরিস্থিতি তুলে ধরেন। এরপর নতুন সুলতান হিসেবে তাঁকে মনোনীত করার সুসংবাদ জানান। এতে স্বস্তি ফিরে পান সুলায়মান। ছদরে আজমকে ধন্যবাদ জানিয়ে আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

ফলে ১৬৮৭ সালে উসমানি সাম্রাজ্যের ২০তম সুলতান হিসেবে অধিষ্ঠিত হন সুলতান দ্বিতীয় সুলায়মান। উসমানি সাম্রাজ্যের ভেতর ও বাইরে তখন জটিল অস্থিরতা বিরাজ করছিল। সাম্রাজ্যের ভেতরে ইঙ্কেশারি সৈন্যদের চরম বিশৃঙ্খলায় পুরো প্রশাসনিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল। এ সুযোগে বহির্বিশ্বের চার শত্রুরাষ্ট্র একযোগে উসমানি সাম্রাজ্যের ওপর আক্রমণ করে। রাশিয়া, জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও ইতালির ভেনিস উসমানি সাম্রাজ্যের নিরাপত্তাব্যবস্থা নড়বড়ে করে দেয়।

চারদিকে পরাজয়ের দুঃসময়ে শায়খুল ইসলামের পরামর্শে ১৬৮৯ সালে মুস্তফা পাশাকে ছদরে আজম হিসেবে নিয়োগ দেন সুলতান দ্বিতীয় সুলায়মান। মুস্তফা পাশা শর্ত আরোপ করেন, তিনি ছদরে আজম হলে ইঙ্কেশারি বাহিনীর কোনো সামরিক নেতা তাঁর কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। সুলতান এ শর্ত মেনে নেন।

ছদরে আজম মুস্তফা পাশার যোগ্য নেতৃত্বে মনোবল ফিরে পায় ইঙ্কেশারি বাহিনীর সাধারণ সৈন্যরা। তিনি সাধারণ মানুষের ওপর আরোপিত কিছু অযৌক্তিক কর তুলে দেন। এতে স্বস্তি ফিরে আসে মানুষের মধ্যে। যেসব

Scanned with CamScanner

স্বার্থসন্ধানী লোক উসমানি দরবারের চারপাশ ঘিরে চক্র বেঁধেছিল, তাদের সবাইকে সরিয়ে দেন ছদরে আজম।

১৬৯০ সালে একের পর এক সামরিক অভিযানে নেতৃত্ব দেন ছদরে আজম। এ সময় বেলগ্রেডসহ বেশ কিছু হারানো অঞ্চল আবারও উসমানিদের অন্তর্গত হয়। ছদরে আজমের এ সাফল্যে উচ্ছ্বসিত হন সুলতান দ্বিতীয় সুলায়মান। ছদরে আজম যখন ইস্তাম্বুলে ফিরে আসেন, তখন সুলতান নিজে উপস্থিত হয়ে তাঁকে স্বাগত জানান।

ধীরে ধীরে বেশ কিছু অসুখ বাসা বাঁধে সুলতানের শরীরে। অসুস্থ শরীর নিয়ে জার্মানির ওপর আক্রমণ অভিযানে রওনা হন সুলতান। যাত্রাপথে আদিরনা শহরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। দিনটি ছিল ১৬৯১ সালের ২৩ জুন।

মৃত্যুকালে সুলতান দ্বিতীয় সুলায়মানের বয়স হয়েছিল ৫০ বছর। মাত্র তিন বছর আট মাস তিনি উসমানি সাম্রাজ্যের শাসক ছিলেন। তাঁর মৃতদেহ ইস্তাম্বুলে নিয়ে আসা হয় এবং সেখানে দাফন করা হয়।

Scanned with CamScanner

বহুভাষী সুলতান দ্বিতীয় আহমদ

সুলতান দ্বিতীয় সুলায়মানের মৃত্যুর পর উসমানি সাম্রাজ্যের ২১তম সুলতান হিসেবে সাম্রাজ্যের হাল ধরেন ৫০ বছর বয়সী সুলতান দ্বিতীয় আহমদ। তিনি ছিলেন সুলতান ইবরাহিমের তৃতীয় পুত্র। ১৬৪৩ সালের ২২ জুন তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

১৬৯১ সালের ২২ জুন তিনি উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতান হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। সুলতান দ্বিতীয় আহমদ ক্ষমতা গ্রহণের এক মাস পরই উসমানি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে অস্ট্রিয়া। সুলতান এ যুদ্ধের নেতৃত্বে ছদরে আজম মুস্তফা পাশাকে দায়িত্ব দেন।

অস্ট্রিয়া বাহিনীর বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী এ যুদ্ধে নিহত হন মুস্তফা পাশা। এর পরপরই পরাজয়ের শিকার হয় উসমানি বাহিনী। মুস্তফা পাশার মৃত্যুর পর নতুন ছদরে আজম হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন আলী পাশা। প্রশাসনিক যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতায় তিনি ছিলেন যোগ্যতাবিহীন ব্যক্তিত্ব।

অস্ট্রিয়া ও জার্মানির কাছে পরাজয়ের পরপর বিদ্রোহ শুরু হয় লেবানন ও আশপাশের অঞ্চলে। এ সময় চারপাশ থেকে সংকীর্ণ হয়ে পড়ে উসমানি সাম্রাজ্যের মানচিত্র। একের পর এক পরাজয় ও বিদ্রোহের সংবাদে ভেঙে পড়েন সুলতান দ্বিতীয় আহমদ।

মাত্র চার বছর আট মাস সুলতান হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকার পর ৫৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন সুলতান দ্বিতীয় আহমদ। দিনটি ছিল ১৬৯৫ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি।

সুলতান দ্বিতীয় আহমদ আরবি ও ফারসি ভাষায় দক্ষ ছিলেন। হস্ত লিপিতেও তিনি দারুণ পারদর্শী ছিলেন। নিজের হাতে তিনি পবিত্র কোরআন লিখেছেন। এছাড়া তিনি নিয়মিত লেখালেখি করতেন। তাঁর লেখা দিনলিপি ঐতিহাসিকদের কাছে আজো ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত।

Scanned with CamScanner

পরাজিত সুলতান দ্বিতীয় মুস্তফা

সুলতান দ্বিতীয় আহমদের মৃত্যুর পর উসমানি সাম্রাজ্যের সিংহাসনে ২২তম সুলতান হিসেবে অধিষ্ঠিত হন তাঁর ভাতিজা দ্বিতীয় মুস্তফা। ইতিহাসের পাতায় তখন ১৬৯৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। সুলতান চতুর্থ মুরাদের পর যেসব সুলতান উসমানি সাম্রাজ্যের হাল ধরেছেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য ও সংস্কৃতিমনা শাসক হিসেবে সুলতান দ্বিতীয় মুস্তফা প্রসিদ্ধ।

সুলতান দ্বিতীয় মুস্তফার জন্ম ১৬৬৪ সালের ২ জুন। তিনি উসমানি সাম্রাজ্যের আরেক অধিপতি সুলতান চতুর্থ মুহাম্মদের সন্তান।

অস্ট্রিয়া, রাশিয়াসহ ইউরোপের বেশ কিছু অঞ্চলের সঙ্গে তখন উসমানি সাম্রাজ্যের যুদ্ধ চলছিল। সুলতান দ্বিতীয় মুস্তফা সিংহাসনে আরোহণ করে চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য সৈন্যদের প্রস্তুতি নিতে বলেন। দরবারের সভাসদ ও সুলতানের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন এ সময়ে যুদ্ধযাত্রা থেকে সুলতানকে বিরত থাকতে অনুরোধ করেন। কিন্তু সুলতান সব অনুরোধ উপেক্ষা করে ইউরোপের বিদ্রোহীদের দমনে সংকল্প করেন। সুলতানের নেতৃত্বে প্রথম কয়েকটি সামরিক অভিযানে জয় ছিনিয়ে নেয় উসমানি সৈন্যরা।

১৬৯৭ সালে এমনই এক যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার সৈন্যদের মুখোমুখি হয় উসমানি সেনাবাহিনী। এ যুদ্ধেও নেতৃত্ব দেন স্বয়ং সুলতান। কিন্তু শত্রুদের হাতে উসমানি বাহিনীর ১৫ হাজার সৈন্য শাহাদাতবরণ করে। এর ফলে পরাজিত হয়ে ফিরে আসেন সুলতান ও উসমানি সৈন্যরা। উসমানি সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এটাই প্রথম এমন পরাজয়, যেখানে স্বয়ং সুলতান উপস্থিত থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

এ পরাজয়ের ফলে শোকাবহ নীরবতায় ছেয়ে যায় পুরো উসমানি সাম্রাজ্য। চিরশত্রু ইরানের শাসকও ব্যথিত হন উসমানিদের এমন বেদনাদায়ক পরাজয়ে। এ যুদ্ধের পর সুলতান দ্বিতীয় উসমান ইউরোপের দেশগুলোর সঙ্গে ২৫ বছর মেয়াদি শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এর ফলে

Scanned with CamScanner

অস্ট্রিয়া, পোল্যান্ডসহ ইউরোপীয় দেশগুলোর সঙ্গে উসমানি সাম্রাজ্যের দীর্ঘ ১৫ বছরের যুদ্ধ বন্ধ হয়। রাশিয়ার সঙ্গে নয় বছর ধরে চলমান যুদ্ধেরও অবসান হয়।

এসব শান্তিচুক্তির ফলে ইউরোপে উসমানি সাম্রাজ্যের শাসন সমাপ্ত হয়। সংকীর্ণ হয়ে আসে উসমানী সাম্রাজ্যের আয়তন ও সীমানা। এ সময়ের পর থেকে উসমানি সাম্রাজ্যের দরবার থেকে ইউরোপের শাসকদের কাছে যেসব রাষ্ট্রীয় চিঠি পাঠানো হতো, সেগুলোতে 'তুমি'র পরিবর্তে 'আপনি' করে লেখার প্রচলন শুরু হয়। ইউরোপের দেশগুলোতে উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতাপ ধীরে ধীরে কমে আসতে থাকে।

সুলতান দ্বিতীয় মুস্তফা এ সংকটাপন্ন সময়ে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সমস্যা ও গোলযোগ দমনে মনোযোগ দেন। সাম্রাজ্যের শায়খুল ইসলাম ফয়জুল্লাহ আফেন্দির পরামর্শে নতুন ছদরে আজম হিসেবে নিয়োগ পান রামি আফেন্দি। কিন্তু কিছুদিন পর শায়খুল ইসলাম ও ছদরে আজমের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। এ দুজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির পারস্পরিক দ্বন্দ্বে সুলতানের দরবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। শায়খুল ইসলাম তাঁর প্রভাব কাজে লাগিয়ে নিজের পছন্দের লোকদের বিভিন্ন পদে নিয়োগ দেন। এসব অনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলে সাধারণ মানুষের কাছে তিনি নিন্দিত ও সমালোচিত হন। দরবারের বিভিন্ন কাজে শায়খুল ইসলামের হস্তক্ষেপে মনে হতো, যেন তিনিই এই সাম্রাজ্যের সুলতান।

সুলতান দ্বিতীয় মুস্তফা এ সময় প্রশাসনের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়া দুর্নীতিবাজ ও অসৎ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শুদ্ধি অভিযান শুরু করেন। সাম্রাজ্যের ভেতরে যেন পচন না ধরে, সে জন্য তিনি ষড়যন্ত্রকারীদের শনাক্ত করে তাদের শাস্তি দেন। সুলতানের এ কঠোর অভিযানে ক্ষুব্ধ হয় সুযোগসন্ধানীরা।

১৭০৩ সালে সুলতানের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামেন স্বার্থবাদী কিছু কর্মকর্তা। ধীরে ধীরে এ সংখ্যা বাড়তে থাকে। তাঁদের প্ররোচনায় সুলতানের বিরুদ্ধে প্রায় ৮০ হাজার মানুষ সমবেত হয়। শায়খুল ইসলাম ফয়জুল্লাহ আফেন্দি জনরোষের কারণে ১৫ আগস্ট তারিখে সুলতানকে সিংহাসন থেকে পদচ্যুতির ফতোয়া জারি করেন। এরপর তাঁর ভাই শাহজাদা আহমদকে সাম্রাজ্যের নতুন সুলতান হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়।

উসমানি সাম্রাজ্যের সিংহাসন থেকে সাধারণ মানুষের হাতে এভাবে পতনের ঘটনায় মর্মাহত হন সুলতান। গভীর দুঃখ ও কষ্ট তাঁকে অসুখী করে

Scanned with CamScanner

তোলে। এ ঘটনার চার মাস পর ১৭০৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল তখন ৪০ বছর।

সুলতান দ্বিতীয় মুস্তফাকে পদচ্যুতির পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন শায়খুল ইসলাম ফয়জুল্লাহ। তাঁর পরিণতিও ভালো হয়নি। নতুন সুলতান তৃতীয় আহমদ ক্ষমতা গ্রহণের পর ক্ষুব্ধ সৈন্যদের দাবিতে তাদের হাতে তুলে দেন শায়খুল ইসলামকে। উত্তেজিত সৈন্যরা তাঁকে অপমানিত করে। একপর্যায়ে সৈন্যরা তাঁকে হত্যা করে লাশ সাগরে ভাসিয়ে দেয়।

সুলতান দ্বিতীয় মুস্তফা মোট আট বছর আট মাস উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতান হিসেবে সিংহাসনে দায়িত্ব পালন করেন।

Scanned with CamScanner

লিলিপ্রেমী সুলতান তৃতীয় আহমদ

উসমানি সাম্রাজ্যের ২৩তম সুলতান তৃতীয় আহমদের জন্ম ১৬৭৪ সালের ২৩ ডিসেম্বর। তিনি সুলতান চতুর্থ মুহাম্মদের দ্বিতীয় পুত্র। বড় ভাইয়ের শাসনামলে নয় বছর তিনি যুবরাজ হিসেবে আনন্দময় সময় পার করেছেন।

সুলতান তৃতীয় আহমদ যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন সর্বত্র উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। এ কঠিন পরিস্থিতি সামাল দিতে সুলতান প্রথমে ইঙ্কেশারি বাহিনীর উত্তেজিত সৈন্যদের শান্ত করেন। নতুন সুলতান হিসেবে তিনি সৈন্যদের মধ্যে অঢেল বকশিশ বিতরণ করেন।

১৭০৩ থেকে ১৭১১ সাল পর্যন্ত তিনি অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি শান্ত করেন। এরপর যখন পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে, তখন তিনি ইঙ্কেশারি সেনাবাহিনীর মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা কুচক্রী নেতাদের ধরা শুরু করেন এবং তাদের বরখাস্ত করে শাস্তি দেন।

উসমানি সাম্রাজ্যের যেসব সুলতান অনেক নারীকে বিয়ে করার কারণে প্রসিদ্ধ, সুলতান তৃতীয় আহমদ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর স্ত্রী ও দাসীদের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে অর্ধশতাধিক সন্তানসন্ততি।

সুলতান তৃতীয় আহমদের শাসনকালকে লিলিযুগ বলা হয়। কারণ, লিলি ছিল সুলতানের প্রিয় ফুল। তাঁর আমলে লিলি ফুলের বিভিন্ন জাতের চাষ বেড়ে যায়। এ সময় উসমানি সাম্রাজ্যে প্রায় ২৩৪ প্রকারের লিলি ফুল চাষ করা হতো। সুলতান এ ফুলের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে একটি ফরমান জারি করেন।

১৭১৮ থেকে ১৭৩০ সাল পর্যন্ত সময়কে উসমানি সাম্রাজ্যের সংস্কৃতি ও আধুনিকতা এবং বিলাসিতার যুগ হিসেবে ধরা হয়। এককথায় ঐতিহাসিকদের কাছে এটি লিলিযুগ হিসেবে পরিচিত।

Scanned with CamScanner

লিলিযুগে রাতভর বিভিন্ন মজলিস জমে উঠত। সুলতান আহমদ এসব মজলিসে সাম্রাজ্যের গায়ক ও গুণী ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানাতেন। সুরের লহরী আর সবার প্রাণখোলা আড্ডায় প্রাণবন্ত রজনী উসমানি সাম্রাজ্যজুড়ে অন্য রকম আবহ তৈরি করত। খোদ ছদরে আজম ও শায়খুল ইসলামও এসব নৈশ মজলিসে উপস্থিত থাকতেন।

তবে রাতের আড্ডা ও আনন্দ আয়োজনে সুলতানের আসক্তির সুযোগে শহরের উচ্চবিত্ত সমাজে অনৈতিক কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে পড়ে। বিত্তবান নাগরিকরা নিজেদের উদ্যোগে রাতভর আনন্দ উৎসবের আয়োজন করত। কখনো কখনো সেসব মজলিসে অশ্লীল নাচ ও গানের আসর জমতো। রাতের ইস্তাম্বুলে স্থানীয় তরুণেরা মাদক সেবনে জড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে মাদক সেবন নিষিদ্ধ করে ফতোয়া দেন শায়খুল ইসলাম। পাশাপাশি কোনো নারী যেন খোলামেলা পোশাকে রাতের মজলিসগুলোতে উপস্থিত না থাকে, সে ব্যাপারে ফরমান জারি করেন সুলতান।

সুলতান তৃতীয় আহমদ ও ছদরে আজমের বিরোধী গোষ্ঠী দরবারের নৈশ মজলিস নিয়ে বাজারে বিভিন্ন গুজব ছড়িয়ে দেয়। তাদের অপপ্রচারে অনেক সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হতে থাকে। তাদের ধারণা জন্মে, সুলতান ও ছদরে আজম রাতভর আড্ডায় অনৈতিক কাজে লিপ্ত হন। ইস্তাম্বুলের সাবেক বিচারক জালালি হাসান আফেন্দিসহ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সুলতান ও ছদরে আজমের বিরুদ্ধে এ অপপ্রচারে যোগ দেন।

বিশেষ করে, ১৭৩০ সালে ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে অংশ নিতে সুলতান তৃতীয় আহমদ আগ্রহী ছিলেন না। ছদরে আজম চাইতেন, সুলতান যেন নিজে এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। কিন্তু বিলাসপ্রিয় সুলতান এ ব্যাপারে কিছু বলতে দ্বিধা করছিলেন। সুযোগসন্ধানীরা এ সময়ে সুলতানের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে মিথ্যা ও উসকানিমূলক মিথ্যা প্রচারণা শুরু করে। তারা দাবি তোলে, 'আমরা চরিত্রবান সুলতান চাই।'

এই এক যুগে উসমানি সাম্রাজ্যের সামরিক বিজয় খুব বেশি হয়নি সত্য, তবে অভ্যন্তরীণ সমৃদ্ধিতে অনেক দূর এগিয়ে যায় এ সাম্রাজ্য। শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম, সংস্কৃতি ও ইতিহাসচর্চায় সুলতান এবং ছদরে আজমের উদার সমর্থন ও সহযোগিতায় জ্ঞানী ও গুণীদের সমাজে নতুন উদ্দীপনা জেগে ওঠে।

ছদরে আজম ইবরাহিম পাশার তত্ত্বাবধানে উসমানি সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক বইপত্র গবেষণা শুরু হয় এ সময়। এ ছাড়া ইতিহাসের অনেক

Scanned with CamScanner

গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ আরবি ভাষা থেকে উসমানি তুর্কি ভাষায় অনুবাদ করা হয়। এর মধ্যে আকদুল জামান, হাবিবুর সায়র, জামেউদ দুওয়াল উল্লেখযোগ্য।

ছদরে আজমের বিশেষ আগ্রহে উসমানি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্র গড়ে ওঠে। অনুন্নত অঞ্চলে ব্যাপক উন্নয়নের ছোঁয়া লাগে। তাঁর উদ্যোগে ইস্তাম্বুলে নির্মিত হয় দারুল হাদিস। এ ছাড়া তুর্কি ঐতিহ্যের যেসব বিষয় প্রায় হারাতে বসেছিল উসমানিরা, সেসব নতুন করে জন্মলাভ করে।

আজান ও জুমাবিহীন একদিন

উসমানি সাম্রাজ্যের পথচলা শুরু হয় ২৭ জুলাই ১২৯৯ সাল থেকে। তিন মহাদেশজুড়ে বিস্তৃত এই সুবিশাল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে ১৯১৮ সালের ১৩ নভেম্বর। এই সুদীর্ঘ সময়ে উসমানি সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রতিদিন পাঁচবার আজান ধ্বনিত হতো। অসংখ্য মসজিদে অনুষ্ঠিত হতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জামাত। প্রতি শুক্রবার উৎসবমুখর পরিবেশে আদায় করা হতো জুমার নামাজ। সুদীর্ঘ ৬২৪ বছরের বেশি সময়ে উসমানি সাম্রাজ্যে এক দিনও আজানবিহীন পার হয়নি।

কিন্তু এই চিরন্তন নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে ১৭৩০ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর। দিনটি ছিল শুক্রবার। অথচ এদিন উসমানি সাম্রাজ্যের কোথাও জুমার আজান হয়নি, জামাত অনুষ্ঠিত হয়নি। সব অঞ্চলের মসজিদগুলো এদিন বন্ধ ছিল, আজান দেওয়ার ওপর ছিল অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা। উসমানি সাম্রাজ্যের সিংহাসনে তখন অধিষ্ঠিত বিলাসপ্রিয় আমুদে সুলতান তৃতীয় আহমদ।

উসমানি সাম্রাজ্যের ইতিহাসে ১৭১৮ থেকে ১৭৩০ সাল পর্যন্ত সময়কে আমোদ-ফুর্তির যুগ হিসেবে ধরা হয়। এক যুগ দীর্ঘ এই বিলাসী সময়ে সুলতান থেকে শুরু করে সর্বসাধারণের সমাজে ব্যাপক আকারে ভোগ ও বিলাসিতা ছড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ছদরে আজম ইবরাহিম পাশা নিহত হন এবং সুলতান তৃতীয় আহমদকে পদচ্যুত করা হয়।

শান্তিপ্রিয় সুলতান তৃতীয় আহমদ যুদ্ধবিগ্রহের পরিবর্তে শান্তিচুক্তি ও সন্ধি-সমঝোতার প্রতি গুরুত্ব দেন। তবে এর ফলে সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে যায়। সৈন্যদের মধ্যে ধর্মচর্চা ও জিহাদের চেতনা দুর্বল হয়ে পড়ে।

Scanned with CamScanner

সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে দ্রব্যমূল্যের দাম বেড়ে যায়। এর ফলে সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। একপর্যায়ে এই ক্ষোভ ও অস্থিরতা বিদ্রোহে রূপ নেয়। ইস্তাম্বুল নগরীর বিখ্যাত হাম্মামখানা বায়েজিদ হাম্মামের প্রধান কর্তা আলবেনীয় বংশোদ্ভূত রইস খলিল সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া ক্ষোভ ও অস্থিরতার সুযোগ কাজে লাগান। তিনি গোপনে একদিন তাঁর কর্মচারী ও হাম্মামখানায় সেবা নিতে আসা গ্রাহকদের জড়ো করার পরিকল্পনা করেন। একটি নির্দিষ্ট দিনে সবাই সমবেত হয় তাঁর হাম্মামখানায়। তিনি তাঁদের নিয়ে সুলতানের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দেন। ইবরাহিম ও তাঁর নেতৃত্বে সমবেত মানুষের স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে ইস্তাম্বুলের পথঘাট। এ সময় আরও অনেক সাধারণ মানুষ এসে যোগ দেয় তাঁদের সঙ্গে।

ওদিকে রাজপ্রাসাদে সুলতান ও দরবারের সভাসদ তখনো এই উত্তপ্ত পরিস্থিতি বুঝে উঠতে পারেননি। এই আন্দোলনের খবর পেয়ে ইঙ্কেশারি সেনাবাহিনীর সামরিক নেতারা রইস খলিলের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব পাঠান। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয় সামরিক নেতাদের।

দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনায় প্রথম দিন কোনো সমঝোতা হলো না। দ্বিতীয় দিন শুক্রবার। উত্তপ্ত পরিস্থিতি চলাকালে সাধারণ মানুষের কাতারে উপস্থিত হন শহরের সাধু দরবেশ ইবরাহিম। তিনি আন্দোলনরত সবাইকে উদ্দেশ করে বলেন, 'আপনারা যে দাবিতে আন্দোলন করছেন, তা অত্যন্ত কল্যাণময়। সুলতান ও দরবারের ভোগবিলাস ও অন্যায়ের প্রতিবাদে আজ শহরের কোথাও আজান দেওয়া হবে না, এই শহরে জুমার নামাজ বৈধ হবে না।'

দরবেশের কথায় সাড়া পড়ে আন্দোলনরত মানুষের মধ্যে। রইস খলিলের পক্ষে শহরবাসীর সমর্থন বাড়তে থাকে। এ শক্তি ব্যবহার করে তিনি ঘোষণা করলেন, কেউ আজ মসজিদে যাবে না। কোনো ইমাম আজ জুমার নামাজ পড়াবে না। এ সিদ্ধান্ত যারা অমান্য করবে, তাদের শাস্তি দেওয়া হবে।

সেদিন কেউ মসজিদে আজান দেয়নি, শহরের কোনো অধিবাসী মসজিদে যায়নি, কোনো ইমাম জুমার মেহরাবে দাঁড়াননি। উসমানি সাম্রাজ্যের ইতিহাসে প্রতিবাদের অভিনব এই রীতিতে বিনা আজান ও নামাজে কেটে গেল দিনটি, ১৭৩০ সালের ২৯ এপ্রিল।

আন্দোলনকারীদের নেতা রইস খলিল এবং সেনাবাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে বৈঠক ও আলোচনায় গড়িয়ে যায় ২৯ দিন। অবশেষে দুই পক্ষ সুলতান তৃতীয় আহমদকে পদচ্যুত করার ব্যাপারে একমত হয়।

Scanned with CamScanner

আন্দোলনকারীরা বাবআলি প্রাসাদ ঘেরাও করে এবং সেখান থেকে ছদরে আজম ইবরাহিম পাশাকে আটক করে। উত্তেজিত জনতা ইবরাহিম পাশাকে টুকরো টুকরো করে হত্যা করে এবং তাঁর খণ্ডিত লাশ সাগরে ফেলে দেয়।

সুলতান তৃতীয় আহমদের পদচ্যুতির পর উসমানি সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসেন সুলতান প্রথম মাহমুদ। নতুন সুলতান ফরমান জারি করলেন, উসমানি সাম্রাজ্যের রাজধানী ইস্তাম্বুলে কোনো আলবেনীয় নাগরিক হাম্মামখানায় কর্মকর্তা বা কর্মচারী পদে কাজ করতে পারবে না।

১৬৭৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন সুলতান আহমদ। ৩২ বছর বয়সে তিনি উসমানি সাম্রাজ্যের ২৪তম সুলতান হিসেবে অধিষ্ঠিত হন।

Scanned with CamScanner

জনপ্রিয় সুলতান প্রথম মাহমুদ

১৭৩০ সালের ২ অক্টোবর সুলতান তৃতীয় আহমদ সিংহাসন থেকে পদত্যাগ করেন এবং আপন ভাতিজা মাহমুদের হাতে উসমানি সাম্রাজ্য শাসনের ভার অর্পণ করেন। এ সময় ইস্তাম্বুল শহরজুড়ে বিক্ষোভ ও লুটপাট চালায় আন্দোলনকারীরা। সুলতান তৃতীয় আহমদের শাসনামলে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্য যেসব ইমারত নির্মাণ করা হয়েছিল, সেসব পুড়িয়ে দেয় বিক্ষোভকারীরা। তাদের দাবি ছিল, এসব ইমারতে উসমানি সাম্রাজ্যের অশ্লীল কর্মকাণ্ড চলত।

ইস্তাম্বুলের সাদাবাদ এলাকার শত শত ভবনে আগুন ধরিয়ে দেয় উত্তেজিত একদল মানুষ। শহরজুড়ে সাধারণ মানুষের ঘরবাড়িতে লুটপাট ও ডাকাতি শুরু হয়। ১৩ দিনব্যাপী তাণ্ডব চালানোর পর ১১ অক্টোবর পরিস্থিতি শান্ত হয়। কিছুদিন পর এই আন্দোলনের মূল নেতা খলিল ও তাঁর ১৮ সহযোগীকে হত্যা করা হয়। ফলে আন্দোলনকারীদের সব চক্রান্ত থেমে যায়।

উসমানি সাম্রাজ্যের ২৪তম সুলতান প্রথম মাহমুদের জন্ম ১৬৯৬ সালে। তিনি একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। কবিতা লিখতে ভালোবাসতেন এবং পাশাপাশি তিনি সুরকার হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। সাংস্কৃতিক বোধ এবং প্রখর বুদ্ধিমত্তার অধিকারী সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ সবার সঙ্গে পরামর্শ করে সাম্রাজ্য পরিচালনা করতেন। 'সবক্তি' ছদ্মনামে তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন।

পিত্তথলিতে রক্তক্ষরণে অসুস্থ হয়ে পড়েন এই গুণী সুলতান। ১৭৫৪ সালের ১৩ ডিসেম্বর শুক্রবার তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। সুলতান প্রথম মাহমুদের মৃত্যুতে উসমানি সাম্রাজ্যজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। ২৫ বছর সাম্রাজ্য শাসনকালে তিনি সর্বস্তরের প্রজাদের মন জয় করেছিলেন। তাঁর সাহসী নেতৃত্বে উসমানি সাম্রাজ্য এশিয়া ও ইউরোপে আবারও বিস্তৃত হয়।

Scanned with CamScanner

ভিতু সুলতান তৃতীয় উসমান

সুলতান প্রথম মাহমুদের মৃত্যুর পর ২৫তম উসমানি সুলতান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁর ভাই সুলতান তৃতীয় উসমান। উসমানি সাম্রাজ্যের এই সুলতান অত্যন্ত কঠোর মেজাজের অধিকারী ছিলেন। কারও সঙ্গে মতপার্থক্য তিনি সহ্য করতে পারতেন না। ১৭৫৪ সালের ১৩ ডিসেম্বর ৫৮ বছর বয়সে তিনি উসমানি সাম্রাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

এর আগে শাহজাদা থাকাকালে জীবনের বেশির ভাগ সময় তিনি বন্দী অবস্থায় কাটিয়েছেন। নারী কিংবা সংগীতের প্রতি তাঁর কোনো আকর্ষণ ছিল না। বরং তিনি একা একা থাকতে ভালোবাসতেন। সব ঝামেলা থেকে দূরে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন তাঁর ভালো লাগত।

রাতের অন্ধকারে ছদ্মবেশে ইস্তাম্বুল নগরীতে একা একা ঘুরে বেড়াতেন সুলতান তৃতীয় উসমান। এ সময় তিনি সাধারণ মানুষের কথাবার্তা শুনতেন এবং গোপনে সাম্রাজ্যের পরিস্থিতি অনুধাবনের চেষ্টা করতেন। সাধারণ জনগণ যেকোনো সময় উত্তেজিত হয়ে পড়তে পারে এবং তাঁকে পদচ্যুত করবে, এই ভয়ে তিনি অস্থির থাকতেন বেশির ভাগ সময়।

উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি আলী পাশাকে ছদরে আজম হিসেবে মনোনীত করেন। সুলতানের আস্থার সুযোগে ছদরে আজম আলী পাশা বিভিন্ন অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়েন। এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

সুলতান যখন রাতে ছদ্মবেশে শহরে ঘুরে বেড়াতেন, তখন তিনি ছদরে আজম আলী পাশার বিভিন্ন অন্যায় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে মানুষের কথাবার্তা শুনতে পেলেন। যাঁকে বিশ্বাস করে তিনি ছদরে আজম পদে নিয়োগ দিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে প্রজাদের অভিযোগ শুনে তিনি ব্যথিত হন।

কিছুদিন তদন্ত ও অনুসন্ধানের পর যখন আলী পাশার বিরুদ্ধে শোনা অভিযোগগুলো সত্য প্রমাণিত হয়, তখন সুলতান ক্ষুব্ধ হন। ১৭৫৫ সালের

Scanned with CamScanner

২২ অক্টোবর তিনি ছদরে আজম আলী পাশাকে হত্যার আদেশ দেন। এরপর আলী পাশার মৃতদেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে সেটি রুপার একটি পাত্রে প্রাসাদের দরজার সামনে রাখতে বলেন সুলতান।

এরপর সুলতান ছদরে আজম হিসেবে নিয়োগ দেন মুস্তফা পাশাকে। কিছুদিন পর ১৭৫৬ সালের ১৩ ডিসেম্বর তাঁকে বরখাস্ত করেন তিনি। এরপর রাগেব পাশাকে উসমানি সাম্রাজ্যের নতুন ছদরে আজম হিসেবে মনোনীত করেন সুলতান তৃতীয় উসমান। এভাবে যখন যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি নিয়োগ দিতেন বা বরখাস্ত করতেন।

মাত্র ৩ বছর ১১ মাস উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতান হিসেবে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন সুলতান তৃতীয় উসমান। ১৭৫৭ সালের ৩০ অক্টোবর ৫৮ বছর বয়সে তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৬৯৯ সালে।

Scanned with CamScanner

সুলতান তৃতীয় মুস্তফা

সুলতান আব্দুল আজিজের মৃত্যুর পর ১৭৫৭ সালে উসমানি সাম্রাজ্যের ২৬তম সুলতান হিসেবে মনোনীত হন সুলতান তৃতীয় মুস্তফা। তিনি সুলতান তৃতীয় আহমদের পুত্র। ১৭১৭ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল সুলতান তৃতীয় মুস্তফার। এর পাশাপাশি তিনি পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। তাঁর শাসনামলে তিনি যোগ্য ছদরে আজম হিসেবে পেয়েছিলেন রাগেব পাশাকে। এই দক্ষ ছদরে আজমের নেতৃত্বে উসমানি সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তা ফিরে আসে। এ সময় সুলতান তৃতীয় মুস্তফা বারবার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে আগ্রহী হলেও ছদরে আজম তাঁকে কৌশল ও যুক্তিতে বারণ করেন। তিনি তাঁকে বোঝাতে সক্ষম হন, উসমানি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা রেখে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত হবে না।

উসমানি সাম্রাজ্যের পূর্ববর্তী সুলতানরা ক্ষমতা গ্রহণ উপলক্ষে সৈন্যদের মন খুশি করার জন্য যে বিপুল অর্থ বকশিশ হিসেবে দান করতেন, সে প্রথা বন্ধ করেন সুলতান তৃতীয় মুস্তফা। তিনি শেষবারের মতো সৈন্যদের বকশিশ দেন এবং জানিয়ে দেন, এ প্রথা এখন থেকে বিলুপ্ত করা হলো।

সুলতান তৃতীয় মুস্তফার শাসনামলে রাশিয়া শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করে পোল্যান্ডে অভিযান চালায়। এর ফলে উসমানি সাম্রাজ্যের সঙ্গে রাশিয়ার দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ শুরু হয়। একপর্যায়ে রাশিয়ার সৈন্যদের কাছে পরাজিত হয় উসমানি সেনাবাহিনী। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ শক্তির অবস্থান থেকে উসমানি সাম্রাজ্যের অবস্থান নিচে নেমে যায়। রাশিয়ার তৎকালীন সম্রাজ্ঞী ক্যাটরিনার প্ররোচনা ও সহযোগিতায় উসমানি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ শুরু হয়।

সাম্রাজ্য ও সেনাবাহিনীর এমন বিপর্যয় সহ্য করতে পারেননি সুলতান তৃতীয় মুস্তফা। তিনি এসব হতাশাজনক সংবাদে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৭৭৪ সালের ২১ জানুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মোট ১৬ বছর ৮ মাস তিনি উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতান হিসেবে সমাসীন ছিলেন।

Scanned with CamScanner

সুলতান প্রথম আব্দুল হামিদ

সুলতান তৃতীয় মুস্তফার মৃত্যুর পর উসমানি সাম্রাজ্যের ২৭তম সুলতান হিসেবে মনোনীত হন তাঁর ভাই সুলতান প্রথম আব্দুল হামিদ। বড় ভাই সুলতান মুস্তফার পুরো শাসনামলে প্রাসাদের বিশেষ বন্দিখানায় আটক ছিলেন এই সুলতান। ১৭২৪ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই প্রথম উসমানি সুলতান, যিনি সিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষে সৈন্যদের মধ্যে কোনো বকশিশ দান করেননি।

সুলতান প্রথম আব্দুল হামিদ নম্র মেজাজের শাসক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। উসমানি ঐতিহাসিকেরা তাঁকে সুফি ও দরবেশ এবং ধার্মিক শাসক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এমনকি সুলতান থাকাকালে তাঁর কিছু কারামত প্রকাশিত হয়েছে বলেও দাবি করেন কেউ কেউ।

রাশিয়ার সৈন্যদের হাতে বারবার পরাজিত হতে থাকে উসমানি সৈন্যরা। সুলতান প্রথম আব্দুল হামিদ এসব পরাজয়ের সংবাদে মর্মাহত হয়ে পড়েছিলেন। সর্বশেষ রাশিয়ান বাহিনী যখন ওজি দুর্গ দখল করে নেয় এবং সেখানের অধিবাসী মুসলমানদের ওপর নির্বিচারে গণহত্যা চালায়, তখন সুলতান মুষড়ে পড়েন। এখানেই শেষ নয়, বরং রাশিয়ার সেনারা আরও সামনে এগোতে থাকে। উসমানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল হোতিন ও বোডোলিয়াও তারা দখল করে নেয় এবং নির্মম গণহত্যায় মেতে ওঠে। একের পর এক এমন হৃদয়বিদারক খবরে সুলতানের মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। ১৭৮৯ সালের ৮ এপ্রিল ৬৬ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

১৫ বছর ৮ মাস উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতান হিসেবে সমাসীন ছিলেন সুলতান প্রথম আব্দুল হামিদ। একের পর এক অঞ্চল রাশিয়ার কাছে উসমানিদের পরাজয় এবং সেখানে মুসলমানদের ওপর হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তিনি ব্যথিত হৃদয়ে লিখেছিলেন, 'ওজি দুর্গের পতন আমার ভেতর যে দুঃখ ও কষ্টের জন্ম দিয়েছে, তা কেবল আল্লাহ পাক জানেন। রাশিয়ার সেনাবাহিনীর হাতে এত বিপুলসংখ্যক মুসলমানের হত্যাকাণ্ড আমার হৃদয়কে শোকাহত করে

Scanned with CamScanner

রেখেছে। হে মহান রব, আপনি সব রাজার অধিপতি, আপনার কাছে আমার সবটুকু আশা ও প্রার্থনা–আমার মৃত্যুর আগে যেন এ অঞ্চলগুলো আমি মুসলমানদের হাতে ফিরে আসা দেখে যেতে পারি।'

সুলতান প্রথম আব্দুল হামিদের শাসনামলে ১৭৭৪ সালের ১৭ জুলাই রাশিয়া ও উসমানি সাম্রাজ্যের মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তা ছিল উসমানি সাম্রাজ্যের জন্য চরম আত্মঘাতী। ২৮টি ধারায় লিখিত এই চুক্তিপত্রে এমন কিছু বিষয়ে দুই পক্ষ সই করেছিল, যা উসমানি সাম্রাজ্যকে পতনের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। এর ফলে তৎকালীন পৃথিবীর প্রথম পরাশক্তি হিসেবে উসমানি সাম্রাজ্যের যে অবস্থান ছিল, তা চতুর্থ স্থানে নেমে আসে। ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়ার পর উসমানি সাম্রাজ্যের নাম চতুর্থ শক্তি হিসেবে লেখা হতে থাকে। বলা হয়ে থাকে, উসমানি সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতনের যাত্রা শুরু হয় এ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে।

Scanned with CamScanner

সুলতান তৃতীয় সেলিম

উসমানি সাম্রাজ্যের ২৮তম সুলতান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন সুলতান তৃতীয় সেলিম। তাঁর পিতার নাম সুলতান তৃতীয় মুস্তফা। তাঁর চাচা সুলতান প্রথম আব্দুল হামিদের মৃত্যুর পর তিনি উসমানি সাম্রাজ্যের সিংহাসনে সমাসীন হন।

ইসলামি বিদ্যায় সুলতান তৃতীয় সেলিমের পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি কবি হিসেবে কবিতা লিখতেন। সুন্দর হস্তলিপিতে তাঁর দক্ষতা ছিল। শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল তাঁর।

রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার বাহিনীর কাছে এ সময় প্রতিনিয়ত মার খাচ্ছিল উসমানি সৈন্যরা। অব্যাহত সামরিক পরাজয়ের ফলে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ও সামাজিক ব্যবস্থা নড়বড়ে হয়ে পড়ে। ফলে সুলতান সেলিম নতুন করে সর্বত্র সংস্কারের কার্যক্রম হাতে নেন। কিন্তু এতে আশানুরূপ ফল আসেনি।

এ সময় উসমানি সাম্রাজ্যের দীর্ঘদিনের মিত্রশক্তি ফ্রান্সে নতুন সম্রাট হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন নেপোলিয়ন। তিনি উসমানি সাম্রাজ্যের অঞ্চল ভেনিস দখল করে নেন। শুধু তা-ই নয়, ১৭৯৮ সালে সম্রাট নেপোলিয়ন কোনো যুদ্ধের ঘোষণা ছাড়াই মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ার উদ্দেশে রওনা হন। বরং তিনি উসমানি সাম্রাজ্যের মিত্র সেজে ঘোষণা করেন, মিসরের মামলুকি শাসকদের মধ্যে যারা উসমানি সাম্রাজ্যের অনুগত নয়, তিনি তাদের শায়েস্তা করতে সেখানে যাচ্ছেন।

এমন মিত্রতা ও সহযোগিতামূলক ঘোষণার কৌশলে সরাসরি কায়রোয় গিয়ে হাজির হন সম্রাট নেপোলিয়ন। এরপর সেখানকার শাসক আবু বকর পাশা ও তাঁর সৈন্যদের পরাজিত করেন। উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতান তখন নেপোলিয়নের আসল রূপ চিনতে পারেন। নেপোলিয়ন মিসর থেকে ফিলিস্তিনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলে উসমানি সাম্রাজ্য তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। উসমানি সেনারা মিসর অভিমুখে রওনা হয়েছে এমন সংবাদে

Scanned with CamScanner

নেপোলিয়ন প্যারিসে ফিরে আসেন। উসমানি সৈন্যরা মিসরে প্রবেশ করে আবারও নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করে। এ সাফল্যের পর সুলতান তৃতীয় সেলিম গাজি উপাধিতে ভূষিত হন।

মিসরে মামলুকি শাসকদের ক্রমাগত বিদ্রোহ, অন্যদিকে রাশিয়ার চক্রান্ত, আবার ফ্রান্সের নতুন সম্রাট নেপোলিয়নের উৎপাত–এরই মধ্যে উসমানি সাম্রাজ্যে নতুন বিপদ হিসেবে আবির্ভূত হয় আরব উপসাগরীয় অঞ্চলে ওয়াহাবি মতবাদ।

ইঙ্কেশারি বাহিনীর একের পর এক পরাজয়ে আশাহত হয়ে পড়েন সুলতান তৃতীয় সেলিম। তিনি তাদের নতুন করে প্রশিক্ষণ ও সংস্কার করতে আদেশ করেন। কিন্তু ইঙ্কেশারির নেতারা সুলতানকে এ ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়েও কোনো পদক্ষেপ নেননি। একপর্যায়ে সুলতান নতুন একটি বাহিনী গঠনের ইচ্ছা পোষণ করেন। এ জন্য তিন নতুন সদস্যকে নিয়োগ দেন এবং তাঁদের জন্য আলাদা প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন করেন।

ইঙ্কেশারি সৈন্যদের মধ্যে নতুন বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে দ্বন্দ্ব ছড়িয়ে পড়ে। তারা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়। সেনাবাহিনীর এই অভ্যন্তরীণ গোলযোগে উসমানি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন শহরে অস্থিরতা তৈরি হয়। দরবারের সভাসদ ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। এক পক্ষ পুরোনো বাহিনী হিসেবে ইঙ্কেশারির সদস্যদের পক্ষে অবস্থান নেয়। অন্য পক্ষ পুরোনো বাহিনীর পরিবর্তে নতুন বাহিনীর প্রতি মনোযোগ দেওয়ার পক্ষে অবস্থান নেয়। এই সংকট ও বিভক্তি চলাকালে উসমানি সাম্রাজ্যের শায়খুল ইসলাম মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন সুলতানের সহযোগী এবং তাঁর সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের পরামর্শক।

তাঁর মৃত্যুর পর শায়খুল ইসলাম হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন সামরিক বাহিনীর কাজী আতাউল্লাহ আফেন্দি। তিনি পুরোনো ইঙ্কেশারি বাহিনীর সদস্যদের প্রতি অনুগত ছিলেন। শায়খুল ইসলাম হিসেবে তিনি গোপনে ইঙ্কেশারি বাহিনীর সদস্যদের উসকে দেন। এই গোপন আন্দোলনে পূর্ণ সমর্থন জানান রাজপ্রাসাদের শাহজাদা মুস্তফা।

১৮০৭ সালের ২৭ মে। ইঙ্কেশারি বাহিনীর ৮০০ সদস্য এবং নৌবাহিনীর ২০০ সদস্য আকস্মিকভাবে ইস্তাম্বুল শহরের প্রাণকেন্দ্র আতমায়দানে অবস্থান নেয়। ইঙ্কেশারি বাহিনীর আবাসিক ক্যাম্প থেকে তারা অনেকগুলো হাঁড়িপাতিল নিয়ে আসে। পাতিলগুলো সারিবদ্ধভাবে রাখার পর বিভিন্ন দলে ভাগ করে দেওয়া হয় তাদের। এরপর সুলতানের যেসব সভাসদ

Scanned with CamScanner

ও উজির নতুন এই সংস্কার কার্যক্রমে সমর্থন ও সহযোগিতা দিয়েছেন, তাঁদের নাম ঘোষণা করা হয়। প্রতিটি দলকে দায়িত্ব দেওয়া হয় এসব ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে আসার জন্য।

সশস্ত্র সৈন্যদের এমন সমাবেশ এবং দরবারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বাড়িতে তাদের হানা দেওয়ার খবরে ভয় ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। ইঙ্কেশারি বাহিনীর উন্মত্ত সদস্যরা দরবারের পদস্থ কর্মকর্তাদের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের হত্যা করতে থাকে। নিহত ব্যক্তিদের মৃতদেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে সেগুলো নিয়ে আতময়দানে সাজানো পাতিলগুলোতে রাখে সৈন্যরা।

ব্যক্তিগত চরিত্রে সুলতান তৃতীয় সেলিম ছিলেন নম্র ও ধৈর্যশীল। তিনি এমন আকস্মিক হত্যাযজ্ঞ ও অস্থিরতা থামাতে তখনই এক ফরমান জারি করেন। এতে তিনি তাঁর গৃহীত সব নতুন পদক্ষেপ বাতিল করে দেন। কিন্তু তাতেও আশ্বস্ত হয়নি উত্তেজিত সৈন্যরা। তারা সুলতানকে সিংহাসন থেকে সরে যেতে দাবি জানায়। নতুন শায়খুল ইসলাম আতাউল্লাহ আফেন্দি সুলতান তৃতীয় সেলিমকে অযোগ্য ঘোষণা করে ফতোয়া দেন। শায়খুল ইসলামের এ ফতোয়া সুলতান তৃতীয় সেলিমকে পড়ে শোনান তাঁর চাচাতো ভাই শাহজাদা মুস্তফা।

১৮০৭ সালের ২৯ মে সিংহাসন ছেড়ে দেন সুলতান তৃতীয় সেলিম। মোট ১৯ বছর ধরে তিনি উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতান হিসেবে সমাসীন ছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে উসমানি সাম্রাজ্যের নতুন সুলতান হন সুলতান চতুর্থ মুস্তফা।

সিংহাসন থেকে পদত্যাগের পর সুলতান তৃতীয় সেলিমকে বিশেষ কামরায় বন্দী করা হয়। কয়েক মাস পর নতুন সুলতানের নির্দেশে হত্যা করা হয় তাঁকে।

Scanned with CamScanner

সুলতান চতুর্থ মুস্তফা

জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় অভাব ছিল সুলতান চতুর্থ মুস্তফার। কিন্তু ক্ষমতার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন তিনি। আপন চাচাতো ভাই সুলতান তৃতীয় সেলিমের সঙ্গে তাঁর বিশ্বাসঘাতকতা নিকৃষ্ট পর্যায়ে নেমে এসেছিল। ১৮০৮ সালের ২৯ মে তিনি উসমানি সাম্রাজ্যের ২৯তম সুলতান হিসেবে সিংহাসনে সমাসীন হন।

ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি সর্বপ্রথম উত্তেজিত ইঙ্কেশারি সদস্যদের দাবি মেনে নেন। তাদের দাবি অনুযায়ী সাবেক সুলতান তৃতীয় সেলিমকে তাদের হাতে তুলে দিতে সম্মত হলেন। পাশাপাশি সুলতান চতুর্থ মুস্তফা ওয়াদা করেন, ইঙ্কেশারি বাহিনীতে তিনি কোনো সংস্কার করবেন না। কিন্তু এতেও শান্ত হলো না উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যরা। একের পর এক তাদের দাবির তালিকা দীর্ঘ হতে থাকে।

সুলতান চতুর্থ মুস্তফা বুঝতে পারেন, আরও অনেক দাবি মেনে নিলেও উত্তেজিত এই সৈন্যদের শান্ত করা প্রায় অসম্ভব। একপর্যায়ে তিনি এদের দমনে গোপনে সাবেক সুলতান তৃতীয় সেলিমের অনুগত সামরিক নেতা আলমদার মুস্তফার সহযোগিতা চাইলেন। সুলতান তাঁকে তাঁর অনুগত সৈন্যদের নিয়ে ইস্তাম্বুল অভিমুখে রওনা হওয়ার আদেশ পাঠান।

আলমদার মুস্তফা তাঁর সৈন্যদের নিয়ে ইস্তাম্বুলে আসার পথে ইঙ্কেশারি বাহিনীর বিশৃঙ্খল ও উত্তেজিত সৈন্যদের প্রধান নেতা কাবাকজি মুস্তফাকে হত্যা করেন। এ খবরে সুলতান আনন্দিত হলেন। তিনি নিজে আলমদার মুস্তফাকে রাজপ্রাসাদে স্বাগত জানান এবং ধন্যবাদ প্রকাশ করেন।

এ সময় সাবেক সুলতান তৃতীয় সেলিমের অন্য অনুগত নেতারা আলমদার মুস্তফাকে অনুরোধ করেছিলেন, তিনি যেন সুলতান চতুর্থ মুস্তফাকে আটক করেন। কিন্তু আলমদার এ অনুরোধ রাখেননি। ক্ষমতা গ্রহণের কিছুকাল পর ইঙ্কেশারি বাহিনীর অনুগত শায়খুল ইসলাম আতাউল্লাহ

Scanned with CamScanner

আফেন্দিকে বরখাস্ত করেন সুলতান মুস্তফা। এরপর তিনি আলমদারকে তাঁর সৈন্যসহ আগের জায়গায় ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

সুলতানের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করেন আলমদার মুস্তফা। নিজের সব পরিকল্পনা তিনি লুকিয়ে রেখেছিলেন কয়েক দিন। বরং তিনি তাঁর আচরণে সবাইকে বোঝাতে পেরেছিলেন, সুলতান তৃতীয় সেলিমের জন্য তাঁর আর কোনো চেষ্টার আগ্রহ নেই। বরং যা হওয়ার হয়েছে, এখন সুলতান চতুর্থ মুস্তফাকে তিনি মেনে নিয়েছেন। সে জন্যই তাঁর ডাকে তিনি ইস্তাম্বুল ছুটে এসেছেন।

২৮ জুন নিজ সৈন্যদের নিয়ে বাবআলি প্রাসাদে আকস্মিকভাবে আক্রমণ করেন আলমদার। সেখান থেকে ছদরে আজম মুস্তফা পাশাকে আটক করে তাঁর কাছ থেকে সুলতানি সিলমোহর কেড়ে নেন। এরপর রওনা হন সুলতান চতুর্থ মুস্তফার রাজপ্রাসাদের উদ্দেশে।

সেখানে পৌঁছে আলমদার মুস্তফা সুলতানের কাছে খবর পাঠালেন, এক্ষুনি সাবেক সুলতান তৃতীয় সেলিমকে মুক্ত করে তাঁদের কাছে নিয়ে আসতে হবে।

এমন পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ হন সুলতান চতুর্থ মুস্তফা। দেড় বছরেরও কম সময়ে তাঁর ক্ষমতার মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে ভেবে তিনি হিংস্র হয়ে ওঠেন। তাঁর প্রহরীদের আদেশ করলেন, বন্দী সাবেক সুলতান তৃতীয় সেলিমকে এখুনি গিয়ে হত্যা করে তাঁর লাশ প্রাসাদের জানালা দিয়ে আলমদার মুস্তফার সামনে ফেলে দাও। এতে ওদের দাবি বন্ধ হবে। একই সঙ্গে তিনি দ্বিতীয় মাহমুদকেও হত্যার আদেশ করেন, যাঁকে তাঁর পরবর্তী সুলতান হিসেবে ভাবা হচ্ছিল।

সুলতান চতুর্থ মুস্তফার নির্দেশ কার্যকর করা হলো। তবে বিশ্বস্ত সেবকদের সহযোগিতায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন দ্বিতীয় মাহমুদ। নির্মমভাবে হত্যা করা হলো সাবেক সুলতান তৃতীয় সেলিমকে। তাঁর লাশ দেখে ক্ষোভে ফুঁসে উঠলেন আলমদার ও তাঁর সৈন্যরা। তারা সুলতান চতুর্থ মুস্তফার পদত্যাগ দাবি করে তাঁকে আটকের জন্য উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। সুলতান চতুর্থ মুস্তফা অসহায় হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর একদল সৈন্যের হাতে পদচ্যুত হলেন সুলতান চতুর্থ মুস্তফা। তাঁকে ওই কামরায় বন্দী হিসেবে আটকে রাখার আদেশ করলেন আলমদার, যেখানে সাবেক সুলতানকে আটক করে রাখা হয়েছিল।

Scanned with CamScanner

সুলতান চতুর্থ মুস্তফাকে পদচ্যুতির খবরে রাস্তায় নেমে আসে ইঙ্কেশারি বাহিনীর সদস্যরা। তাদের হাতে নিহত হন আলমদার এবং তাঁর অন্য কয়েকজন সহযোগী। এ খবরে নতুন সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ তখনই আটক চতুর্থ মুস্তফাকে হত্যার আদেশ করেন। সুলতানের অনুগত প্রহরীরা তখনই নিভিয়ে দেয় চতুর্থ মুস্তফার জীবনপ্রদীপ। সিংহাসন থেকে পদচ্যুতির পর ৩ মাস ১৯ দিন বন্দী অবস্থায় বেঁচে ছিলেন সুলতান চতুর্থ মুস্তফা।

Scanned with CamScanner

আধুনিক সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ

কেউ বলেন, সুলতান সুলায়মানের পর সবচেয়ে শক্তিমান শাসক সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ। আবার কারও মতে, তিনি যা করেছেন, তা কেবলই সাম্রাজ্যের বাহ্যিক আবরণ বদলেছে, কিন্তু অভ্যন্তরীণ শক্তিকে আরও দুর্বল করেছে।

সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ উসমানি সাম্রাজ্যের সব সুলতানের মধ্যে বিশেষ কারণে ব্যতিক্রমী চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। উসমানি সাম্রাজ্যের পতনকালে তিনি চেয়েছিলেন ইউরোপের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যেতে। সে জন্য তিনি উসমানি সাম্রাজ্যের প্রশাসন ও অন্যান্য অঙ্গনে আধুনিক রীতিনীতি প্রবর্তন করেন। তাঁর পশ্চিমাপ্রীতি উসমানি সাম্রাজ্যের অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ছোঁয়া এনে দেয়।

তবে সমালোচকদের মতে, সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদের প্রয়াস ছিল কেবলই শাব্দিক ও বাহ্যিক পরিবর্তনে সীমাবদ্ধ। অভ্যন্তরীণ শুদ্ধি কার্যক্রম না হলে এসব বাহ্যিক সংস্কার গুণগত পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয়।

১৮০৮ সালের ১৮ জুলাই উসমানি সাম্রাজ্যের ৩০তম অধিপতি হিসেবে সমাসীন হন সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ। ৫৫ বছর বয়সে তিনি ১৮৩৯ সালের ২ জুলাই মৃত্যুবরণ করেন।

সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদের শাসনামল ছিল নানা ঘটনায় বৈচিত্র্যময়। সাবেক সুলতান তৃতীয় সেলিমের হত্যাকারীদের বিচার এবং সাম্রাজ্যের সব স্তরে প্রয়োজনীয় শুদ্ধি অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে তিনি সুলতান হিসেবে উসমানি সাম্রাজ্য শাসন শুরু করেন। তাঁর ছদরে আজমকে জানিয়ে দেন, ইঙ্কেশারি বাহিনীর বিশৃঙ্খলা ও ঔদ্ধত্য আর মেনে নেওয়া হবে না। এই বাহিনীর সব সদস্যকে আমাদের পূর্বসূরি সুলতান সুলায়মানের প্রবর্তিত রীতিনীতিতে ফিরে আসতে হবে, নয়তো এই বাহিনী বিলুপ্ত করে দেব।

সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ যখন উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতান হিসেবে সিংহাসনে বসেন, তখন চারপাশ থেকে এই সাম্রাজ্যের সীমানা সংকীর্ণ হতে

Scanned with CamScanner

হতে একটি রাজ্যে পরিণত হয়। সুলতান সংকল্প করেন, প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ সংস্কার শেষ হলে তিনি আবারও চারপাশ ঘিরে থাকা শত্রুদের শায়েস্তা করবেন। উসমানি সাম্রাজ্যের সীমানা আবারও সুদূরে বিস্তৃত করবেন। এ লক্ষ্যে তিনি নতুন একটি সশস্ত্র বাহিনী গঠনের আদেশ করেন।

সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ ও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ উজিরদের এমন সংস্কারমূলক কার্যক্রমে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ইঙ্কেশারি বাহিনীর সদস্যরা। ১৮০৮ সালের নভেম্বর মাসে একদল সৈন্য ছদরে আজম মুস্তফা পাশার বাড়ি ঘেরাও করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় ছদরে আজমের। সৈন্যদের হাতে গ্রেপ্তার ও অপমান এড়াতে তিনি নিজের পিস্তল দিয়ে প্রাসাদের অস্ত্রভান্ডারে বিস্ফোরণ ঘটান এবং মৃত্যুবরণ করেন। সাম্রাজ্যজুড়ে এমন জটিল পরিস্থিতি চলাকালে তৎকালীন শায়খুল ইসলাম সদ্য পদচ্যুত সুলতান চতুর্থ মুস্তফার পক্ষে ফতোয়া দেন। এতে আরও ঘোলাটে হয়ে ওঠে ইস্তাম্বুলের পরিবেশ।

চূড়ান্ত পর্যায়ের ঔদ্ধত্য দেখায় ইঙ্কেশারি বাহিনীর সদস্যরা। তারা স্বয়ং সুলতানের তোপকাপি প্রাসাদ ঘেরাও করে। এ সংবাদে সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদের গঠিত নতুন সশস্ত্র বাহিনীর চার হাজার সদস্য এবং নৌবহর এগিয়ে আসে রাজপ্রাসাদের নিরাপত্তায়। দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ ও লড়াইয়ে ইস্তাম্বুলজুড়ে ভীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। অবশেষে শহরের আলেম ও গুণী ব্যক্তিদের মধ্যস্থতায় ১৯ নভেম্বর এ সশস্ত্র সংঘাত থামে। সুলতান তাঁর কিছু সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন এবং নতুন বাহিনী গঠন স্থগিত করেন।

উসমানি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে চলমান এ দ্বন্দ্বের সুযোগ কাজে লাগাতে রাশিয়ার সৈন্যরা হামলে পড়ে রোমানিয়ার ওপর। কিন্তু উসমানি সৈন্যদের কাছে পরাজিত হয়ে তারা পিছু হটে। একই সময়ে ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ন সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদকে প্ররোচিত করছিলেন, তিনি যদি রাশিয়ায় আক্রমণ করেন, তবে ফ্রান্স তাকে পূর্ণ সহযোগিতা দেবে। নেপোলিয়নের এ প্রস্তাবে আস্থা রাখতে পারেননি সুলতান, ফলে তিনি এ অনুরোধ ফিরিয়ে দেন।

এরপর নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ১৮২৬ সালের জুন মাসে ইঙ্কেশারি বাহিনী বিলুপ্ত করেন সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ। এর মাধ্যমে সাড়ে চার শ বছরের বেশি সময় ধরে উসমানি সাম্রাজ্যের প্রধানতম অংশ এই বাহিনীর অধ্যায় সমাপ্ত হয়। শেষ হয় তাদের বিশৃঙ্খলা, ঔদ্ধত্য ও বিদ্রোহের সুদীর্ঘ রক্তাক্ত অধ্যায়।

উসমানি সাম্রাজ্যের চারপাশে এ সময় বিদেশি শক্তিগুলো জেগে ওঠে। এই সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে প্রতিটি শক্তি তাদের পছন্দের অঞ্চলগুলোতে

Scanned with CamScanner

আক্রমণ চালাতে থাকে এবং একের পর এক অঞ্চল দখল করে নেয়। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া এ সময় বিশ্বের একক পরাশক্তি হতে উঠেপড়ে লেগে যায়।

সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক স্তরে ব্যাপক পরিবর্তন করেন। মজলিসে আলা ও মজলিসে শুরা নামে তিনি দুই স্তরের পরিষদ তৈরি করেন। তিনি বিভিন্ন দপ্তরের পুরোনো নামগুলো পরিবর্তন করে ইউরোপীয় ধারায় নতুন করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় গঠন করেন। ছদরে আজমের পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী পদবির ব্যবহার শুরু হয় উসমানি দরবারে।

সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ তাঁর এসব সংস্কারমূলক কার্যক্রমে আদেশ করেন, সব সরকারি ও রাষ্ট্রীয় দপ্তরে তাঁর ছবি টানাতে হবে। সরকারি কর্মকর্তাদের পোশাক হিসেবে প্যান্ট, কোট ও ফেজটুপি নির্ধারণ করে দেন।

Scanned with CamScanner



হৃদয়বান সুলতান প্রথম আব্দুল মজিদ

সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদের জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসেবে উসমানি সাম্রাজ্যের ৩১তম সুলতান মনোনীত হন আব্দুল মজিদ। ১৮৩৯ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি উসমানি সাম্রাজ্যের নতুন অধিপতি হন। তিনি ছিলেন প্রতিভাবান ও মেধাবী সুলতান। মাতৃভাষা তুর্কির পাশাপাশি তিনি আরবি, ফারসি, ফরাসি ভাষা জানতেন। এর পাশাপাশি তিনি লিপিকার এবং পশ্চিমা সংগীতে দক্ষ ছিলেন।

এসবের পাশাপাশি তিনি সুফি তত্ত্বের অনুসারী ছিলেন। উসমানি সুলতানদের মধ্যে তিনিই প্রথম শাসক, যিনি ছয়টি সফরে পুরো উসমানি সাম্রাজ্য ভ্রমণ করেছেন। সুলতান প্রথম আব্দুল মজিদ সুদর্শন চেহারায় সুন্দর অবয়বের অধিকারী ছিলেন। তিনি হৃদয়বান ও দয়ালু ছিলেন। সুলতান হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি অন্য সুলতানদের মতো গুরুত্বপূর্ণ

Scanned with CamScanner

পদগুলোতে রদবদল করেননি। বরং যোগ্য ব্যক্তিদের স্ব স্ব অবস্থানে বহাল রেখেছিলেন।

সুলতান প্রথম আব্দুল মজিদ চাইতেন, সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক পদগুলোতে বেসামরিক যোগ্য ব্যক্তিরা যেন নিয়োগ ও কাজের সুযোগ পান। দরবার ও দিওয়ান পরিচালনাসহ অন্যান্য ব্যাপারে সেনাবাহিনীর প্রভাব তিনি কমিয়ে এনেছিলেন। পিতার মতো তিনিও বেশ কিছু বিষয়ে ইউরোপের অনুসরণ করেন। তাঁর উপদেষ্টা ও সভাসদদের মধ্যে ইউরোপীয় আদর্শে প্রভাবিত ব্যক্তিদের পরামর্শে তিনি কখনো কখনো সীমা লঙ্ঘনও করেছেন।

স্ত্রী ও পরিবারের প্রতি সুলতান প্রথম আব্দুল মজিদের আকর্ষণ ছিল বেশি। তাঁর ৩৭ জন স্ত্রী ও দাসীর নাম পাওয়া যায়। ২২ জন সন্তানসন্ততির জনক ছিলেন এই সুলতান।

প্রায় সাড়ে ২২ বছর উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সুলতান প্রথম আব্দুল মজিদ। ১৮৬১ সালের ৬ জুন ৪০ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জন্ম ১৮২২ সালের ৬ মে।

আয়ারল্যান্ডবাসীর কাছে অমর সুলতান

১৮৪৫ সাল। এক মহাদুর্ভিক্ষের কবলে আয়ারল্যান্ড। এর আগে কয়েক বছর ধরে আয়ারল্যান্ড দ্বীপের কোথাও আলুর ভালো ফলন হয়নি। খেতে-খামারে অজানা রোগ ছড়িয়ে পড়ায় অধিকাংশ আলু নষ্ট হয়ে যায়। অথচ সেখানকার গরিব মানুষের প্রধান খাদ্য এই আলু।

দুর্ভিক্ষের শিকার ২০ লাখের বেশি মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় দেশ ছেড়ে চলে গেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশে। খাদ্যাভাবে ক্ষুধার কষ্টে মারা গেছে আরও প্রায় ১০ লাখ মানুষ। জনসংখ্যা থেকে খালি হয়ে যাচ্ছে আয়ারল্যান্ড। উত্তর আয়ারল্যান্ডে উর্বর ভূমিতে যেসব খাবার চাষ হচ্ছিল, সেসব ভোগ করছে ব্রিটিশ ইংরেজরা। আয়ারল্যান্ড তখন ব্রিটেনের উপনিবেশ। ব্রিটেনের রানি ভিক্টোরিয়ার শাসনে আয়ারল্যান্ডসহ অন্যান্য অঞ্চল। আয়ারল্যান্ডের সাহায্যার্থে রানি ভিক্টোরিয়া পাঠিয়েছেন এক হাজার পাউন্ড।

উসমানি সাম্রাজ্যের তৎকালীন তরুণ সুলতান প্রথম আব্দুল মজিদ জানতে পারেন এই দুর্ভিক্ষের সংবাদ। অভাবে মারা যাচ্ছে মানুষ, এ খবরে কেঁদে ওঠে তাঁর মমতাময় হৃদয়। ধর্ম ও জাতীয়তার সব বিভেদ ভুলে চার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত আয়ারল্যান্ডের ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন তিনি।

Scanned with CamScanner

সুলতান প্রথম আব্দুল মজিদ ঘোষণা করলেন, আয়ারল্যান্ডের অভাবী কৃষকদের জন্য তিনি ১০ হাজার ইস্টারলিং (রুপার পাউন্ড) দান করবেন, বর্তমান সময়ে যা আট লাখ পাউন্ডের সমান। সুলতানের ঘোষণায় হইচই পড়ে যায় ব্রিটিশ রাজপরিবারে। আয়ারল্যান্ডের জন্য রানি দিয়েছেন দুই হাজার পাউন্ড, কিন্তু দূরের একজন মুসলিম সুলতান দেবেন ১০ হাজার পাউন্ড! এটা রানির জন্য অপমানজনক ব্যাপার।

আয়ারল্যান্ডের অধিবাসীরা ছিল ক্যাথলিক খ্রিষ্টান। আর ব্রিটিশরা ছিল প্রটেস্ট্যান্ট। ফলে খ্রিষ্টান ধর্মের এ দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে সদ্ভাবের অভাব ছিল। ব্রিটিশ শাসকেরা নানাভাবে আয়ারল্যান্ডের অধিবাসীদের দমিয়ে রাখত।

ইস্তাম্বুলে নিযুক্ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত হেনরি ছুটে এলেন সুলতানের কাছে। তিনি তাঁকে বোঝান, মহারানি যে পরিমাণ অর্থ দিয়েছেন, এর চেয়ে বেশি দেওয়া মানে তাঁকে ছোট করা। কাজেই আপনি মহারানির দানের অর্ধেক দান করুন। সুলতান প্রথম আব্দুল মজিদ তাঁর অনুরোধে সম্মত হলেন। তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে নগদ এক হাজার পাউন্ড অর্থ সহায়তা পাঠাতে আদেশ দিলেন।

সুলতান সিদ্ধান্ত নিলেন, তাঁর প্রতিশ্রুত ১০ হাজার পাউন্ডের বাকি অর্থের বিনিময়ে তিনি গম পাঠাবেন আয়ারল্যান্ডের অভাবী কৃষকদের জন্য। সুলতানের ইচ্ছাপূরণে উসমানি সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে খাদ্যপণ্যভর্তি তিনটি জাহাজ গোপনে রওনা হয় আয়ারল্যান্ডের উদ্দেশে।

কিন্তু এ নৌবহরের খবর জেনে যায় ব্রিটিশ নৌবাহিনী। উসমানি সাম্রাজ্যের একজন মুসলিম সুলতানের সাহায্য যেন কোনোভাবেই আয়ারল্যান্ডে পৌঁছাতে না পারে, সে জন্য তারা রাজধানী ডাবলিন এবং অন্য আরেকটি শহর বেলফাস্ট বন্দরে পৌঁছার পথে উসমানি ত্রাণবহরকে বাধা দেয়। ব্রিটিশ নৌবাহিনীর বাধায় ফেরার পথে কৌশলে আয়ারল্যান্ডের আরেকটি শহর ড্রগেডার বন্দরে নোঙর ফেলে উসমানি ত্রাণবাহী জাহাজ। তারপর দ্রুততম সময়ে শহরবাসীর মধ্যে বিতরণ করা হয় সুলতানের পাঠানো ত্রাণসামগ্রী। ড্রগেডা শহরটি রাজধানী ডাবলিন থেকে ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত।

আয়ারল্যান্ডের ড্রগেডা শহরের সব শ্রেণি ও পেশার মানুষ একজন মুসলিম সুলতানের এমন মানবিক উদারতায় অভিভূত হয়ে পড়ে। ভিন্ন ধর্মের এবং দূরদেশের একজন হৃদয়বান সুলতান তাদের জন্য অর্থ ও খাদ্য সহায়তা পাঠিয়েছেন, এ নিয়ে তাদের মধ্যে দীর্ঘদিন আলোচনা চলে।

Scanned with CamScanner

ড্রগেডা শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং বিশিষ্টজনেরা উসমানি সুলতান প্রথম আব্দুল মজিদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে একটি ধন্যবাদপত্র পাঠান। উসমানি আর্কাইভে আজও সেই পত্র সংরক্ষিত রয়েছে। তাতে লেখা আছে,

'We the noblemen, gentlemen and inhabitants of Ireland want to express our thank and gratitude for the Ottoman Sultan's munificent assistance due to the disaster of dearth. It is unavoidable for us to appeal the assistance of other countries in order to be saved from the enduring threat of death and famine. The Ottoman Sultan's munificent response to this aid call displays an example to European States. Numbers were relieved and saved from perishing through this timely act. We express our gratitude on their behalf and hope that the Ottoman Sultan and his dominions will be saved from the afflictions which have befallen us.'

সেদিন ড্রগেডা শহরে অভাবীদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ শেষে উসমানি নাবিক ও ত্রাণকর্মীরা যে রুমে বিশ্রাম নিয়েছিলেন, সেই রুমটি আজও আয়ারল্যান্ডবাসীর কাছে স্মরণীয়। ওয়েস্টকোর্ট হোটেলের পাশে অবস্থিত ওই রুমের ওপর একটি ফলক রয়েছে। তাতে লেখা আছে,

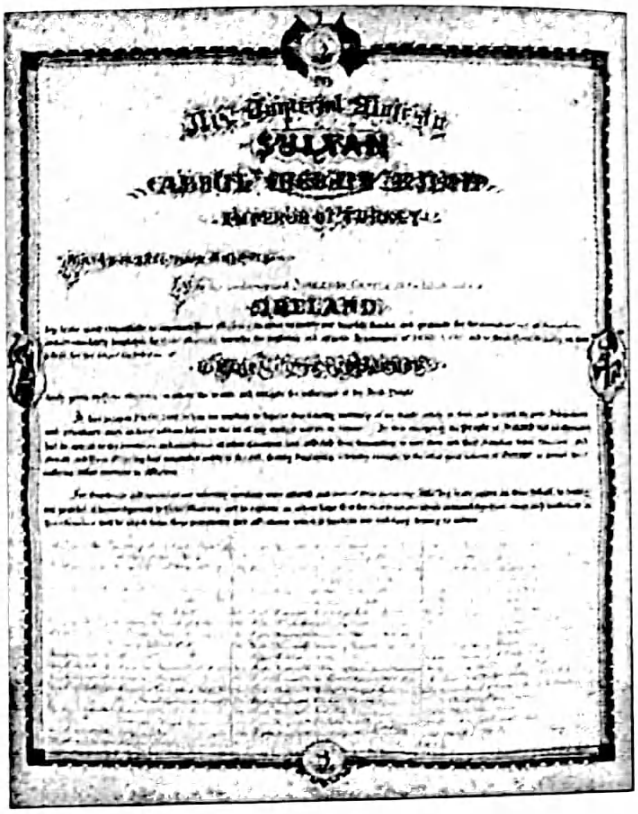
The Great Irish Famine of 1847—In remembrance and recognition of the generosity of the People of Turkey towards the People of Ireland.



এই ঘটনার পর পেরিয়ে গেছে দেড় শ বছরের বেশি সময়। কিন্তু সুদূর ড্রগেডা শহরের ফুটবল দলের লোগোতে উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতীক চাঁদ-তারা আজ অবধি উসমানি সাম্রাজ্যের হৃদয়বান সুলতান আব্দুল মজিদের প্রতি শহরবাসীর কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হয়ে আছে।

Scanned with CamScanner

১৯৯৫ সালে ড্রগেডা শহরের মেয়র উসমানি সুলতান আব্দুল মজিদের একটি স্মৃতিফলক উন্মোচন করেন। এর মাধ্যমে আগামী প্রজন্মের কাছে এই সুলতানের অমূল্য সহযোগিতার নিদর্শন ধরে রাখতে চান তিনি।



২০১০ সালে তুরস্ক সফরে আসেন আয়ারল্যান্ডের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ম্যারি ম্যাকলিস। সে সময় তিনি উসমানি সুলতান প্রথম আব্দুল মজিদকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন। তুরস্কের রাষ্ট্রপতিকে তিনি তখন বলেছিলেন, ফেরেশতাতুল্য এই মহান সুলতানকে আমরা ভুলিনি। তাঁর সাহায্য না পেলে আজ আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত থাকতে পারতাম না। আমরা আইরিশরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

২০১৫ সালের মে মাসে ড্রগেডা শহরে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে নগর কর্তৃপক্ষ উসমানি সাম্রাজ্য এবং বর্তমান তুরস্কের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। গত দেড় শ বছরের বেশি সময় ধরে প্রতিবছর ওই বন্দরে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যেখানে উসমানি সুলতানের পাঠানো ত্রাণবাহী জাহাজ থেমেছিল।

Scanned with CamScanner

সুলতান আব্দুল আজিজ

সুলতান প্রথম আব্দুল মজিদের মৃত্যুর পর উসমানি সাম্রাজ্যের ৩২তম নতুন অধিপতি হন তাঁর ভাই সুলতান আব্দুল আজিজ। ১৮৩০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬১ সালের ৭ জুন তিনি সুলতান হিসেবে সমাসীন হন।

সুলতান আব্দুল আজিজ ক্ষমতা গ্রহণের পর দেখতে পান, পুরো উসমানি সাম্রাজ্য ঋণের ভারে জর্জরিত। সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ ও পরবর্তী সুলতানরা বিভিন্ন দেশের কাছ থেকে যেসব ঋণ নিয়েছিলেন, সেগুলো শোধ করতে হিমশিম খাচ্ছিল উসমানি দরবার। সুলতান আব্দুল আজিজ সাধ্যমতো চেষ্টা করছিলেন, কীভাবে এসব বিদেশি ঋণ শোধ করে সাম্রাজ্যের ভেতর অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা যায়।

সুলতান আব্দুল আজিজ উসমানি সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিয়ে মিসর সফর করেন। এটি ছিল সে সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এরপর ১৮৬৭ সালের ২২ জুন তিনি ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের আমন্ত্রণে প্যারিস সফরে যান। প্রথম উসমানি সুলতান হিসেবে সুলতান আব্দুল আজিজ ৪৬ দিনব্যাপী ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সফর করেন।

সুলতান আব্দুল আজিজের চারপাশ ঘিরে যে সভাসদ ছিল, তাদের অধিকাংশই তখন নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার ও আখের গোছাতে ব্যস্ত। উসমানি সাম্রাজ্যকে ঋণের বোঝা থেকে উদ্ধার করতে তাঁর পাশে কোনো যোগ্য সহকারী ছিলেন না। বরং ছদরে আজম মাহমুদ নাদিম পাশার অযোগ্যতা ও অদূরদর্শিতায় উসমানি সাম্রাজ্যের পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছিল। পাশাপাশি আইনমন্ত্রী মাদহাত পাশা ও তাঁর সহযোগীদের চক্রান্তে মিসর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের বিদেশি ঋণ নেয়। এর ফলে উসমানি সাম্রাজ্যের বিদেশি ঋণের পরিমাণ দুই শ মিলিয়ন লিরা (স্বর্ণমুদ্রা) ছাড়িয়ে যায়।

এসব বহুমুখী চক্রান্তের কাছে অসহায় হয়ে পড়েন সুলতান আব্দুল আজিজ। অবস্থা বেগতিক দেখে মাদহাত পাশা এবং তাঁর সুযোগসন্ধানী

Scanned with CamScanner

সঙ্গীরা সুলতানের পক্ষ ত্যাগ করে। তারা সুলতানকে অভিযুক্ত করে তাঁকে পদচ্যুতির জন্য পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে। গোপনে অর্থ ছড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করা হয়, তারা যেন সুলতান আব্দুল আজিজের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দেয়।

এসব সুযোগসন্ধানী চক্রে যোগ দেন স্বয়ং শায়খুল ইসলাম খায়রুল্লাহ আফেন্দি। উসমানি সাম্রাজ্যের দুরবস্থার জন্য সুলতান আব্দুল আজিজকে অভিযুক্ত করে তাঁর বিরুদ্ধে মস্তিষ্ক বিকৃতির অভিযোগ তোলা হয়। এর ভিত্তিতে শায়খুল ইসলাম সুলতানকে পদচ্যুত করার জন্য ফতোয়া দেন।

১৮৭৬ সালের ৩০ মে স্থল ও নৌপথে সুলতানের রাজপ্রাসাদ দোলমাবাখশা ঘেরাও করা হয়। এ সময় প্রাসাদের কর্মকর্তা রাদিফ পাশাকে ডেকে তাঁর হাতে শায়খুল ইসলামের ফতোয়ার একটি কপি দেওয়া হয়, যেন তিনি এক্ষুনি এটি সুলতান আব্দুল আজিজকে দিয়ে আসেন। রাদিফ পাশা এটি নিয়ে ছুটে যান অন্তঃপুরের প্রধান প্রহরী জওহর আগার কাছে।

সুলতান আব্দুল আজিজ এই ফতোয়ার কপি হাতে পেয়ে প্রথমে বিশ্বাস করতে চাননি। এরপর যখন তিনি প্রাসাদের জানালা দিয়ে নিচে তাকালেন, তখন এর চারপাশ ঘিরে রেখেছে শত শত সৈন্য। সুলতান বুঝতে পারলেন, এই মুহূর্তে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই তাঁর।

কিছুক্ষণ পর পদচ্যুত সুলতান তাঁর পুত্র ইজ্জুদ্দীনকে নিয়ে নিচে নেমে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ঘেরাও করে একদল সৈন্য। এ সময় সুলতানের পরিবারের সব সদস্যকে কড়া পাহারায় তোপকাপি প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তাঁদের বন্দী রাখা হয়। এরপর রাজপ্রাসাদের বিভিন্ন কামরায় লুটপাট শুরু করে একদল দুর্বৃত্ত সৈন্য।

পদচ্যুতির পাঁচ দিন পর ৪ জুন সুলতানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এ হত্যাকাণ্ড নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, সুলতান আব্দুল আজিজ আত্মহত্যা করেছেন, কারণ সাম্প্রতিক সময়ে তাঁর মস্তিষ্কে বিভ্রাট ঘটেছিল।

সুলতান আব্দুল আজিজের নবিভক্তি

অসুখে আক্রান্ত সুলতান আব্দুল আজিজ। দরবারের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তাঁর সামনে পেশ করছেন না সভাসদেরা। সুলতানের সেবক ও ব্যক্তিগত উপদেষ্টারা অপেক্ষা করছেন, সুলতান সুস্থ হলে আবারও তাঁর কাছে রাষ্ট্রীয়

Scanned with CamScanner

কাগজপত্র পাঠানো হবে। এর আগ পর্যন্ত আপাতত সেসব স্থগিত রাখা হয়েছে। বিশেষ প্রয়োজনে সুলতানের অনুমতি সাপেক্ষে তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ দাপ্তরিক দলিলপত্র পাঠানো হয়।

পবিত্র মদিনা নগরী থেকে পত্র এসেছে সুলতানের নামে। এ নিয়ে উৎকণ্ঠা বোধ করছেন সুলতানের সভাসদেরা। সুলতান অসুস্থ ও শয্যাশায়ী, কোনো রাষ্ট্রীয় পত্র শোনার মতো মানসিক অবস্থায় তিনি নেই এখন। এদিকে এই পত্র মদিনা নগরী থেকে পাঠানো। মক্কা ও মদিনার প্রতি সুলতানের বিশেষ দুর্বলতার কথা দরবারের সবাই জানেন। সুলতান যদি জানতে পারেন, মদিনা থেকে চিঠি আসার পর যথাসময়ে তাঁকে অবহিত করা হয়নি, তবে তিনি নিশ্চয়ই ক্ষুব্ধ হবেন।

এসব ভেবেচিন্তে মদিনা থেকে আসা চিঠি গুরুত্বপূর্ণ ভেবে একজন উজির সুলতানের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন। অনুমতি পেয়ে তিনি সুলতানের খাসকামরায় হাজির হলেন। সবিনয়ে উজির জানালেন, 'মহামান্য জাহাঁপনা! পবিত্র নগরী মদিনা থেকে আপনার কাছে একটি চিঠি এসেছে।'

মদিনার নাম শুনেই সুলতান চোখ মেলে তাকালেন। অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, 'আমি না বলা পর্যন্ত পত্রপাঠ শুরু করবে না।'

আদেশের অপেক্ষায় নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকলেন উজির। সুলতান সেবকদের বললেন, 'আমাকে শোয়া থেকে ওঠাও। পবিত্র শহর মদিনা থেকে পাঠানো চিঠি শুয়ে শুয়ে শোনা বেয়াদবির নামান্তর।' কাঁপা কাঁপা শরীরে খাদেমদের কাঁধে ভর করে উঠে বসলেন সুলতান আব্দুল আজিজ। তারপর উজিরকে বললেন, 'পত্র পাঠ শুরু করো।'

অসুস্থ অবস্থায় তো বটেই, সাধারণ সময়েও মক্কা বা মদিনা থেকে কোনো চিঠি বা কাগজপত্র উসমানি সুলতানের দরবারে এলে সেগুলো পড়া বা দেখার আগে সুলতান আব্দুল আজিজের বিনম্র আচরণ ছিল সবার জন্য শিক্ষণীয়। পবিত্র মদিনা থেকে আসা কোনো কাগজ হাতে নেওয়ার আগে সুলতান অজু করে আসতেন। এরপর নিজের হাতে ওই পত্র নিয়ে তাতে চুমু দিতেন এবং গভীর শ্রদ্ধায় কপালে ছোঁয়াতেন। নাকে শুঁকতেন সেই কাগজে মিশে থাকা মদিনার সুঘ্রাণ।

তারপর সেটি খুলে পড়তেন। তিনি বলতেন, 'এটি এমন চিঠি, যেখানে নবিজির শহরের পবিত্র ধুলোবালি মিশে আছে।'

Scanned with CamScanner

অসুস্থ সুলতান পঞ্চম মুরাদ

সুলতান আব্দুল আজিজের পর উসমানি সাম্রাজ্যের ৩৩তম সুলতান হিসেবে সমাসীন হন সুলতান পঞ্চম মুরাদ। তিনি সুলতান আব্দুল মজিদের পুত্র। ১৮৭৬ সালের ৩১ মে তিনি সুলতান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

তবে কিছুদিন পরই তাঁর স্মৃতিশক্তিতে দুর্বলতা দেখা দেয়। ধীরে ধীরে তা বাড়তে থাকে এবং একপর্যায়ে তা মস্তিষ্ক বিভ্রাটে রূপ নেয়। এ সময় তিনি তাঁর উজিরদেরও চিনতে পারতেন না। তাঁর ছদরে আজম সুলতানের এ অসুস্থতার খবর গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রথা অনুযায়ী সুলতান হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি জামে আবু আইয়ুবে গিয়ে উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার ব্যবহৃত তলোয়ার গ্রহণ না করায় সাধারণ মানুষের মধ্যে সন্দেহ ছড়িয়ে পড়ে।

উসমানি দরবারের পক্ষ থেকে সুলতানের চিকিৎসার জন্য অস্ট্রিয়ার বিখ্যাত চিকিৎসক লেডজর্ফকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। সুলতানের কথাবার্তা ও আচার-আচরণ কয়েক দিন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের পর চিকিৎসক জানান, এ রোগ আরোগ্যের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। ফলে মাত্র তিন মাস তিন দিন পর ছদরে আজম ও অন্য উজিররা পরামর্শ করে তাঁর ভাই আব্দুল হামিদকে সুলতান হিসেবে মনোনীত করার সিদ্ধান্ত নেন।

১৮৭৬ সালের ৩১ আগস্ট এ ব্যাপারে ফতোয়া দেন শায়খুল ইসলাম খায়রুল্লাহ আফেন্দি। সেদিনই তাঁকে পদচ্যুত ঘোষণা করা হয় এবং এরপর তাঁকে অন্য একটি প্রাসাদে স্থানান্তর করা হয়। ১৯০৮ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সেখানেই বন্দী অবস্থায় ছিলেন।

Scanned with CamScanner



দুর্ভাগা সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ

১৮৭৬ সালের ৭ সেপ্টেম্বর উসমানি সাম্রাজ্যের সর্বশেষ কার্যকর সুলতান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ। তাঁর ক্ষমতা গ্রহণ উপলক্ষে তিন দিন ধরে পুরো ইস্তাম্বুল নগরী সাজানো হয় এবং প্রতিদিন পাঁচবার তোপধ্বনি দেওয়া হয়।

সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে উসমানি সাম্রাজ্য শাসন করেন। তাঁর শাসনামলে সাংবিধানিক শাসনব্যবস্থা শুরু হয়। তিনি উসমানি সাম্রাজ্যের সর্বশেষ শাসক, যিনি সুলতান উপাধিতে কার্যকরভাবে সাম্রাজ্য শাসন করেছেন।

১৯০৯ সালের ২৭ এপ্রিল মঙ্গলবার সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদকে পদচ্যুত করে তুরস্কের জাতীয় পরিষদ। এ পদচ্যুতির বৈধতা দিয়ে ফতোয়া দেন শায়খুল ইসলাম মুহাম্মদ জিয়াউদ্দীন।

Scanned with CamScanner

দুঃখী সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ

উসমানি সাম্রাজ্যের যখন ক্রান্তিকাল চলছে, সেই দুঃসময়ের শাসকদের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত চরিত্র সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ। তাঁর মাধ্যমেই মূলত সমাপ্তি ঘটে ৬২৪ বছরব্যাপী এই সাম্রাজ্যের। সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের পর আরও দুজন শাসক কিছুকাল দায়িত্ব পালন করেন, তবে তাঁরা সুলতান উপাধি ব্যবহার করেননি। এ দুজনের ক্ষমতা গ্রহণ ছিল কেবলই আনুষ্ঠানিকতা।

প্রকৃত অর্থে তত দিনে উসমানি সাম্রাজ্যের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল তুরস্ক অনেক বদলে গেছে। ইসলামি সাম্রাজ্যের পরিচয় ত্যাগ করে গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করেছে দেশটি। উসমানি সাম্রাজ্যের অধীনে থাকা সব দেশ ও অঞ্চল তত দিনে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত।

উসমানি সাম্রাজ্যের পতন ও সমাপ্তির করুণ বাস্তবতায় সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। তাঁকে নিয়ে যেমন বন্দনা ও আলোচনা আছে, তেমনি আছে নিন্দা ও সমালোচনাও। বিশেষ করে, ফিলিস্তিন ভূমি সংরক্ষণে তাঁর সাহসী ভূমিকা তাঁকে আজও অমর করে রেখেছে মুসলিম ঐতিহাসিকদের কাছে।



Scanned with CamScanner

সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ ছিলেন নেতাসুলভ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। ছিলেন ধৈর্যবান ও ধীরস্থির প্রকৃতির একজন শাসক। দুঃখজনক হলেও সত্য, তিনি তাঁর আশপাশে কোনো যোগ্য ব্যক্তি পাননি। বরং একদল গাদ্দার ও বিশ্বাসঘাতক এবং অর্থলোভী নেতা উসমানি সাম্রাজ্যকে বিক্রি করে দিচ্ছিলেন বিদেশি শক্তির হাতে।

১৮৪২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ। তাঁর পিতা সুলতান আব্দুল মজিদ উসমানি সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন ১৮৩৯ থেকে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত। ১৮৭২ সালের ৩১ আগস্ট সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের বড় ভাই সুলতান পঞ্চম মুরাদকে সরিয়ে দেওয়া হয় উসমানি সাম্রাজ্যের সিংহাসন থেকে। এরপর এই দায়িত্বভার অর্পণ করা হয় সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের কাঁধে, ফলে তিনিই হন এই সাম্রাজ্যের নতুন এবং সর্বশেষ আনুষ্ঠানিক কর্ণধার।

সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ যখন উসমানি সাম্রাজ্যের হাল ধরেন, তখন এর চারপাশে ষড়যন্ত্রকারীদের ভিড় প্রতিনিয়ত বাড়ছে। ভেতরে ও বাইরে চলছে বহুমুখী চক্রান্ত। এমন পরিস্থিতিতেও সুলতান অবিচল ও অটল থাকতে চেষ্টা করছিলেন। পুরো সাম্রাজ্যকে আগের সোনালি যুগে ফিরিয়ে নিতে তাঁর আন্তরিকতার কমতি ছিল না। কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করছিল। উসমানি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ঋণের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছিল। দেশের ভেতর অভাব এবং বাজারে জিনিসপত্রের চড়া মূল্য সাধারণ মানুষের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। ইউরোপীয় রাজনীতি ও সংস্কৃতির প্রভাবে তুরস্কের ভেতর কিছু গোষ্ঠী উসমানি সুলতানদের ধারাবাহিকতার সমাপ্তি দাবি জানিয়ে সাংবিধানিক শাসনব্যবস্থার দাবি তুলতে শুরু করে। পাশাপাশি ব্রিটেন ও বিশ্বময় ইহুদি লবি এ সময় উসমানিদের পতন ত্বরান্বিত করতে চূড়ান্তভাবে ষড়যন্ত্রে অংশ নেয়।

শৈশবে মাকে হারান সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ। ফলে যোগ্য অভিভাবক না থাকায় খুব বেশি পড়ালেখার সুযোগ হয়নি তাঁর। তবে তিনি ছিলেন প্রতিভাবান এবং স্বভাবজাত ধীশক্তি ও সূক্ষ্ম চিন্তার অধিকারী। নিজের ইচ্ছা ও পরিকল্পনার কৌশল গোপন রাখতে জানতেন তিনি। তাঁর চারপাশের কাউকে তিনি একবিন্দু বিশ্বাস করতেন না। সাম্রাজ্য পরিচালনায় দরবার কিংবা অন্তঃপুরের কারও প্রতি আস্থা ছিল না তাঁর।

সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ শৈশব ও কৈশোর থেকে উসমানি দরবারের আমির এবং উজিরদের দ্বিমুখী আচরণ ও বিশ্বাসঘাতকতা দেখে

Scanned with CamScanner

দেখে বড় হয়েছেন। সুলতানের সামনে তোষামোদকারীদের মুখোশ ও বাস্তব চেহারা খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে তাঁর। তিনি মনে করতেন, একান্ত ঘনিষ্ঠ সেবকও সামান্য দুই কড়ি অর্থের বিনিময়ে মুহূর্তে অন্যের কাছে বিক্রি হয়ে যেতে পারে, এ জন্য সে একটুও লজ্জিত হবে না।

দীর্ঘ ৩৩ বছর ধরে উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ। ১৯০৯ সালের ২৭ এপ্রিল মঙ্গলবার তাঁকে পদচ্যুত করা হয়। এরপর প্রথমে তাঁকে নির্বাসনে পাঠানো হয় সালানিতে। পরে তাঁকে ফিরিয়ে এনে বন্দী করা হয় ইস্তাম্বুলের একটি বিশেষ ভবনে। ১৯১৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে দিয়ে জাতীয় পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁর ভাই রাশাদুদ্দীনকে ৩৫তম শাসক হিসেবে মনোনীত করা হয়।

চারপাশের চরম বৈরী পরিবেশে নামমাত্র সাংবিধানিক খলিফা হিসেবে পদবি গ্রহণ করেন রাশাদুদ্দীন পঞ্চম মুহাম্মদ। তাঁর জন্ম ১৮৪৪ সালে। জীবনের বেশির ভাগ সময় তিনি পার করেছেন গোয়েন্দা ও নিরাপত্তারক্ষীদের পাহারায়। তত দিনে সুলতান উপাধি চিরতরে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। উসমানি পরিবারের হাত থেকে সব ধরনের রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

Scanned with CamScanner



সুলতান পঞ্চম মুহাম্মদ রাশাদ

উসমানি সাম্রাজ্যের ৩৫তম শাসক সুলতান পঞ্চম মুহাম্মদ রাশাদুদ্দীন। ১৯০৯ সালে সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদকে পদচ্যুতির পর ৭০ বছর বয়সে তিনি সুলতান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৮৪৪ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জীবনের বেশির ভাগ সময় কেটেছে প্রাসাদের বন্দিখানায়। সার্বক্ষণিক গোয়েন্দা নজরদারি ও সতর্ক প্রহরায়।

সুলতান পঞ্চম মুহাম্মদ রাশাদ যখন সিংহাসনে সমাসীন হন, তখন সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক সব ক্ষমতা চলে যায় একতা ও উন্নয়ন দলের হাতে। ফলে তিনি কেবল প্রতীকী সুলতান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। একে একে তিনি নব্য রাজনৈতিক দল একতা ও উন্নয়ন দলের নেতাদের সব দাবিতে সম্মতি প্রকাশ করেন। উসমানি সাম্রাজ্যের পতন তখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

রাশিয়া এবং অন্য ইউরোপীয় শক্তিগুলো এ সময় তুরস্কের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলোকে অস্ত্র সরবরাহ করতে শুরু করে। ফলে স্বাধীনতার দাবিতে উসমানি সাম্রাজ্যের চারপাশে গোলযোগ শুরু হয়। এ সময়

Scanned with CamScanner

উসমানি সেনাবাহিনীতে কর্মরত একদল বিশ্বাসঘাতক সামরিক নেতার চক্রান্তে একের পর এক অঞ্চল হারাতে থাকে উসমানি বাহিনী।

১৯৭৮ সালের ৩ জুলাই ৭৪ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

Scanned with CamScanner



সুলতান ষষ্ঠ মুহাম্মদ ওয়াহিদুদ্দীন

এরপর উসমানি সাম্রাজ্যের শাসক হিসেবে প্রতীকী অর্থে সুলতান পদ গ্রহণ করেন সুলতান ষষ্ঠ মুহাম্মদ ওয়াহিদুদ্দীন। ১৮৬১ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন সুলতান আব্দুল মজিদ। সুলতান আব্দুল আজিজের ছেলে ইউসুফ ইজ্জুদ্দীন নিহত হওয়ার পর তিনি উসমানি সাম্রাজ্যের পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত হন। ১৯১৮ সালের ৪ জুলাই তিনি উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতান হিসেবে সমাসীন হন।

ব্যক্তি হিসেবে তিনি ইসলামি জ্ঞানে পণ্ডিত ছিলেন এবং সামরিক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ দক্ষ নেতা ছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি সংগীতপ্রেমিক ছিলেন। নিজে সুর করতে পছন্দ করতেন।

উসমানি সাম্রাজ্যের ঘাতক মুস্তফা কামাল আতাতুর্কের সঙ্গে তাঁর সখ্য ছিল। সুলতান ওয়াহিদুদ্দীন যখন জার্মানি ও অস্ট্রিয়া সফরে যান, তখন তাঁর সঙ্গী হিসেবে ছিলেন মুস্তফা কামাল।

মুস্তফা কামালের প্রতি সুলতানের অতি আস্থা ও অন্ধবিশ্বাস উসমানি সাম্রাজ্যের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনে। মুস্তফা কামাল গোপনে ইংরেজদের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। পর্দার আড়ালে তখন উসমানি সাম্রাজ্য মুছে ফেলার সব

Scanned with CamScanner

পরিকল্পনা চূড়ান্ত। সুলতান বিদেশি শক্তিগুলোর পরামর্শে মুস্তফা কামাল পাশাকে অতিরিক্ত সামরিক প্রভাব ও ক্ষমতা দেন। ১৯১৯ সালের ১৫ মে মুস্তফা কামাল পাশাকে ডেকে তিনি বলেছিলেন, 'তুমি এ পর্যন্ত এই সাম্রাজ্যের জন্য অনেক কিছু করেছ। এখন তুমি যে দায়িত্ব পাচ্ছ, তা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পাশা, তুমিই পারো এই দেশ ও সাম্রাজ্যকে বাঁচাতে।'

তাঁর সিদ্ধান্তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ উসমানিদের জন্য বড় বিপর্যয় ডেকে আনে। ব্রিটেন ও মিত্রবাহিনী এ যুদ্ধে বাগদাদ, দামেস্ক ও ফিলিস্তিন দখল করে। উসমানি সাম্রাজ্যের অনেক অঞ্চল ইউরোপীয় মিত্রবাহিনী নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। ১৯২০ সালের এপ্রিল মাসে সান রেমো সম্মেলনে ফ্রান্স সিরিয়ার এবং যুক্তরাজ্য ফিলিস্তিন ও মেসোপটেমিয়ার শাসনক্ষমতা নিয়ে নেয়। ১৯২০ সালের ১০ আগস্ট সুলতানের প্রতিনিধিরা সেভ্র চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তিতে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের দখল স্বীকার করা হয়। পাশাপাশি হেজাজকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

তুর্কি জাতীয়তাবাদীরা এই চুক্তির বিরোধিতা করে। ১৯২০ সালের ২৩ এপ্রিল তারা সুলতানের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। এ সময় মুস্তফা কামাল পাশার নেতৃত্বে আঙ্কারা শহরে নতুন সরকার গঠিত হয়। এই নতুন সরকার সুলতান ষষ্ঠ মুহাম্মদের নিন্দা জানায় এবং একটি অস্থায়ী সংবিধান প্রণয়নে কাজ শুরু করে।

১৯২২ সালের ১ নভেম্বর তুরস্কের জাতীয় পরিষদ উসমানি শাসনব্যবস্থা বিলুপ্ত ঘোষণা করে এবং সুলতানকে ইস্তাম্বুল থেকে নির্বাসনে পাঠানো হয়। ১৭ নভেম্বর যুক্তরাজ্যের যুদ্ধজাহাজ মালায়ায় চড়ে তিনি তুরস্ক ছেড়ে চলে যান। পরে হেজাজ হয়ে মিসরে কিছুকাল অবস্থান করেন। সর্বশেষ তিনি ইতালিতে যান এবং জীবনের শেষ দিনগুলো কাটান গভীর দুঃখ ও বেদনায়।

১৯২৬ সালের ১৬ মে তিনি ইন্তেকাল করেন। সিরিয়ার দামেস্কে তাঁর লাশ নিয়ে আসা হয় এবং সুলতান সেলিম মসজিদের আঙিনায় দাফন করা হয়।

Scanned with CamScanner



সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল মজিদ

১৮৬৮ সালের মে মাসে জন্মগ্রহণ করেন উসমানি সাম্রাজ্যের সর্বশেষ শাসক দ্বিতীয় আব্দুল মজিদ। তিনি সুলতান আব্দুল আজিজের পুত্র। ১৯২২ সালের ১৮ নভেম্বর তিনি খলিফা আব্দুল মজিদ হিসেবে উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতীকী শাসক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এর তিন দিন পর লোজান কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এতে সদ্য প্রজাতন্ত্রের রূপ নেওয়া তুরস্ককে স্বীকৃতি দিতে কিছু শর্ত বেঁধে দেয় ব্রিটেন এবং অন্যান্য ইংরেজশক্তি। এ শর্তগুলো হলো ইসলামি খেলাফত-ব্যবস্থা বাতিল ঘোষণা করতে হবে, উসমানি পরিবারকে তুরস্ক থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে, তাদের সমুদয় সম্পদ বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করতে হবে, তুরস্ককে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসেবে ঘোষণা করতে হবে।

এ শর্তগুলো নিয়ে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন মুস্তফা কামাল পাশা ও প্রধানমন্ত্রী। একপর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেন। এতে সুযোগ পান মুস্তফা কামাল পাশা। তিনি ইংরেজদের সব শর্ত মেনে নেওয়ার ঘোষণা দেন। এ সম্মেলনের চার মাস পর উসমানি শাসনব্যবস্থা বিলুপ্ত ঘোষিত হয়।

Scanned with CamScanner

মাত্র এক বছর তিন মাস তিনি কোনো প্রশাসনিক ক্ষমতা ছাড়াই খলিফা হিসেবে সমাসীন ছিলেন।

ইস্তাম্বুল থেকে সব প্রশাসনিক ক্ষমতা সরিয়ে নেওয়া হয় আঙ্কারায়। মুস্তফা কামালের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় পরিষদ তখন প্রতিনিয়ত শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। একপর্যায়ে ব্রিটেনের শর্ত মেনে খলিফা দ্বিতীয় আব্দুল মজিদকে পদচ্যুত করে উসমানি ধারা বিলুপ্ত ঘোষণা করে জাতীয় পরিষদ। ১৯২৩ সালের ৩ মার্চ খলিফা ও তাঁর পুরো পরিবারকে তুরস্ক থেকে বিতাড়ন করা হয়। এরপর সুদীর্ঘ ৫০ বছর উসমানি পরিবারের কোনো সদস্য তুরস্কে আসার সুযোগ পাননি।

Scanned with CamScanner

উসমানি সাম্রাজ্যের সূর্যাস্ত

৫ মার্চ, ১৯২৪। উসমানি সাম্রাজ্যের সূর্য ডুবছে। চারপাশে তখন বিষণ্ন সন্ধ্যা। দোলমাবাহশা প্রাসাদে খাসকামরায় বসে আছেন খলিফা দ্বিতীয় আব্দুল মজিদ। ঐতিহ্যবাহী প্রাসাদের ভেতর পুরো পরিবেশ গুমোট আকার ধারণ করে আছে। অজানা বিপদের আশঙ্কায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত খলিফা পরিবারের সদস্যদের দেখলে বোঝার উপায় নেই, শত শত বছর ধরে এ প্রাসাদ থেকে শাসন করা হয়েছে তিন মহাদেশজুড়ে বিস্তৃত এক সুবিশাল সাম্রাজ্য।

খলিফার বন্ধু ও কবি আব্দুল হক হামিদ প্রাসাদে এসেছেন। কোনো বাধা কিংবা অনুমতি প্রার্থনার সুলতানি রেওয়াজ নেই এই প্রাসাদের কোথাও। সরাসরি তিনি খলিফার কামরায় প্রবেশ করলেন। তিনি দেখেন, মাথা নিচু করে বসে আছেন উসমানি সাম্রাজ্যের সর্বশেষ খলিফা দ্বিতীয় আব্দুল মজিদ। গভীর শোক ও বেদনার গাঢ় ছায়া খলিফার উজ্জ্বল মুখকে নিষ্প্রভ করে রেখেছে। কামরার এক পাশে সারিবদ্ধভাবে রাখা আছে কিছু মালপত্র। বোঝাই যাচ্ছে, খলিফা ও তাঁর পরিবারের জন্য এই দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

বন্ধুর আগমনে মাথা তুললেন খলিফা আব্দুল মজিদ। তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি হয়তো জেনেছ জাতীয় পরিষদ আমার খলিফা পদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেছে। আমাকে আজ রাত ১০টা পর্যন্ত সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে, যাতে আমি এই দেশ ও শহর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাই। আমার পরিবারের সদস্যদের জন্য দেওয়া হয়েছে ৪৮ ঘণ্টা সময়।' খলিফার কণ্ঠ অস্পষ্ট হয়ে আসে কথাগুলো বলতে গিয়ে।

কবিবন্ধু জানেন, কামাল আতাতুর্কের হাতে এমন আরও অনেক কিছু ঘটবে, যা কেউ কল্পনা করেনি আগে। খলিফার এই বিষণ্নতা তাঁকেও স্পর্শ করল। ৬২৪ বছরের বেশি সময় ধরে টিকে থাকা উসমানি সাম্রাজ্যের এমন করুণ পরিণতি ঘটছে তাঁর জীবদ্দশায়, ভাবতেই বুকের ভেতর কোথায় যেন মোচড় দিয়ে ওঠে তাঁর।

Scanned with CamScanner

খলিফা আবারও নীরবতা ভাঙলেন। বন্ধুর বিষাদময় চেহারার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বলো, এই পরিস্থিতিতে আমি আর কী করতে পারি? তোমার কী মনে হয়, আমার দাদা সুলতান সেলিম বেঁচে থাকলে তিনি কী করতেন এই অবস্থায়?'

কবি বুঝতে পারছেন, সময় আর বেশি বাকি নেই, কাজেই অতীতের এসব আলাপ করে লাভ নেই এখন। খলিফাকে তিনি বললেন, 'আপনার দাদা ও পূর্বসূরিরা বেঁচে থাকলে এই দুর্দশায় তাঁদের সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই অন্য রকম হতো। কিন্তু সেই সুদিন এখন নেই। আমার মনে হয়, আপনি আপনার মালপত্র গুছিয়ে ফেলুন, এটাই ভালো।'

সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহ, সুলতান সুলায়মান ও সুলতান সেলিমের মতো প্রবল প্রতাপধর শাসকেরা শত শত বছর ধরে যে ভূখণ্ড শাসন করেছেন গৌরবময় কীর্তিতে, আজ তাঁদের শেষ উত্তরসূরিকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এই জনপদ থেকে, কিন্তু কোথাও কোনো প্রতিবাদ নেই। লন্ডভন্ড এই সাম্রাজ্যের কোথাও তাঁর সামান্য আশ্রয় নেই আজ।

খলিফা আব্দুল মজিদ ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের তুরস্ক থেকে বের করে দেওয়ার দুই বছর আগে থেকে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে উসমানি সাম্রাজ্য। তুরস্কে গড়ে ওঠা নতুন রাজনৈতিক শক্তি 'সুলতান' পদবি বাতিল করে উসমানি পরিবারকে 'খলিফা' হিসেবে আখ্যায়িত করে। উসমানি পরিবারের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয় সব প্রশাসনিক ক্ষমতা। বরং শুধু ধর্মীয় প্রতীক হিসেবে খলিফা ঘোষণা দেওয়া হয় শাসক আব্দুল মজিদকে।

তুরস্কের চারপাশ ঘিরে ইউরোপীয় খ্রিষ্টান ও ইহুদি জোট তখন উসমানি শাসনের বিলুপ্তির দাবিতে চাপে ফেলছে কামাল আতাতুর্ক এবং অন্য নেতাদের। দেশের ভেতর শক্তিশালী হয়ে ওঠা ধর্মবিদ্বেষী গোষ্ঠীর কাছে অসহায় হয়ে পড়ে উসমানি খলিফা এবং তাঁর পরিবার। বাকি ছিল কেবল এই অপমানটুকু। রাতের অন্ধকারে উসমানি পরিবারের সবাইকে ইস্তাম্বুল থেকে দূরে কোথাও তাড়িয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে বিদেশি শক্তির কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর কামাল আতাতুর্ক। এক লহমাও দেরি সইছে না তাঁর।

উসমানি সুলতান বা খলিফার শাসনব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে সদ্য প্রজাতন্ত্রে রূপ পাওয়া তুরস্কের জনগণ নীরব দর্শকের ভূমিকায়। চাইলেও কিছু করার নেই তাদের। দেশবাসীর মনে উসমানি পরিবারের জন্য মায়া ও করুণা জেগে উঠতে পারে, এমন আশঙ্কায় দ্রুততম সময়ে রাত পোহানোর আগেই শহর

Scanned with CamScanner

ছেড়ে চলে যেতে সময় বেঁধে দিয়েছে জাতীয় পরিষদ। উসমানি পরিবারের কোনো সদস্য তুরস্কের মাটিতে থাকতে পারবেন না, এটাই তাদের শেষ কথা।

সন্ধ্যা নেমে আসার কিছুক্ষণ পর প্রকৃতিজুড়ে যখন অন্ধকার রজনী, তখন প্রাসাদের বাইরে অপেক্ষা করছে কয়েকটি গাড়ি। সঙ্গে কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষী। সম্মান জানাতে নয়, বরং এই দেশ ও ভূখণ্ডের সর্বশেষ খলিফার করুণ বিদায়ের নীরব সাক্ষী হতে পাঠানো হয়েছে তাদের।

উসমানি পরিবারের সদস্যরা একে একে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন। খলিফা আব্দুল মজিদ শেষবারের মতো দেখে নিলেন চিরচেনা এই প্রাসাদ ও স্মৃতিময় চারপাশ। নীরবে, নিঃশব্দে তিনি উঠে বসলেন গাড়িতে। তাঁর স্ত্রী, কন্যা ও কয়েকজন সেবক পেছনের কয়েকটি গাড়িতে বসলেন। অপমান ও বেদনায় নির্বাক স্তব্ধ সবাই।

খলিফার সম্মতি পেয়ে নির্ধারিত গন্তব্যে ছুটে চলল গাড়ির বহর। ইস্তাম্বুল থেকে আজ রাতেই তাঁদের নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হবে ফ্রান্সের নিস শহরে। রাতের নীরবতায় জনমানবহীন চিরচেনা রাজপথ বিদায় জানাল খলিফা আব্দুল মজিদকে। এভাবেই শেষ হলো উসমানি পরিবারের গল্প, রচিত হলো ৬২৪ বছরের সুদীর্ঘ সোনালি অধ্যায়ের শেষ অংশ।

তুরস্ক থেকে নির্বাসনে পাঠানোর পর এই উসমানি পরিবারের সদস্যদের দিনগুলো কেমন কেটেছে–এর সামান্য আঁচ পাওয়া যায় খলিফা আব্দুল মজিদের কন্যা শাহজাদি দুররে শাহওয়ারের লেখা এক দুর্লভ স্মৃতিকথায়।

খলিফা দ্বিতীয় আব্দুল মজিদ উসমানি সাম্রাজ্যের ৩৭তম এবং সর্বশেষ শাসক। তাঁর পিতা ছিলেন সুলতান প্রথম আব্দুল আজিজ। ১৮৬৮ সালের ৩০ মে ইস্তাম্বুলে তাঁর জন্ম। মায়ের নাম হিরানি দিল। শৈশবে প্রয়োজনীয় পড়ালেখা শেষে তুরস্কের সেনাবাহিনীতে যোগ দেন তিনি।

১৯২২ সালের ১৯ নভেম্বর তিনি উসমানি সাম্রাজ্যের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল তুরস্কের শাসক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তবে এটি ছিল কেবলই আনুষ্ঠানিকতা।

খলিফা দ্বিতীয় আব্দুল মজিদ দায়িত্ব গ্রহণের বেশ কয়েক বছর আগে থেকে সুলতানি প্রথা বাতিল করা হয় এবং এর পরিবর্তে উসমানি পরিবারের শাসককে খলিফা পদ দেওয়া হয়। এই পদ থেকে সব ধরনের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও প্রশাসনিক ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়। ফলে এটি কেবলই ধর্মীয় সম্মানের একটি প্রভাববিহীন উপাধিতে পরিণত হয়।

Scanned with CamScanner

আব্দুল মজিদকে খলিফা উপাধি দেওয়ার তিন দিন পর লোজান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে তুরস্ককে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে চারটি শর্ত আরোপ করে ব্রিটেন। এগুলো হচ্ছে খেলাফত ও খলিফা বিলুপ্তি, উসমানি পরিবারের সবাইকে তুরস্ক থেকে বিতাড়ন করা, উসমানি পরিবারের সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা এবং তুরস্ককে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা।

কিন্তু এসব শর্ত মেনে নেওয়ার ব্যাপারে তুরস্কের নেতাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। কামাল আতাতুর্ক এবং তুরস্কের প্রতিনিধিদলের নেতারা এ চার শর্ত মেনে নিলেও জাতীয় পরিষদ এবং তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী তাতে অস্বীকৃতি জানান। এমন অস্থিরতা চলাকালে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে কামাল আতাতুর্কের সামনে সুযোগ চলে আসে। তিনি দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ক্ষমতা হাতে নেন এবং ইংরেজদের শর্তগুলো বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

এর ফলে ১৯৩৪ সালের ৩ মার্চ তুরস্কের জাতীয় পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খলিফা পদ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয় এবং উসমানি পরিবারের সব সদস্যকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়। খলিফা পদবি কেড়ে নেওয়ার পর দ্বিতীয় আব্দুল মজিদকে তাঁর পরিবারসহ পাঠিয়ে দেওয়া হয় ফ্রান্সের নিস শহরে।

নির্বাসিত জীবন

কোথায় যাচ্ছি আমরা? এ কোন বিপদ আমাদের ওপর এসে পড়ল, যা আমরা কোনো দিন ভাবিনি। আমাদের সামনে এখন শুধু দুঃখ ও বিপদের দিন। দুর্ভাগ্যের এ আঘাত আমার সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিল। আমার সুখের প্রদীপগুলো আজ থেকে এভাবে নিভে গেল।

উসমানি সাম্রাজ্যের সূর্যাস্তকালে যখন খলিফা দ্বিতীয় আব্দুল মজিদকে সপরিবারে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল তুরস্ক থেকে, তাঁরই কন্যা দুররে শাহওয়ারের লেখা একটি স্মৃতিকথা শুরু হয়েছে বুকভাঙা আর্তনাদের এ শব্দগুলো দিয়ে।

বিপদঘেরা বিষণ্ণময় সেই সন্ধ্যায় লেখা তাঁর এ দুঃখগাথা আজও ইতিহাস পাঠকের সামনে জীবন্ত করে তোলে উসমানি সাম্রাজ্যের অসহায় খলিফা আব্দুল মজিদ এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের তুরস্ক থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার করুণ দৃশ্যপট। উসমানি পরিবারের উত্থান-পতনের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এমন দুর্দিন আর কখনো আসেনি।

Scanned with CamScanner

তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি কামাল আতাতুর্ক ১৯২৪ সালের ৫ মার্চ কয়েক ঘণ্টা সময় বেঁধে দিয়েছিলেন উসমানি পরিবারের সবাইকে তুরস্ক ছেড়ে চলে যেতে। দুররে শাহওয়ারের বয়স তখন ১০ বছর। চোখের সামনে পিতা, মাতা এবং পরিবারের অন্য সবার করুণ বিদায়যাত্রা বিষাদে ভরিয়ে দিয়েছিল তাঁর মন।

খলিফা আব্দুল মজিদ এই কন্যাকে আদর করে ডাকতেন দুররে শাহওয়ার নামে। তাঁর আসল নাম ছিল খাদিজা। ১৯১৪ সালের ২৬ জানুয়ারি স্ত্রী মাহাস্তি খানমের গর্ভে জন্ম নেওয়া দুররে শাহওয়ার রূপ-সৌন্দর্য এবং গুণ-গরিমায় অন্যদের চেয়ে অসাধারণ ছিলেন।

খলিফা আব্দুল মজিদ ছিলেন একজন শৌখিন মানুষ। তিনি ছবি আঁকতে ভালোবাসতেন। তাঁর কন্যা দুররে শাহওয়ারও রং ও তুলির আঁচড়ে অপরূপ ছবি আঁকতেন। ইস্তাম্বুলে উসমানি পরিবারের প্রাসাদে বিভিন্ন দেয়ালে টানানো বেশ কিছু চিত্রকর্ম পিতা ও কন্যার আঁকিয়ে প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করত।

উসমানি সাম্রাজ্য পতনের দুঃসময়ে যখন খলিফার পুরো পরিবারকে নির্বাসনে পাঠানো হয়, তখন এই কঠিন সংকটময় সময়ে তাঁরা মিসরে আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন। মিসরের নিষ্ঠুর শাসক বাদশাহ ফুয়াদ সাফ জানিয়ে দেন, উসমানি পরিবারের কোনো সদস্য এমনকি নারী বা শিশুদেরও মিসরে ঢুকতে দেওয়া হবে না।

নিরুপায় হয়ে তুরস্ক ছেড়ে খলিফা আব্দুল মজিদ সপরিবারে আশ্রয় নেন ফ্রান্সের নিস শহরে। এই যাত্রাকালে তাঁদের হাত ছিল একেবারে কপর্দকশূন্য। কোনো অর্থসম্পদ সঙ্গে নিয়ে যেতে দেননি তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক। বরং রাষ্ট্রীয় আদেশ জারি করে উসমানি সুলতান ও তাঁদের পরিবারের সব স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

৬২৪ বছর ধরে তিন মহাদেশজুড়ে বিস্তৃত ছিল যাদের শাসনসীমানা, তাদের সর্বশেষ উত্তরাধিকার এই হতভাগা পরিবারটির দুর্দশা যুগ যুগ অগণিত মানুষের হৃদয়ে বেদনার জন্ম দিয়েছে। ফ্রান্সের নিস শহরে খলিফা ও তাঁর পরিবারের দিন কেটেছে অর্থের অভাব ও অসহায়ত্বে। তাঁদের চারপাশে তখন দুঃখ ও দারিদ্র্যঘেরা চরম দুঃসময়। এমন মানবেতর বিপদে এই পরিবারের পাশে এগিয়ে এসেছিল ভারতবর্ষের মুসলমানরা। প্রতি মাসে ভারতবর্ষ থেকে মুসলমানদের সম্মিলিত চাঁদা ও সাহায্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ বেতন-ভাতা পাঠানো শুরু হয় খলিফা পরিবারের সদস্যদের জন্য।

কিছুদিন পর ভারতের হায়দরাবাদের শাসনকর্তা (নিজাম) তাঁদের আমন্ত্রণ জানান নিজের আতিথেয়তায়। ঐতিহাসিকদের দাবি, এই নিজাম

Scanned with CamScanner

সেকালে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী শাসক ছিলেন। ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু শাসক হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল। ১৯৩০ সালে নিজামের সম্পদের পরিমাণ ছিল ১০০ মিলিয়ন পাউন্ডের সমপরিমাণ সোনা ও রুপার মুদ্রা। আরও ছিল ৪০০ মিলিয়ন পাউন্ডের সমপরিমাণ গয়না ও অলংকার।

হায়দরাবাদের নিজাম প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে যুদ্ধের ব্যয় মেটাতে ব্রিটেনকে ২৫ মিলিয়ন পাউন্ড অর্থ সহায়তা দেন। ব্রিটিশশাসিত ভারতে তিনি তখন সর্বোচ্চ সম্মানের মর্যাদায় ভূষিত ছিলেন। নিজাম পরিবার ১৭১২ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত একনাগাড়ে হায়দরাবাদের বিশাল রাজ্য শাসন করে। তাদের শাসিত সেই অঞ্চল আজ তিনটি প্রদেশে বিভক্ত। সেগুলো হচ্ছে মহারাষ্ট্র, কর্নাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশ।

১৯৩১ সালে নিজাম পরিবারের শাহজাদা আমির আজম জাহ হেমায়েত আলী খানের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন উসমানি পরিবারের রাজকন্যা খাদিজা ওরফে দুররে শাহওয়ার। হায়দরাবাদের শাসক পরিবারের পুত্রবধূ হিসেবে 'আমিরা বারার' উপাধি দেওয়া হয় তাঁকে।

আমির হেমায়েত আলী খানের পিতা উসমান আলী খান ছিলেন হায়দরাবাদের সর্বশেষ শাসক। এই বিবাহবন্ধনের মাধ্যমে তুরস্কের উসমানি পরিবারের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন হায়দরাবাদের নিজাম। এমনকি দুররে শাহওয়ারের চাচাতো বোন নিলুফারকে বিয়ে করেন হায়দরাবাদের নিজামের ছোট পুত্র শাজাআত আলী খান।



Scanned with CamScanner

কিছু ঐতিহাসিকের ধারণা, তুরস্ক থেকে বিতাড়িত এবং কালের আবর্তে অসহায় হয়ে পড়া খলিফা পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধনে জড়িয়ে হায়দরাবাদের নিজাম উসমান আলী খান তখন মুসলিম জাহানের নতুন খলিফা হওয়ার স্বপ্ন দেখছিলেন। যদিও তা আর পূরণ হয়নি তাঁর।

উসমানি খলিফা বা সুলতানদের অধ্যায় সমাপ্তির পর নতুন করে আবারও খলিফা বা সুলতানি ধারাবাহিকতা তৈরি করে মুসলিম বিশ্বের একক অধিপতি হওয়ার ইচ্ছা জেগেছিল মিসরের বাদশাহ ফুয়াদ এবং সৌদি আরবের বাদশাহ আব্দুল আজিজেরও। কিন্তু তত দিনে বদলে যাওয়া বিশ্ব পরিস্থিতি তাঁদের সেই সুযোগ দেয়নি। ফলে এর পর থেকে আর কারও ভাগ্যে মুসলিম সাম্রাজ্যের খলিফা হওয়ার গৌরবময় সম্মান জোটেনি।

১৯৪৪ সালের ২৩ আগস্ট ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে মৃত্যুবরণ করেন উসমানি শাসকদের সর্বশেষ উত্তরাধিকার খলিফা দ্বিতীয় আব্দুল মজিদ। জীবনের শেষ দিনগুলোয় কষ্ট ও মনোবেদনায় ভুগে নির্বাক হয়ে পড়েছিলেন তিনি। চোখের সামনে তাঁর পূর্বসূরিদের ৬২৪ বছরের কীর্তিময় শাসনের করুণ সমাপ্তি তাঁকে প্রতিনিয়ত দুঃখ-ভারাক্রান্ত করে রাখত।

মৃত্যুর আগে আব্দুল মজিদের শেষ ইচ্ছা ছিল, তাঁর লাশ যেন তুরস্কের তারিবা কবরস্থানে দাফন করা হয়। কারণ, এই কবরস্থানে চিরশয্যায় সমাহিত হয়েছেন তাঁর পিতা সুলতান আব্দুল আজিজ, পিতামহ সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ এবং চাচাতো ভাই সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ। তুরস্ক থেকে নির্বাসিত হলেও অন্তত মৃত্যুর পর যেন পরিবারের পাশে নিজের জন্মভূমিতে তাঁর শেষ স্থান হয়, এটা ছিল তাঁর জীবনের শেষ চাওয়া।

পিতার মৃত্যু ব্যথিত করে তোলে দুররে শাহওয়ারকে। বাবার শেষ স্বপ্ন পূরণে তিনি ছুটে যান তুরস্কে, অনেক বছর আগে মাত্র ১০ বছর বয়সে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল যে জনপদ থেকে। তুরস্কের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইসমত ইতুনুকে দুররে শাহওয়ার অনুরোধ করেন, তাঁর মরহুম পিতা এবং উসমানি সাম্রাজ্যের সর্বশেষ খলিফার লাশ যেন তুরস্কের মাটিতে দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়।

তত দিনে অনেক বদলে গেছে তুরস্ক। শাসকদলের সদস্যদের মনে তখনো উসমানি পরিবারের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ জমে আছে। কাজেই খলিফাকন্যার এই আকুতি তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী নির্দয়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন।

বিষণ্ন মনে ফ্রান্সে ফিরে আসেন দুররে শাহওয়ার। পিতার প্রতি গভীর ভালোবাসায় শপথ নেন দীর্ঘ প্রতীক্ষার। যে করেই হোক, পূর্বপুরুষের মাটি

Scanned with CamScanner

তুরস্কে পিতাকে দাফন করার ইচ্ছায় অপেক্ষায় থাকেন সময়ের পালাবদলের। বাবার স্বপ্নপূরণের প্রত্যাশায় দীর্ঘ ১০ বছর খলিফা আব্দুল মজিদের মৃতদেহ প্যারিসের একটি মসজিদে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন দুররে শাহওয়ার।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটে তুরস্কে। নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন ডানপন্থী দলের নেতা আদনান মান্দারিস। খবর পেয়ে দুররে শাহওয়ার আবারও ছোটেন তুরস্কের উদ্দেশে। নতুন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে সবিনয় অনুরোধ করেন, তাঁর মরহুম বাবার লাশ যেন তুরস্কের মাটিতে দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়। উসমানি পরিবারের এই রাজকন্যার আকুতি শোনেন প্রধানমন্ত্রী। জাতীয় পরিষদের সম্মতি পেলে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন, আশ্বাস দেন তাঁকে।

তুরস্কের জাতীয় পরিষদে প্রস্তাব তোলা হলো সর্বশেষ উসমানি খলিফা আব্দুল মজিদের লাশ দাফনের। উসমানি পরিবারের প্রতি বিরাগভাজন কয়েকজন সদস্য এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। ফলে প্রস্তাবটি আর পাস হলো না। আধুনিক তুরস্কের সংকীর্ণতার কাছে আবারও হেরে গেলেন দুররে শাহওয়ার। খেলাফত-ব্যবস্থা পতনের পর কয়েক দশক পেরিয়ে যাওয়ার পরও উসমানি পরিবারের এক খলিফার লাশ তুরস্কের মাটিতে দাফনের সুযোগ দেয়নি তুরস্কের জাতীয় পরিষদ।

ক্ষোভে ও দুঃখে কান্নায় ভেঙে পড়েন দুররে শাহওয়ার। এই অপমান ও লাঞ্ছনা আর পিতার স্বপ্নপূরণে এক দশকের ব্যর্থতা বুকে চেপে শেষবারের মতো তুরস্ক ত্যাগ করেন দুররে শাহওয়ার।

তাঁর এমন করুণ দুঃসময়ে এগিয়ে আসেন সৌদি আরবের বাদশাহ সউদ বিন আব্দুল আজিজ। উসমানি পরিবারের এই মরহুম মুসলিম খলিফার প্রতি সম্মান দেখিয়ে পবিত্র নগরী মদিনার জান্নাতুল বাকিতে তাঁর লাশ দাফনের অনুমতি দেন তিনি। পূর্বপুরুষদের কবরস্থানে জায়গা না পেলেও পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব নবিজির রওজা মুবারকের প্রতিবেশী হয়ে পবিত্র মাটিতে পেলেন মুসলিম জাহানের এই সর্বশেষ উসমানি খলিফা। ১৯৫৪ সালের ৩০ মার্চ তাঁকে দাফন করা হয় জান্নাতুল বাকিতে।

পিতার প্রতি তুরস্কের এই অন্যায় ও প্রতিহিংসামূলক নির্দয় আচরণের প্রতিবাদে পরে সুযোগ পেয়েও আর কোনো দিন তুরস্কের জাতীয়তা ফেরত নেননি দুররে শাহওয়ার। মৃত্যু পর্যন্ত ইংল্যান্ডের জাতীয়তা নিয়ে বেঁচে ছিলেন তিনি।

Scanned with CamScanner

লন্ডনে থাকাকালে ২০০৬ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার রাতে ৯২ বছর বয়সে পরপারে পাড়ি জমান ইতিহাসের সাক্ষী এই রাজকন্যা। মৃত্যুর আগে দুই পুত্রকে তিনি অসিয়ত করেছিলেন, তাঁর লাশ যেন লন্ডনের এক মুসলিম কবরস্থানে দাফন করা হয়।

গুণী ও সংগ্রামী রাজকন্যা দুররে শাহওয়ার ছিলেন চিত্রশিল্পী হওয়ার পাশাপাশি প্রচণ্ড মেধাবী। পৃথিবীর আটটি ভাষায় কথা বলার দক্ষতা ছিল তাঁর। তাঁর একমাত্র ভাই ওমর ফারুক ১৯৬৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন এবং তুরস্কের ইস্তাম্বুলে সমাহিত হন।

Scanned with CamScanner

উসমানি সাম্রাজ্য পতনের তিন খলনায়ক

উসমানি সাম্রাজ্যের পতন নিশ্চিত হয়ে পড়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পর। অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়া উসমানি বাহিনীকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পাঠানোর পেছনে মূল হোতা ছিলেন তিনজন ব্যক্তি। তাঁরা হলেন আনোয়ার বেগ, তালাত পাশা ও জামাল পাশা।

আনোয়ার বেগ ছিলেন সে সময় উসমানি সেনাবাহিনীর প্রধান এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত। যুদ্ধ ও সামরিক নেতৃত্বে তিনি ছিলেন অনভিজ্ঞ ও অযোগ্য। উসমানি পরিবারের কন্যা নাজিয়াকে বিয়ে করার কারণে হয়তো তিনি পদোন্নতি পেয়েছিলেন। সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ তাঁকে উচ্চশিক্ষার জন্য জার্মানি পাঠিয়েছিলেন। সেখানে পড়াশোনাকালে তিনি জার্মানপন্থী হয়ে যান। জার্মানির প্রতি তাঁর দুর্বলতার কারণে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি জার্মানিদের পক্ষে উসমানি বাহিনীকে নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

তালাত ছিলেন তুর্কি জাতীয়তাবাদের গোঁড়া সমর্থক। ষড়যন্ত্রে সিদ্ধহস্ত এই লোক ছিলেন সাহসী ও অশিক্ষিত। উসমানি সাম্রাজ্যে তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। ইসলামি আদর্শ থেকে তাঁর অবস্থান ছিল যোজন যোজন দূরে। বরং তিনি মাসুনিয়া (ফ্রিম্যাসনরি) গুপ্ত ভ্রাতৃসংঘের সদস্য ছিলেন বলে ঐতিহাসিক ও গবেষকদের দাবি।

জামাল পাশা ছিলেন ফ্রান্সের গোঁড়া সমর্থক এবং মাসুনিয়া (ফ্রিম্যাসনরি) গুপ্ত ভ্রাতৃসংঘের একনিষ্ঠ কর্মী। তিনি সেনাবাহিনীতে উচ্চ পর্যায়ের সামরিক নেতা হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

Scanned with CamScanner



মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক

পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো সাম্রাজ্য চিরকাল টিকেনি। যুগ-যুগান্তরে বিভিন্ন সাম্রাজ্যের উত্থান হয়েছে, আবার কালের আবর্তনে তাদের পতন ঘনিয়ে এসেছে। জানা-অজানার ইতিহাসে হারিয়ে গেছে কত সাম্রাজ্যের শৌর্যবীর্যের গল্প।

একইভাবে উসমানি সাম্রাজ্যের পতনও ঘনিয়ে আসে কালে কালে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানি বাহিনীর পরাজয়ের পর এই পতন যেন আর কোনোভাবেই ঠেকানো যাচ্ছিল না। এই পতনকালে ত্রাণকর্তা সেজে উসমানি সাম্রাজ্যের পুরো নাম-নিশানা বদলে ফেলেন যে ব্যক্তি, তিনি মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক।

আধুনিক তুর্কি প্রজাতন্ত্রের জনক হিসেবে তিনি বিশ্বজুড়ে আলোচিত ও সমালোচিত। সশস্ত্র বাহিনীর সামরিক নেতা থেকে তিনি ধীরে ধীরে নিজের শক্ত বৃত্ত তৈরি করে নেন সবার অগোচরে। ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়া

Scanned with CamScanner

পূর্ণ হওয়ার পরপরই তিনি তাঁর মুখোশ খুলে ফেলেন। বিশ্ববাসী অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে, কামাল আতাতুর্কের হাতে উপড়ে গেল উসমানি সাম্রাজ্যের শতবর্ষী বটবৃক্ষের শেষ শিকড়টি।

উসমানি সাম্রাজ্যের শেষ যুগের সুলতান ওয়াহিদুদ্দীন ভেবেছিলেন, মুস্তফা কামাল আতাতুর্কের হাতে ফিরে আসবে উসমানি সাম্রাজ্যের শেষ বিজয়। সুলতান ওয়াহিদুদ্দীন যখন উসমানি সাম্রাজ্যের যুবরাজ হিসেবে বার্লিনে গিয়েছিলেন সেখানকার নতুন সম্রাটকে সুলতান মুহাম্মদ রাশাদের পক্ষ থেকে পাঠানো উপহার পৌঁছে দিতে, তখন তাঁর সঙ্গী ছিলেন মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক।

মুস্তফা কামাল আতাতুর্কের সঙ্গে যুবরাজ ওয়াহিদুদ্দীনের সখ্য দিনে দিনে গভীর হয়। এরপর যখন যুবরাজ থেকে তিনি সুলতান হিসেবে পদে অধিষ্ঠিত হন, তখন মুস্তফা কামাল আতাতুর্কের ওপর তাঁর নির্ভরতা বেড়ে যায়। তিনি তাঁকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব দেন। তাঁর বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে দেন।

সুলতান ওয়াহিদুদ্দীনের নেকনজরে মুস্তফা কামাল আতাতুর্কের প্রভাব রাতারাতি বেড়ে গেল। তাঁর মাসিক বেতন নির্ধারিত হলো ২০ হাজার উসমানি স্বর্ণমুদ্রা, যা সেকালে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত উসমানি সাম্রাজ্যের জন্য অনেক বড় অঙ্ক ছিল। সুলতান ওয়াহিদুদ্দীন ভেবেছিলেন, কামাল আতাতুর্কের মাধ্যমে ইংরেজদের বিতাড়ন করা সম্ভব হবে। তখনো তিনি বুঝতে পারেননি, কোন অপাত্রে তিনি তাঁর আস্থা ও বিশ্বাস বিসর্জন দিচ্ছিলেন।

সুলতান ও অন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের অজান্তে ইংরেজদের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক। পর্দার আড়ালে উসমানি সাম্রাজ্য মুছে দেওয়ার সব পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেন মুস্তফা কামাল ও তাঁর সঙ্গীরা।

সুলতানের পক্ষ থেকে মোটা অঙ্কের মাসিক বেতন এবং বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের মিশনে ১৯১৯ সালের ১৭ মে সামসুন শহরের উদ্দেশে ইস্তাম্বুল ত্যাগ করেন। এ সময় তিনি নিজের পছন্দের কিছু সামরিক কর্মকর্তা ও বেসামরিক নেতাদের সঙ্গে রাখেন।

সামসুনে পৌঁছেই তিনি তাঁর আসল রূপ প্রকাশ করেন। সুলতানের পরামর্শে গ্রিস বাহিনীর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনার জন্য তাঁকে সেখানে পাঠানো হলেও তিনি নিজের হিসাবমতো এই যুদ্ধ পরিচালনা করেন। বাহ্যিকভাবে তাঁর কর্মকাণ্ড দেশের স্বার্থে মনে হলেও এর ভেতরে যে ভয়ংকর পরিকল্পনা তিনি পুষে রেখেছেন, তা অনেকেই তখন টের পাননি।

Scanned with CamScanner

মুস্তফা কামালের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সামরিক কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ হন অন্য সামরিক নেতারা। ইস্তাম্বুলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ পাঠান অন্য পদস্থ কর্মকর্তারা। কিন্তু তত দিনে সময় গড়িয়ে গেছে। মুস্তফা কামালকে ইস্তাম্বুলে তলব করা হলেও তিনি সেই আদেশে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখান। তাঁকে বারবার তলব করার একপর্যায়ে তিনি উসমানি সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি দেন। এ পর্যায়ে তাঁকে পদচ্যুত করে উসমানি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

তখনো আশা ছাড়েননি সুলতান ওয়াহিদুদ্দীন। মুস্তফা কামাল আতাতুর্ককে বরখাস্ত করার আদেশ যখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে তাঁর কাছে পাঠানো হয়, তখন তিনি তাতে স্বাক্ষর করা থেকে বিরত থাকেন। বরং আবারও কামাল আতাতুর্ককে ইস্তাম্বুলে তলব করতে আদেশ করেন সুলতান। সুলতানের পক্ষ থেকে মুস্তফা কামাল আতাতুর্কের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয় টেলিগ্রাম বার্তার মাধ্যমে, কিন্তু তিনি পদত্যাগ করতে রাজি হননি, ইস্তাম্বুলেও ফিরে আসেননি।

চেনা মানুষের এমন অচেনা রূপে স্তম্ভিত হয়ে পড়েন সুলতান। অবশেষে নিরুপায় হয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুস্তফা কামাল আতাতুর্ককে অব্যাহতির আদেশে সম্মতি দেন সুলতান। এর পরও থেমে থাকেনি মুস্তফা কামালের ষড়যন্ত্র। তাঁর বন্ধু ও বিশ্বস্ত সঙ্গী তওফিক পাশার সহযোগিতায় তিনি শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। এ সময় তাঁর চারপাশে একদল সুযোগসন্ধানী ও স্বার্থপর লোক ভিড় করে।

মুস্তফা কামাল দাবি তোলেন, সুলতান হিসেবে ওয়াহিদুদ্দীন থাকতে পারবেন না। বরং তিনি কেবল ধর্মীয় উপাধি হিসেবে খলিফা পদবি গ্রহণ করবেন। আর শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু ইস্তাম্বুল থেকে আঙ্কারায় সরিয়ে নিয়ে আসা হবে। সুলতান ওয়াহিদুদ্দীন এ দাবি প্রত্যাখ্যান করেন এবং ১৯২২ সালে তিনি পদত্যাগ করেন। সুলতান ওয়াহিদুদ্দীনের পদত্যাগের পর নতুন শাসক হিসেবে আব্দুল মজিদের নাম ঘোষণা করা হয়। এ সময় তিনি খলিফা উপাধি ধারণ করে মাত্র দুই বছরের জন্য প্রতীকী মর্যাদায় দিন পার করেন। ১৯২৪ সালে তাঁর কাছ থেকে খলিফা পদও কেড়ে নেওয়া হয় এবং সপরিবারে তাঁকে নির্বাসনে পাঠানো হয়।

সুলতান ওয়াহিদুদ্দীনকে বারবার মুস্তফা কামাল আতাতুর্কের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা আমলে নেননি। বরং সুলতানের ঘনিষ্ঠজনেরা যখন তাঁকে বলেছিলেন, এই লোক আপনার সিংহাসন কেড়ে নিতে চাইছে, তখন সুলতান উত্তর দিয়ে বলেছিলেন, 'সে সিংহাসন কেড়ে নিক, তাতে যদি দেশের মঙ্গল হয়, তবে আমার আপত্তি নেই।' সুলতানের

Scanned with CamScanner

এমন অন্ধবিশ্বাস ও মাত্রাতিরিক্ত আস্থা মুস্তফা কামালকে তাঁর স্বার্থ আদায়ে বড় সুযোগ তৈরি করে। এ সময় একজন ইংরেজ গর্ব করে বলেছিলেন, 'সুলতান ওয়াহিদুদ্দীন মুস্তফা কামালকে দিয়ে ইংরেজ শিকার করতে চেয়েছিলেন, উল্টো আমরা মুস্তফাকে দিয়ে সুলতানকে শিকার করে নিলাম।'

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পর উসমানি সাম্রাজ্যের পতনকালে তিনটি গোষ্ঠীর হাতে উসমানিদের ভাগ্য আটকে যায়। প্রথম গোষ্ঠী হিসেবে মুস্তফা কামাল ও তাঁর সঙ্গীরা এ সময় ইংরেজদের সহযোগিতায় খেলাফত-ব্যবস্থা বাতিল করে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে তুরস্ককে গঠনের জন্য জোর তৎপরতা শুরু করেন। দ্বিতীয় গোষ্ঠী হিসেবে গ্রিস বাহিনী রাশিয়ার ছত্রচ্ছায়ায় আজমির শহরসহ অন্য কয়েকটি অঞ্চল দখলের জন্য চূড়ান্তভাবে শক্তি প্রয়োগ করতে থাকে। কিন্তু ইংরেজরা এ সময় রাশিয়ার প্রভাব থেকে তুরস্ককে মুক্ত রাখতে মুস্তফা কামালকে ব্যবহার করতে শুরু করে। আর তৃতীয় গোষ্ঠীটি হচ্ছে খোদ তুরস্কের ক্ষমতাসীন মহল। তওফিক পাশা ও তাঁর মতাদর্শের লোকেরা এ সময় সুলতান এবং মুস্তফা কামালের মধ্যে বিরোধ ও দ্বন্দ্ব উসকে দিয়ে নিজেদের স্বার্থে কাজ করছিলেন।

তবে এ তিন গোষ্ঠীর মধ্যে মুস্তফা কামালের চক্র অত্যন্ত চতুর ও সতর্ক ছিল। নিজেদের উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছাতে তারা কারও সঙ্গে আপস করেনি। মুস্তফা কামাল আতাতুর্কের সঙ্গে ইংরেজদের প্রথম যোগাযোগ শুরু হয় ১৯১৭ সালে, যখন তিনি সামরিক বাহিনীর নেতা হিসেবে উসমানিদের পক্ষ থেকে ফিলিস্তিন অঞ্চলে দায়িত্ব পালন করছিলেন। এ সময় ব্রিটেন থেকে একদল ইংরেজ কর্মকর্তা গোপনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রস্তাব দেন, তিনি যদি সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, তবে তাঁকে সব ধরনের সহযোগিতা দেবে ব্রিটেন। মুস্তফা কামাল এ প্রস্তাব নিয়ে তাঁর পাশের দুটি ইউনিটের দুজন সামরিক কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু তাঁরা এ প্রস্তাবকে অসম্ভব বলে তা থেকে নিজেদের সরিয়ে নেন।

মুস্তফা কামাল যখন ১৯২২ সালে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন ব্রিটেনের বেঁধে দেওয়া শর্ত অনুযায়ী তিনি উসমানি সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ও খেলাফত প্রথা বাতিল বলে ঘোষণা দেন। এরপর একে একে তিনি পুরো তুরস্কে আমূল পরিবর্তনের সূচনা করেন। ৯৫ শতাংশ মুসলমানের দেশ তুরস্ককে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেন।

মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক বলেছিলেন, আলকুদস, ইমান, কারবালা, তলোয়ার—এসব শব্দ ব্যবহার করে তুর্কি জাতিকে দীর্ঘদিন ধোঁকায় ফেলে রাখা

Scanned with CamScanner

হয়েছিল। খেলাফত এবং সুলতান পরিভাষাগুলো কেবলই যুগ যুগ ধরে চলে আসা কুসংস্কার। এই তুরস্কে আজ থেকে খেলাফত-ব্যবস্থা বাতিল বলে গণ্য হবে। ওয়াকফ ও শরিয়ত-সম্পর্কিত কোনো মন্ত্রণালয় এ দেশে থাকবে না। ধর্মশিক্ষার জন্য আলাদা কোনো প্রতিষ্ঠানেরও প্রয়োজন নেই।

এরপর ১৯২৪ সালের ৩ মার্চ শিক্ষাব্যবস্থার একীভূতকরণ নিশ্চিত হয় এবং তা আইনে রূপান্তর করা হয়। নতুন প্রক্রিয়ার ফলে তুরস্কের সব বিদ্যালয়কে তাদের পাঠ্যক্রম জাতীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে হতো। এর পাশাপাশি সব ধর্মীয় বিষয় সরকারের ধর্মীয় বিভাগের আওতায় নিয়ে আসা হয়।

কামাল আতাতুর্ক তুরস্কে দুই ঈদের ছুটি বাতিল করে দেন। সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্রবারের পরিবর্তে রোববার নির্ধারণ করেন। তুরস্কের কেউ যেন হজে যেতে না পারে, সে জন্য তিনি কঠিন বিধিনিষেধ আরোপ করেন।

১৯২৫ সালে তিনি তুর্কি জাতিকে মধ্যপ্রাচ্যের পোশাক ত্যাগ করে আধুনিক ইউরোপীয় পোশাক পরতে আদেশ করেন। এর পাশাপাশি তিনি শিক্ষার্থী, সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য পোশাকের বিধিমালা তৈরি করেন।

মুস্তফা কামাল মনে করতেন, মাথায় ইউরোপীয় হ্যাট আধুনিক সভ্য জাতির প্রতীক। তিনি পাগড়ি, গেরুয়া টুপি, ইসলামি আদর্শের পোশাকের পরিবর্তে আধুনিক পশ্চিমা স্যুট ও নেকটাই এবং সঙ্গে হ্যাট পরতে সবাইকে আদেশ করতেন।

মুস্তফা কামাল আরবি বর্ণমালার পরিবর্তে ১৯২৮ সালে তুর্কি ভাষা লেখার জন্য ল্যাটিন বর্ণমালার ওপর ভিত্তি করে নতুন বর্ণমালা গঠনের বিষয়টি সামনে আনেন। এ সময় তুর্কি ভাষা বিশেষজ্ঞরা বলেন, এ জন্য তিন থেকে পাঁচ বছর সময় লাগতে পারে। তিনি আদেশ করে বলেন, সর্বোচ্চ পাঁচ মাসের মধ্যে এটি করতে হবে।

১৯২৮ সালের ১ নভেম্বর তুরস্কে নতুন তুর্কি বর্ণমালা চালু হয় এবং আরবি বর্ণমালার ব্যবহার বিলুপ্ত করা হয়। এ সময় জনগণের ১০ শতাংশ শিক্ষিত ছিল। তুর্কি ভাষায় আরবি বর্ণমালার ব্যবহার শিখতে প্রায় তিন বছর সময় লাগত।

১৯২৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর নতুন বর্ণমালা ব্যবহার করে তুরস্কে সর্বপ্রথম পত্রিকা প্রকাশিত হয়। নাগরিকদের নতুন পন্থা শিক্ষাদানের জন্য মুস্তফা কামাল নিজে তুরস্কের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সফর করেন।

Scanned with CamScanner

১৯৩২ সালের শুরুতে তুরস্কের বিভিন্ন শহরে পিপলস হাউস খোলা হয়, যাতে ৪ থেকে ৪০ বছর বয়সের মানুষ নতুন বর্ণমালা শিখতে পারে।

১৯৩১ সালে আলকুদসে অনুষ্ঠিত ইসলামি মহাসম্মেলনের বৈঠকে তুরস্ককে আমন্ত্রণ জানানো হলে মুস্তফা কামাল তা প্রত্যাখ্যান করে জানান, তুরস্ক একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ, ফলে কোনো ইসলামি বৈঠকে তিনি অংশ নেবেন না। একইভাবে যখন এশীয় দেশগুলোর বৈঠকে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়, তখনো তিনি জানিয়ে দেন, তুরস্ক এশিয়ার অন্তর্গত দেশ নয়, ফলে তিনি এ বৈঠকে যোগ দেবেন না।

মুস্তফা কামাল আতাতুর্কের চক্রান্তে আজারবাইজান দখল করে নেয় রাশিয়ান বাহিনী। আজারবাইজানের শাসকদের তিনি বোঝান, রাশিয়ার সৈন্যরা আজারবাইজান হয়ে তুরস্কের উদ্দেশে আসছে। এর আড়ালে তিনি আজারবাইজানকে রাশিয়ার কাছে বিক্রি করে দেন। রাশিয়ার সৈন্যরা আজারবাইজানে প্রবেশ করে আর বের হয়নি। তুরস্কের উদ্দেশেও তারা যায়নি।

ইংরেজদের প্রতি মুস্তফা কামাল আতাতুর্কের আনুগত্য এতটাই গভীর ছিল যে, মৃত্যুর আগে তাঁর উত্তরাধিকার হিসেবে তুরস্কের ভবিষ্যৎ কর্ণধার হওয়ার জন্য ব্রিটেনের রাষ্ট্রদূতকে মনোনীত করে যান তিনি। যে ইংরেজদের চক্রান্তে ৬২৪ বছরের উসমানি সাম্রাজ্য হারিয়ে গেল, সেই গোষ্ঠীর দূতকে তুরস্কের উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করার মতো ন্যক্কারজনক কাজ তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল।

মুস্তফা কামাল আতাতুর্কের ব্যক্তিজীবন

যাঁর হাতে উসমানি সাম্রাজ্যের পতন এবং বিলুপ্তি, ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন প্রচণ্ড ধর্মবিদ্বেষী। চারিত্রিক অশ্লীলতা ও লাম্পট্যে তিনি নৈতিকার সব সীমানা ভেঙে দিয়েছিলেন।

রাতভর মদ পানে মত্ত থাকা ছিল তাঁর নিত্যদিনের অভ্যাস। তুরস্কের প্রসিদ্ধ বারেক হোটেলের বারে এক রাতের শেষ প্রহরে নেশাগ্রস্ত মুস্তফা কামাল যখন ফজরের নামাজের আজানে মুহাম্মদ (সা.)-এর নাম শুনতে পেলেন, তখন তিনি উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। সঙ্গীদের উদ্দেশ করে তিনি বলতে থাকেন, এই লোক (মুহাম্মদ) নিজের নাম আজানে এমনভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছে, যাতে তাঁর নাম যুগ যুগ ধরে বারবার উচ্চারিত হতে থাকে। ওই বেটার কারণে আমাদের প্রসিদ্ধ হওয়ার পথ কোথায় আর!

Scanned with CamScanner

মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক তুরস্কের সর্বত্র আজান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তুর্কি ভাষা লেখার জন্য আরবি অক্ষর বাতিল করে ইংরেজি অক্ষরে লেখার নির্দেশ দেন। ধর্মকর্ম সম্পর্কে এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, যারা ধর্ম পালনে আগ্রহী, তারা যেন আরবির পরিবর্তে তুর্কি ভাষায় নামাজ ও অন্যান্য ইবাদত আদায় করেন। মসজিদ, আজান, নামাজসহ অন্যান্য ইবাদতের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ এতই কঠোর ছিল যে, তুরস্কের প্রসিদ্ধ আয়া সুফিয়া মসজিদে নামাজ আদায় বন্ধ করে সেটিকে জাদুঘর হিসেবে রূপান্তর করেন তিনি।

মুস্তফা কামালের স্ত্রীর নাম লতিফা খানম। স্বামীর মদপান ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিরক্ত হয়ে দূরে চলে গিয়েছিলেন এই নারী। তাঁর ভাষায়, মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক পুরুষ হিসেবে ছিলেন যৌনশক্তিহীন। নারীদের সঙ্গে সম্পর্কের বেলায় তিনি ছিলেন নপুংসক। অন্যদিকে তিনি একজন সমকামী পুরুষ ছিলেন। ওয়াদাদ বিন খালেদ নামের এক পুরুষের সঙ্গে কামাল আতাতুর্কের সমকামিতার সম্পর্ক ছিল বলে অভিযোগ করেন তাঁর স্ত্রী।

ওয়াদাদের সঙ্গে তাঁর স্বামীকে অন্তরঙ্গ অবস্থায় দেখে তিনি তাঁকে বলেছিলেন, 'তোমার সব অন্যায় ও অনৈতিকতা আমি সহ্য করেছি। কিন্তু আমার স্বামী হয়ে তুমি অন্য একজন পুরুষের সঙ্গে যৌনকর্ম করবে, তা আমি মেনে নিতে পারছি না।'

মুস্তফা কামাল আতাতুর্কের পিতৃপরিচয় সম্পর্কে রহস্য ছড়িয়ে আছে। তিনি নিজেও কোনো দিন তাঁর পিতা সম্পর্কে কিছু বলেননি। ফলে অনেক ঐতিহাসিক তাঁকে 'হারামজাদা' বা অবৈধ সন্তান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

নিজের শ্যালিকার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি পড়েছিল মুস্তফা কামালের। জোর করে একবার তাকে আটকাতে গেলে দৌড়ে পালিয়ে যায় মেয়েটি। নিজের বোনের কাছে আশ্রয় নেয় সে। যৌন নেশায় উন্মত্ত মুস্তফা কামাল পিস্তল হাতে ওই কামরায় ঢুকে পড়েন। তাঁর স্ত্রী নিজের বোনকে আড়াল করে স্বামীর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। গৃহপরিচারক বকর দৌড়ে এসে মুস্তফা কামালের হাত ধরে ফেলে। গুলির হাত থেকে বেঁচে যান তাঁর স্ত্রী ও বোনটি।

তুরস্কের বিভিন্ন ছাত্রীনিবাস থেকে সুন্দরী কিশোরীদের ধরে নিয়ে আসা হতো মুস্তফা কামালের মনোরঞ্জনের জন্য। এ কাজে তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী তওফিক রুশদি বিশেষভাবে সহযোগিতা করতেন। দিনের বেলা যিনি মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন, রাত হলেই তিনি মুস্তফা কামালের দালাল হিসেবে তাঁর যৌনপিপাসা মেটাতে নারীদের সংগ্রহ করতেন।

Scanned with CamScanner

স্ত্রীর সঙ্গে সুখী সংসার জোটেনি মুস্তফা কামালের ভাগ্যে। তাঁর প্রাসাদে তিনি পুষতেন ২০-৩০ জন সুন্দরী। তাঁদের তিনি নিজের কন্যা বলে পরিচয় দিতেন। রাত হলেই জেগে উঠত মুস্তফা কামালের খাসকামরা। সুন্দরী ললনাদের অর্ধনগ্ন নৃত্যে মদের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে নেশার ঘোরে হারিয়ে যেতেন তিনি। শুধু কিশোরী বা তরুণীরা নয়, সুশ্রী বালকদের ডেকে এনে তাদের গায়ে মেয়েদের পোশাক পরিয়ে দেওয়া হতো। নিজের যৌনলালসা মেটাতে কোনো ইচ্ছা অপূর্ণ রাখেননি মুস্তফা কামাল।

আধুনিক তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা হয়ে এভাবেই অনিয়ন্ত্রিত মদপান, যৌনাচার এবং ভোগের সাগরে ডুবে থাকতেন মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক। জীবনযাপনে এমন উচ্ছৃঙ্খল বাড়াবাড়ি তাঁর বিপদ ডেকে আনে। এক কঠিন রহস্যঘেরা অসুখে আক্রান্ত হয়ে পড়েন মুস্তফা কামাল।

তাঁর সারা শরীরে ছোট ছোট পিঁপড়া ছড়িয়ে পড়ে। আকারে এ পিঁপড়াগুলো এতই ক্ষুদ্র ছিল যে, খালি চোখে তা দেখা যেত না। এর ফলে চেহারা এবং শরীরজুড়ে চুলকাতে হতো তাঁকে সব সময়। প্রাসাদের সর্বত্র শক্তিশালী কীটনাশক প্রয়োগ করেও এই পিঁপড়া দমনের কোনো সমাধান হচ্ছিল না। বরং যতই দিন গড়াচ্ছিল, ততই তাঁর সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এ ক্ষুদ্র পিঁপড়ার যন্ত্রণা অসহনীয় হয়ে উঠছিল।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞরা এ পিঁপড়া নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। জানা গেল, এ প্রজাতির উৎপত্তিস্থল সুদূর চীনে। কোন পথ পাড়ি দিয়ে তারা ইউরোপের তুরস্কে, তা কেউ জানে না। সামরিক বাহিনীর অত্যাধুনিক যন্ত্র ও সরঞ্জাম দিয়ে পুরো প্রাসাদ ধুয়েমুছে পরিষ্কার করেও কোনো ফল হচ্ছিল না। তীব্র যন্ত্রণায় মুস্তফা কামালের আর্তচিৎকার প্রাসাদে নরকের পরিবেশ তৈরি করে।

এ চিকিৎসা চলাকালে মুস্তফা কামালের শরীরে অন্য আরেকটি অসুখ ধরা পড়ে। তাঁর অন্ত্র কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়। সুচ ব্যবহার করে পেট থেকে সব পানি বের করার নতুন যন্ত্রণা যোগ হয় তাঁর জীবনে। গলা ফাটিয়ে মুস্তফা কামাল চিৎকার করে তাঁর চিকিৎসকদের বলেন, 'আমার পেট থেকে সব পানি বের করে ফেলো, এক ফোঁটা পানিও যেন না থাকে।'

১৯৩৮ সালের ১০ নভেম্বর মুস্তফা কামাল আতাতুর্কের মৃত্যু হয়। জীবদ্দশায় তিনি নামাজ ও অন্যান্য ইবাদতের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ফলে তাঁর মৃত্যুর পর জানাজা হবে কি না, এ নিয়ে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

Scanned with CamScanner

সেকালের প্রধানমন্ত্রী জানাজার বিপক্ষে মত ব্যক্ত করেন। কিন্তু অন্য পদস্থ নেতারা জানাজার পক্ষে তাঁদের মতামত জানান।

মুস্তফা কামাল আতাতুর্কের জানাজার নামাজ পড়ান ওয়াকফ বিভাগের প্রধান শরফুদ্দীন আফেন্দি। এই ব্যক্তি ইসলামের ক্ষতিসাধনে মুস্তফা কামাল আতাতুর্ককেও হার মানিয়েছিলেন। কোরআন শরিফের তুর্কি অনুবাদকে তিনি ইবাদতের ভাষা হিসেবে ঘোষণা করেন। আইনের ক্ষমতাবলে বিভিন্ন মসজিদে তুর্কি ভাষায় তেলাওয়াত ও নামাজ আদায়ের সরকারি আদেশ জারি করান এই আফেন্দি।

মুস্তফা কামাল আতাতুর্কের মৃতদেহ তিন দিন সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য রাখা হয়। এ সময় প্রবল ভিড়ে ১৪ জন দর্শনার্থী মারা যান। জীবদ্দশায় তাঁর কোনো সন্তান জন্ম হয়নি।

Scanned with CamScanner

আব্বাসি খেলাফতের সমাপ্তি ও উসমানি খেলাফতের সূচনা

উসমানি সাম্রাজ্যের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো ইতিহাস বেশ কয়েকটি পর্বে বিভক্ত। তবে মুসলিম বিশ্বের কাছে গ্রহণযোগ্য সর্বজনীন সালতানাত বা মুসলিম সাম্রাজ্য হিসেবে উসমানিদের যাত্রা শুরু হয় মূলত ৭৯৭ হিজরিতে, তথা ১৩৯৪ সালে।

উসমানি রাজ্যের শাসক তখন সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদ। একই সময়ে মিসরে আব্বাসি খলিফা হিসেবে মুসলিম জাহানের খলিফা ছিলেন আলমুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ। সুলতান বায়েজিদ উসমানি সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে বিপুল উপঢৌকন ও উপহার পাঠান আব্বাসি খলিফা আলমুতাওয়াক্কিলের কাছে। তিনি আব্বাসি খলিফার কাছ থেকে উসমানি সাম্রাজ্যের অনুমোদন কামনা করেন। খলিফা আলমুতাওয়াক্কিল নতুন এই ইসলামি সাম্রাজ্যের অনুমোদন দেন।

৯২২ হিজরির ২৯ জিলহজ বা ১৫১৭ সালের ২৩ জানুয়ারি উসমানি সেনাবাহিনী যখন মামালিকদের পরাজিত করে তাদের শাসিত অঞ্চল দখল করে নেয়, তখন থেকেই জুমার খুতবায় উসমানি সুলতানের নাম অন্তর্ভুক্ত করে পাঠ করার আদেশ জারি করা হয়। একই সময়ে উসমানি সুলতানের নামে নতুন মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়।

কায়রো জয়ের পর উসমানি সুলতান প্রথম সেলিম বিজয় মিছিল নিয়ে কায়রোয় প্রবেশ করেন ৯২৩ হিজরির ৩ মহররম বা ১৫১৭ সালের ২৩ জানুয়ারি। সদ্য বিলুপ্ত আব্বাসি খলিফা ও নগরীর বিচারকেরা নবাগত উসমানি সুলতানের বিজয় মিছিলে শরিক হয়ে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।

সুলতান প্রথম সেলিমের কায়রো জয়ের পর মিসরে সর্বশেষ আব্বাসি খলিফা আলমুতাওয়াক্কিল আনুষ্ঠানিকভাবে খেলাফতের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেন। মিসর থেকে তিনি সুলতান সেলিমের সঙ্গে ইস্তাম্বুলে যান এবং আয়া

Scanned with CamScanner

সুফিয়া মসজিদে এক জমকালো অনুষ্ঠানে উসমানি সুলতান সেলিমের হাতে খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করেন।

পরে আবু আইয়ুব আনসারি মসজিদে উসমানি সুলতান সেলিমকে তিনি মুসলিম জাহানের খলিফা উপাধি দিয়ে খেলাফতের আনুষ্ঠানিক পোশাক পরিয়ে দেন এবং গলায় তলোয়ার ঝুলিয়ে দেন। আনুষ্ঠানিকভাবে এই দায়িত্ব অর্পণের মধ্য দিয়ে উসমানিরা মুসলিম জাহানের খলিফা হিসেবে নতুন ধারাবাহিক যাত্রার সূচনা করে। একই সঙ্গে সমাপ্তি ঘটে আব্বাসি খেলাফতের গৌরবময় অধ্যায়ের।

সুলতান সেলিমের শাসনামলে উসমানি সাম্রাজ্য পরিণত হয় মুসলিম বিশ্বের নতুন কেন্দ্রবিন্দুতে। উসমানি সুলতানরা তখন থেকে নিজেদের নামের আগে খলিফা উপাধি যোগ করেন।

কনস্টান্টিনোপল বিজয়

১৪০০ সালের শেষের দিকে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল শহরের আশপাশে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ শহর জয় করে উসমানি বাহিনী। একপর্যায়ে তারা কনস্টান্টিনোপলের দিকে মনোযোগ দেয়। কারণ, এই সুরক্ষিত শহরটি জয় করতে পারলে ইউরোপে উসমানিদের প্রবেশে আর কোনো বাধা থাকবে না। ফলে নতুন এক অধ্যায় যোগ হবে উসমানি সাম্রাজ্যের অগ্রযাত্রায়।

উসমানি সুলতানদের মধ্যে সর্বপ্রথম সুলতান মুরাদ কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করেছিলেন। কিন্তু তিনি সফল হননি। পরে সুলতান বায়েজিদ তাঁর সৈন্যদের নিয়ে আবারও এই শহর অবরোধ করেন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। এরপর ১৪২২ সালে সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করেন। কিন্তু এবারও সফল হতে পারেনি উসমানি সেনাবাহিনী। অধরা রয়ে যায় বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই শহর।

১৪৫৩ সালের ৬ এপ্রিল সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ আলফাতেহ গভীর পরিকল্পনা ও শক্তিশালী সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে ঘেরাও করেন কনস্টান্টিনোপল। দুই মাসের দীর্ঘ অবরোধের পর ২৯ মে শহরের ভেতর প্রবেশ করতে সক্ষম হয় উসমানি সৈন্যরা।

Scanned with CamScanner

এই জয়ের মাধ্যমে প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে টিকে থাকা রোমান সাম্রাজ্যের শেষ অধ্যায় রচিত হয়। ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যায় প্রবল প্রতাপশালী বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের নাম। শুরু হয় উসমানিদের একচ্ছত্র আধিপত্যের সোনালি অধ্যায়।

উসমানি সাম্রাজ্যের সবচেয়ে গৌরবজনক এই বিজয়ের পর সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ শহরটির নাম রাখেন ইসলামবুল বা ইসলামের শহর হিসেবে। পরে কালের বিবর্তনে তা ইস্তাম্বুলে পরিণত হয়। এমন বিজয়ের কারণে ইতিহাসে সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ 'আলফাতেহ' বা বিজেতা উপাধিতে আজও প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন।

Scanned with CamScanner

উসমানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল

পৃথিবীর ইতিহাসে উসমানি সাম্রাজ্যের মতো সুবিস্তৃত পরিধি ও দীর্ঘমেয়াদি ব্যাপ্তি অন্য কোনো ইসলামি খেলাফত বা মুসলিম সাম্রাজ্যের ভাগ্যে জোটেনি।

সুদীর্ঘ ৬২৪ বছর ধরে টিকে থাকা উসমানি সাম্রাজ্যের সোনালি যুগে এর সীমানা যত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, তা উসমানি সাম্রাজ্যের পতনের পর বর্তমানে ৪৮টি দেশে পরিণত হয়েছে। এ দেশগুলো হলো :

১. আবখাজিয়া
২. আলবেনিয়া
৩. আলজেরিয়া
৪. আর্মেনিয়া
৫. অস্ট্রিয়া
৬. আজারবাইজান
৭. বাহরাইন
৮. বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা
৯. বুলগেরিয়া
১০. ক্রোয়েশিয়া
১১. সাইপ্রাস
১২. মিসর
১৩. ইরিত্রিয়া
১৪. জর্জিয়া
১৫. গ্রিস
১৬. হাঙ্গেরি
১৭. ইরান
১৮. ইরাক

Scanned with CamScanner

১৯. ইসরায়েল
২০. জর্ডান
২১. কসোভো
২২. কুয়েত
২৩. লেবানন
২৪. লিবিয়া
২৫. মেসিডোনিয়া
২৬. মলদোভা
২৭. মন্টেনিগ্রো
২৮. নার্গোনো কারবাখ প্রজাতন্ত্র
২৯. উত্তর সাইপ্রাস
৩০. ওমান
৩১. ফিলিস্তিন
৩২. কাতার
৩৩. রোমানিয়া
৩৪. রাশিয়া
৩৫. সৌদি আরব
৩৬. সার্বিয়া
৩৭. স্লোভাকিয়া
৩৮. সোমালিয়া
৩৯. সোমালিল্যান্ড
৪০. দক্ষিণ ওশেটিয়া
৪১. সুদান
৪২. সিরিয়া
৪৩. তিউনিসিয়া
৪৪. ত্রান্সিনিস্ত্রিয়া
৪৫. তুরস্ক
৪৬. আরব আমিরাত
৪৭. ইউক্রেন
৪৮. ইয়েমেন

এ ছাড়া ইরাক ও সিরিয়ার কিছু অংশ নিয়ে সদ্য গঠিত ইসলামিক স্টেট।

Scanned with CamScanner

একনজরে উসমানি সাম্রাজ্য

রাজধানী :	সোগোত : (১২৯৯-১৩৩৫)
	বোর্সা : (১৩৩৫-১৩৬৩)
	আদিরনা (এডির্ন) : (১৩৬৩-১৪৫৩)
	ইস্তাম্বুল (কনস্টান্টিনোপল) : (১৪৫৩-১৯২২)
রাষ্ট্রীয় ধর্ম :	ইসলাম
সাম্রাজ্যের মেয়াদ :	৬২৪ বছর
শাসনব্যবস্থা :	খেলাফত (রাজতন্ত্র)
সর্বোচ্চ পদবি :	সুলতান
রাষ্ট্রীয় ভাষা :	তুর্কি উসমানি
প্রথম সুলতান :	প্রথম উসমান (১২৯৯-১৩২৬)
শেষ সুলতান :	ষষ্ঠ মুহাম্মদ (১৯১৮-১৯২২)
প্রথম খলিফা পদবিধারী :	প্রথম মুরাদ (১৩৬২-১৩৮৯)

সর্বশেষ খলিফা পদবিধারী : দ্বিতীয় আব্দুল মজিদ (১৯২২-১৯২৪)

প্রথম উজিরে আজম (ছদরে আজম) : আলাউদ্দিন পাশা (১৩২০-১৩৩১)

সর্বশেষ উজিরে আজম : আহমদ তওফিক পাশা (১৯২০-১৯২২)

উসমানি সাম্রাজ্যের প্রথম দিন

সুনির্দিষ্ট কোন তারিখে উসমানি সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হয়েছিল, এ তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের দুটি মত রয়েছে। তবে দুটো মতামতই কাছাকাছি হওয়ায় এ নিয়ে অযথা বিতর্কের অবকাশ নেই।

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের কাছে সঠিক মতটি হলো, ৬৯৯ হিজরির ৪ জমাদিউল আউয়াল থেকে উসমানি সাম্রাজ্যের যাত্রা শুরু হয়। সুলতান দ্বিতীয়

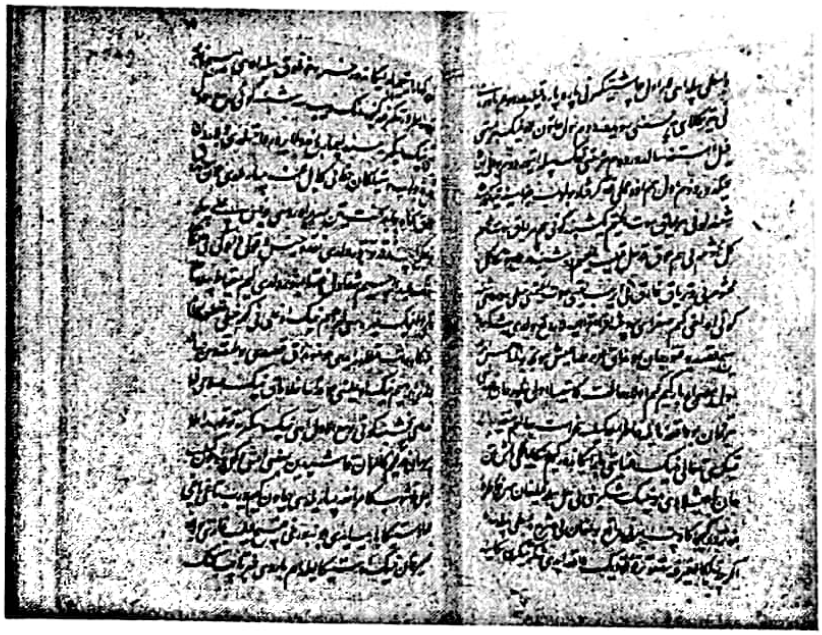
Scanned with CamScanner

আব্দুল হামিদের শাসনামলে বিভিন্ন গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এ তারিখ নির্ধারিত হয় এবং এর অনুমোদন দেওয়া হয়।

সুতরাং, ৬৯৯ হিজরির ৪ জমাদিউল আউয়াল তথা ১৩০০ সালের ২৭ জানুয়ারি উসমানি সাম্রাজ্যের সূচনা দিবস হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত।

উসমানি সাম্রাজ্যের ব্যাপ্তি

উসমানি সাম্রাজ্যের ইতিহাসকাল ৬৯৯ হিজরি থেকে ১৩৪৪ হিজরি পর্যন্ত বিস্তৃত। ইংরেজি বছর হিসাবে এর মেয়াদকাল ১৩০০ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত।



উসমানি ভাষা

আজকের তুর্কি ভাষা মূলত উসমানি ভাষা। তবে উসমানি সাম্রাজ্যে ব্যবহৃত এই ভাষা লেখা হতো আরবি অক্ষরে। ১৯২৮ সালের পর উসমানি ভাষা আরবির পরিবর্তে ইংরেজি অক্ষরে লেখা শুরু হয়। যুগের পরিবর্তনে তুর্কি ভাষায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। হারিয়ে গেছে উসমানিদের ব্যবহৃত অনেক শব্দ, পরিভাষা ও প্রবাদ-প্রবচন।

উসমানি সুলতানদের শাসনামলে উসমানি তুর্কি ভাষায় অনেক আরবি ও ফারসি শব্দের সংমিশ্রণ ছিল। তবে ইংরেজি অক্ষরে তুর্কি ভাষা লেখা শুরু হওয়ার পর থেকে এসব শব্দ কমে যেতে থাকে। বর্তমানে গড়ে একজন

Scanned with CamScanner

তুর্কিভাষী প্রতিদিন ১১২টি আরবি শব্দ ব্যবহার করেন। অথচ উসমানি সাম্রাজ্যে একজন মানুষ প্রতিদিন যেসব কথাবার্তা বলত, তাতে গড়ে এক হাজারের বেশি আরবি ও ফারসি শব্দ থাকত।

তুর্কি ভাষার এই অক্ষরবিপ্লবের ফলে উসমানি সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস ও ঐতিহাসিক দলিলপত্র পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তুরস্কবাসী। বর্তমানে তুরস্কের অনেক গবেষণা প্রতিষ্ঠান আবারও আরবি অক্ষরে লিখিত তুর্কি ভাষা শেখা ও চর্চার উদ্যোগ গ্রহণ করছে।

উসমানি সাম্রাজ্যের উত্থান

উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান প্রথম উসমান থেকে শুরু করে সুলতান সুলায়মান আলকানুনির শাসনকাল পর্যন্ত উসমানি সাম্রাজ্যের উত্থান-পর্ব হিসেবে পরিচিত। ইংরেজি সালের হিসাবে এই উত্থান-পর্বের মেয়াদ ১২৮৯ থেকে ১৫৭৪ সাল পর্যন্ত। আর হিজরি বর্ষ হিসাবে এর ব্যাপ্তি ৬৮৮ থেকে ৯৮২ হিজরি পর্যন্ত।

এই ২৮৫ বছর ধরে তৎকালীন বিশ্বে উসমানি সাম্রাজ্য ছিল একমাত্র পরাশক্তি ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিপতি। ইউরোপের বেশির ভাগ অঞ্চল তখন উসমানি সুলতানদের শাসনাধীন ছিল। ইউরোপের বিভিন্ন খ্রিষ্টান রাজ্য নিয়মিত কর পরিশোধ করত উসমানি সুলতানদের দরবারে। ইস্তাম্বুল থেকে যেসব সুলতানি ফরমান জারি করা হতো, বিনা বাক্য ব্যয়ে সেসব মেনে নিতেন ইউরোপীয় গভর্নররা।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এই পর্বের শাসক সুলতানরা ছিলেন সাহসী ও নিষ্ঠাবান। সামরিক যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁরা উপস্থিত থাকতেন এবং সাধারণ সৈন্যদের মতো যুদ্ধে অংশ নিয়ে রণাঙ্গনে নেতৃত্ব দিতেন। তাঁদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও দূরদর্শী নেতৃত্বের গুণে অকল্পনীয়ভাবে উসমানি সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটে, ক্রমে ক্রমে যা তিন মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

ইস্তাম্বুল বিজয়ের মধ্য দিয়ে ইউরোপে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দেওয়ার পথ সুগম হওয়ার পাশাপাশি সেকালের বিশ্বে নতুন পরাশক্তি হিসেবে উসমানিদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আলোর পথে যাত্রা শুরু করে ইউরোপীয় অঞ্চল।

এরপর আনাতোলিয়া এবং পূর্ব ইউরোপীয় অঞ্চল থেকে ক্রমশ উসমানিদের অগ্রযাত্রা চারপাশে বিস্তৃত হতে থাকে। আরব ও অনারব মুসলিম

Scanned with CamScanner

দেশগুলোর পাশাপাশি ইউরোপের খ্রিষ্টান অঞ্চলগুলোও উসমানি মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত হয় ধীরে ধীরে। এসব দেশ, রাজ্য ও অঞ্চলগুলোকে ইসলামি খেলাফত শাসনব্যবস্থার অধীনে নিয়ে এসে সুবিশাল উসমানি সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে বিশ্ব ভূখণ্ডে।

১৫১৬ সালে সুলতান প্রথম সেলিমের শাসনামলে শাম অঞ্চল উসমানিদের আওতায় আসে। এরপর ১৫১৭ সালে মিসর জয় করেন এই সুলতান। পর্যায়ক্রমে বায়তুল মুকাদ্দাসসহ হেজাজের মক্কা-মদিনা অন্তর্ভুক্ত হয় উসমানিদের শাসনসীমানায়।

এ সময় মক্কার তৎকালীন শাসক উসমানি সুলতানের কর্তৃত্ব মেনে নেন। মদিনা থেকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে আসা হয় ইস্তাম্বুলে। ফলে মুসলিম বিশ্বের খলিফা হিসেবে উসমানি সুলতানদের পরিচয়ে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ হয়।

১৫৩৪ সালে সুলতান সুলায়মান ইরাক জয় করেন। এর মধ্য দিয়ে উসমানি সাম্রাজ্যের সুবিস্তৃত পূর্ব প্রান্ত সুরক্ষিত হয় বিদেশি শত্রুর আক্রমণ থেকে। উসমানি সুলতানদের শৌর্যবীর্য ও উসমানি সেনাবাহিনীর বীরত্বের নানা গল্প ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার দেশে দেশে।

উসমানি সাম্রাজ্যের স্থবিরতা

প্রবল প্রতাপশালী সুলতান সুলায়মানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সুলতান দ্বিতীয় সেলিম যখন উসমানি সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন থেকে উসমানিদের অগ্রযাত্রার গতি ধীর হয়ে আসে।

এর আগে মূলত সুলতান সুলায়মান আলকানুনির শাসনামলের শেষ বছরগুলোয় সাম্রাজ্যের ভেতর বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ে। এ অবস্থা চলে সুলতান দ্বিতীয় মুস্তফার শাসনামলের শেষ পর্যন্ত।

বর্ষপঞ্জির পাতায় উসমানি সাম্রাজ্যের স্থবিরতার মেয়াদকাল ১৫৬৬ থেকে ১৭০৭ সাল পর্যন্ত ধরা হয়। আরবি হিজরি হিসেবে ৯৭৪ থেকে ১১১৫ হিজরি পর্যন্ত এই স্থবিরতা পর্ব ব্যাপ্ত।

স্থবিরতার এই সময়ে উসমানি সুলতানদের প্রভাব ধীরে ধীরে কমতে থাকে। সাম্রাজ্য পরিচালনায় ছদরে আজমদের তৎপরতা বেড়ে যায়। একই সময়ে উসমানি সেনাবাহিনীতেও নানা বিশৃঙ্খলা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সময়ের পরিবর্তনে জৌলুশ হারাতে শুরু করে উসমানি সাম্রাজ্য।

Scanned with CamScanner

উসমানি সাম্রাজ্যের পতন

উসমানি সাম্রাজ্যের পতনের করুণ অধ্যায় শুরু হয় সুলতান তৃতীয় আহমদের শাসনকাল থেকে। ইতিহাসের পাতায় তখন ১৭০৩ সাল বা ১১১৫ হিজরি।

এ সময় দিনে দিনে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল। একের পর এক পরাজয়ে ছোট হয়ে আসে উসমানি সাম্রাজ্যের মানচিত্র। অভ্যন্তরীণ কোন্দল ছড়িয়ে পড়ে দরবারঘনিষ্ঠ লোকদের মধ্যে। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে অস্থিরতা। দরবারে সভাসদদের একে অন্যের প্রতি অবিশ্বাস ও অনাস্থায় সুযোগ পায় ইউরোপের খ্রিষ্টানশক্তিগুলো। বহির্বিশ্বের নানামুখী ষড়যন্ত্রের পরিণতিতে উসমানি সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতন ঘনিয়ে আসে ১৯২২-১৯২৪ সালের মধ্যবর্তী সময়ে।

নতুন দেশ জয় বা মানচিত্রের পরিধি বিস্তার দূরের কথা, বরং এই সময়ে নিজেদের বৃত্তেই অসহায় হয়ে পড়েন উসমানি সুলতানরা। সাম্রাজ্যের ভেতর ও বাইরে শুরু হয় বহুমুখী ষড়যন্ত্র ও ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্ব। এমন জটিল প্রেক্ষাপটে উসমানি সাম্রাজ্যের কফিনে সর্বশেষ পেরেক ঠুকে দেয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এর পরিণতিতে বাড়তে থাকে আর্থিক দেনা এবং বহির্বিশ্বের চাপ। পাশাপাশি এ দুঃসময়ে ভিনদেশি শত্রুদের কৌশলে ধর্মবিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে তুরস্কবাসীর মনে।

একদল বিশ্বাসঘাতক ও লোভী নেতার কবলে বন্দী হয়ে পড়ে উসমানি পরিবার। চারপাশের ষড়যন্ত্র ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তের কঠিন জাল ভেদ করা তখন অসাধ্য হয়ে পড়ে। শত শত বছর ধরে যাঁদের অবস্থান ছিল সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভক্তির সর্বোচ্চ আসনে, তাঁরা সাধারণ মানুষের কাছে পরিণত হন কেবলই ঘৃণার পাত্রে। খুব দ্রুত পতনের দিকে এগিয়ে যায় উসমানিদের ভবিষ্যৎ।

একপর্যায়ে রাতের অন্ধকারে শত শত বছরের পূর্বসূরিদের ভূমি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় উসমানি পরিবারের সর্বশেষ খলিফা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের। এই পতন ও বিতাড়ন-প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে মূল ভূমিকা পালন করে তৎকালীন ব্রিটেন, ইহুদি শক্তি এবং তুরস্কে গড়ে ওঠা নতুন নাস্তিক চক্রটি।

উসমানি সাম্রাজ্যের প্রশাসন

উসমানি সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় সর্বোচ্চ পদ ছিল 'সুলতান'। শাসন পরিচালনা থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কাজকর্ম এবং রাজনৈতিক ও সামরিক

Scanned with CamScanner

কর্মকাণ্ডে সুলতানের কথা চূড়ান্ত ও অলঙ্ঘনীয় আদেশ হিসেবে বিবেচিত হতো। উসমানি ইতিহাসে সর্বপ্রথম 'সুলতান' উপাধি ধারণ করেন উসমান বিন আরতুগরুল।

সুলতানের পর সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদ ছিল 'ছদরে আজম'। এটি বর্তমান সময়ের প্রধানমন্ত্রী সমমর্যাদার পদবি হিসেবে বিবেচিত হতো। দেওয়ানি কর্মকাণ্ড ও সুলতানের সহযোগী হিসেবে ছদরে আজমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

ছদরে আজমের পর দেওয়ানের অবস্থান। দেওয়ানের সদস্যরা মন্ত্রী পদমর্যাদায় ভূষিত হতেন এবং সাম্রাজ্য পরিচালনায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দায়িত্ব পালন করতেন।

উসমানি সাম্রাজ্যের রাজ্যগুলো স্বায়ত্তশাসিত ছিল। সুলতানের পক্ষ থেকে নিযুক্ত শাসক 'পাশা' উপাধি ধারণ করে শাসন করতেন প্রতিটি রাজ্য, প্রদেশ বা প্রশাসনিক অঞ্চল। 'পাশা'দের কাজ ছিল কর সংগ্রহ করা, নিজ অঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া।

Scanned with CamScanner

উসমানি সাম্রাজ্যে ছদরে আজম

উসমানি সাম্রাজ্যের প্রথম রাজধানী ছিল সোগোত। ১৩২৬ সালে দ্বিতীয় উসমানি সুলতান উরখান যখন বোর্সা জয় করেন, তখন সোগোত থেকে রাজধানী বোর্সায় স্থানান্তর করা হয়। তুরস্কের অন্যতম শহর হিসেবে বোর্সার অবস্থান ছিল সেকালে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উসমানিদের শাসিত অঞ্চল তখনো সাম্রাজ্যে রূপ নেয়নি। বরং বলা চলে, কয়েকটি অঞ্চল নিয়ে গঠিত একটি রাজ্য, যা প্রতিনিয়ত চারপাশে বিস্তৃত হচ্ছিল। এই ক্রমবর্ধমান রাজ্যের নতুন রাজধানী হিসেবে বোর্সা শহর বেছে নেন সুলতান উরখান। এরপর একটি সুবিন্যস্ত রাষ্ট্রীয় কাঠামো তৈরি হয় উসমানিদের।

ধীরে ধীরে রাজ্য পরিচালনায় প্রয়োজনীয় পদ ও পদবির সৃষ্টি হয়। গড়ে তোলা হয় বিভিন্ন দপ্তর, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনিক স্তরবিন্যাস।

উসমানি সাম্রাজ্যে সুলতানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ ছদরে আজম হিসেবে কাউকে মনোনীত করা বা এ পদ থেকে বরখাস্ত করার একমাত্র ক্ষমতা ছিল কেবল সুলতানের। তিনি ছাড়া দরবারের দেওয়ান অথবা মজলিসের কেউ ছদরে আজমের ওপর প্রভাব ফেলতে পারতেন না।

ধারণা করা হয়, শুরুর দিকে এ পদে সমাসীন ব্যক্তিকে 'উজিরে আজম' হিসেবে সম্বোধন করা হতো। তবে সুলতান প্রথম মুরাদের শাসনামলে এ পদবি 'ছদরে আজম' হিসেবে বদলে যায়। সর্বপ্রথম ছদরে আজম উপাধিতে এ পদে দায়িত্ব পালন করেন খায়রুদ্দীন পাশা। এ ছাড়া আরও অন্যান্য উপাধিতেও এ পদে সমাসীন ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হতো। যেমন ওয়াকিল মুতলাক, ছাহেবুদ দওলা ও সরদারে আজম।

উসমানি সাম্রাজ্যে ছদরে আজম যেসব দায়িত্ব পালন করতেন, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে সুলতান রাজধানীর বাইরে কোথাও অবস্থান করলে তাঁর পক্ষে রাজ্য বা সাম্রাজ্য পরিচালনার প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করা, সুলতানের নির্দেশে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে যুদ্ধে সামরিক বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া,

Scanned with CamScanner

সুলতানকে প্রশাসনিক বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে সুলতানের সহযোগী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা, সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং দেওয়ান পরিচালনা করা, সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় সম্পর্ক বজায় রাখতে সব অঞ্চল ও প্রদেশের শাসকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, সেনাবাহিনীর সার্বিক বিষয় তদারক করা এবং সেনাপ্রধান নিয়োগ বা বরখাস্ত করা, সাম্রাজ্যের বার্ষিক বাজেট তৈরি ও সুলতানের কাছে উপস্থাপন করা ইত্যাদি।

উসমানি সুলতানরা ছদরে আজম হিসেবে মনোনীত ব্যক্তিকে সমীহ করতেন। সাম্রাজ্যের কেউ এমনকি শায়খুল ইসলামও ছদরে আজমের কাজে বাধা দেওয়া বা তাঁর কাজে কোনো প্রভাব ফেলতে পারতেন না। ছদরে আজমের জন্য সার্বক্ষণিক নিরাপত্তাব্যবস্থা থাকত। ৬২৪ বছরের বেশি সময় ধরে উসমানি সাম্রাজ্যের ছদরে আজমরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

যোগ্য ছদরে আজমের দক্ষ নেতৃত্বের বদৌলতে যুগে যুগে উসমানি সাম্রাজ্যের অগ্রযাত্রা অব্যাহত ছিল। এমনকি সাম্রাজ্যের শীর্ষ সিংহাসনে যখন অযোগ্য ব্যক্তি সুলতান হিসেবে সমাসীন, তখনো যোগ্য ছদরে আজমের কল্যাণে উসমানি সাম্রাজ্য টিকে ছিল স্বমহিমায়। আবার ছদরে আজম যখন নিজ স্বার্থ আদায়ে ন্যায়ভ্রষ্ট হতেন, তখন স্বয়ং সুলতানও সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলা সামাল দিতে পারতেন না। উসমানি সাম্রাজ্যের ইতিহাসে তাই অনেক ছদরে আজম আজও তাঁদের নিষ্ঠা, যোগ্যতা ও দক্ষতার মহিমায় অমর হয়ে আছেন, তেমনি কোনো কোনো ছদরে আজম তাঁদের বিশ্বাসঘাতকতা ও অনৈতিকতার দায়ে নিন্দিত হয়ে আছেন।

অনেকেই ভেবে থাকেন, উসমানি সাম্রাজ্য তুর্কি জাতির একক অর্জন হিসেবে সুদীর্ঘ সময় ধরে টিকে ছিল। যদিও সত্য যে, উসমানি সুলতানদের সবাই ছিলেন তুর্কি বংশোদ্ভূত। কিন্তু যুগে যুগে উসমানি দরবারের ছদরে আজম, সেনাবাহিনীর প্রধানসহ বিভিন্ন অঙ্গনে তুর্কি ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলের অনেকে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁদের মেধা, শ্রম ও সাফল্য উসমানি সাম্রাজ্যের জয়যাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ জয়ের পর সেখানকার যেসব নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতেন, যোগ্যতা অনুযায়ী উসমানি সুলতানরা তাঁদের বিভিন্ন পদে নিয়োগ দিতেন। উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা উসমান বিন আরতুগরুলের শাসনামলে সেকালের একজন রোমান শাহজাদা কোসা মিখাইল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। সুলতান

Scanned with CamScanner

উসমান তখন তাঁকে সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেন। কোসা মিখাইলের পরবর্তী প্রজন্ম যুগ যুগ ধরে উসমানি সাম্রাজ্যের বিস্তার ও সমৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে।

উসমানি সাম্রাজ্যের প্রসিদ্ধ ছদরে আজমদের মধ্যে আপন কীর্তি ও প্রতিভায় আজও অমর হয়ে আছেন যে কয়েকজন, তাঁদের মধ্যে সকুলু মুহাম্মদ পাশা অন্যতম। তাঁর পরিবার সার্বীয় বংশোদ্ভূত খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারী ছিল। সেখান থেকে তিনি উসমানি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন।

মুহাম্মদ পাশা দীর্ঘ ১৪ বছর উসমানি সাম্রাজ্যের ছদরে আজম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি একাধারে তিন সুলতানের শাসনামলে এ গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাসীন ছিলেন। তাঁরা হলেন সুলতান সুলায়মান, সুলতান দ্বিতীয় সেলিম ও সুলতান তৃতীয় মুরাদ।

বোর্সা শহরে নিযুক্ত বাইজেন্টাইন নেতা আফ্রিনুস যখন উসমানিদের হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, তখন উসমানি সুলতান উরখান তাঁকে সামরিক বাহিনীর নেতা হিসেবে নিয়োগ দেন। বংশপরম্পরায় আফ্রিনুসের ছেলে আলি বিন আফ্রিনুসসহ অন্য সদস্যরাও উসমানি সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনীতে অসামান্য ভূমিকা রাখেন।

একইভাবে বসনিয়ার শাসক স্টিফেনের ছেলে শাহজাদা আহমদ ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর উসমানি সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ পান। বাইজেন্টাইন বংশোদ্ভূত মাহমুদ পাশা খ্রিষ্টান ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর নিজ যোগ্যতাবলে উসমানি দরবারের ছদরে আজম হতে পেরেছিলেন। দীর্ঘ ১৪ বছর দক্ষতা ও সুনামের সঙ্গে তিনি ছদরে আজম হিসেবে উসমানি দরবারে অসামান্য ভূমিকা রাখেন।

স্বধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়ে যেসব বিদেশি উসমানি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন, তাঁদের সবাই নিষ্ঠাবান ছিলেন, সেটা বলা কঠিন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বাহ্যিকভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে উসমানি সুলতানদের ঘনিষ্ঠ হয়েছেন, এর আড়ালে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ও সামরিক তথ্য বাইরে খ্রিষ্টানশক্তির কাছে পাচার করতেন। সময় ও সুযোগমতো তাঁরা উসমানি সাম্রাজ্যের ক্ষতিসাধনে চেষ্টায় ত্রুটি করতেন না। তাঁদের কেউ ধরা পড়তেন, কেউ অধরা রয়ে যেতেন।

উসমানি সাম্রাজ্যের ছদরে আজম হিসেবে যাঁরা দায়িত্ব পালন করেছেন, তাঁদের সংখ্যা মোট ২৯২। তাঁদের মধ্যে তুর্কি বংশোদ্ভূত ছদরে আজম ছিলেন ১৩২ জন।

Scanned with CamScanner

এ ছাড়া আলবেনীয় বংশোদ্ভূত ৪৯ জন ব্যক্তি উসমানি ছদরে আজম হয়েছিলেন। এ তালিকায় আরও রয়েছেন ২৩ জন বাইজেন্টাইন বংশোদ্ভূত, ৬ জন সালাফি, ১৩ জন যুগোস্লাভিয়ান, ১৪ জন শার্কসি, ১ জন চেচনিয়ান, ৪ জন আরবীয়, ৩ জন আর্মেনীয়, ১ জন রাশিয়ান, ১ জন ইহুদি বংশোদ্ভূত এবং তুর্কি ছাড়া অন্যান্য উপজাতির ১৩ জন।

ছদ্মবেশী দুশমন ছদরে আজম

একবার সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহের কাছে খবর আসে, কারামান প্রদেশের লার্নাদা শহরে কিছু লোক বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। এদের পেছনে ওই অঞ্চলের কিছু আমির প্ররোচনা দিচ্ছেন।

সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহ তখনই এই বিদ্রোহ দমনে সেনাবাহিনীকে তৈরি হওয়ার আদেশ করলেন। তাঁর ছদরে আজম মুহাম্মদ পাশাকে তিনি জরুরি ভিত্তিতে ডেকে পাঠালেন। সুলতানের তলবে ছদরে আজম হাজির হলেন।

সুলতান আলফাতেহ তাঁর ছদরে আজমকে দ্রুততম সময়ে লার্নাদা শহর অভিমুখে সৈন্যদের নিয়ে রওনা হওয়ার তাগিদ দিলেন। সুলতানের আদেশ মেনে সেনাবাহিনী নিয়ে ওই শহর অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন ছদরে আজম।

সুলতান আলফাতেহ সৈন্যদের পাঠিয়েছেন বিদ্রোহ দমনে, এ সংবাদে ভয় পেয়ে যান বিদ্রোহী আমিররা। তাঁরা বেশ ভালোভাবে জানেন, উসমানি সৈন্যদের প্রতিরোধ করার সাহস ও শক্তি আপাতত তাঁদের নেই।

সুলতানের সেনাবাহিনী আসার খবরে লার্নাদা শহরের সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয় ছড়িয়ে পড়ে। শহরবাসী তাদের ঘরবাড়ি ফেলে দূরে আশ্রয় নিয়ে সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহের প্রতি নিজেদের আনুগত্য প্রকাশ করে।

উসমানি সেনাবাহিনীর সশস্ত্র সদস্যদের নিয়ে শহরের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে ছদরে আজম মুহাম্মদ পাশা সবাইকে নির্বিচারে হত্যার আদেশ দিলেন। বিদ্রোহী আমিরদের পালিয়ে যাওয়া এবং অসহায় শহরবাসীর আত্মসমর্পণ দেখেও তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন না।

আত্মসমর্পণের পর বিনা বিচারে এমন হত্যাকাণ্ডের আদেশ মেনে নিতে পারেননি কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তা। তাঁরা ছদরে আজমকে তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের অনুরোধ জানান।

Scanned with CamScanner

শুধু সবাইকে হত্যা নয়, বরং ছদরে আজম মুহাম্মদ পাশা শহরের প্রধান মসজিদটি জ্বালিয়ে দেওয়ার আদেশ দিলেন সৈন্যদের। তাঁর এমন বজ্রকঠিন আদেশে নিরুপায় সৈন্যরা শহরবাসীকে হত্যা করতে শুরু করে। এই নিষ্ঠুর পরিস্থিতিতে কয়েকজন সৈন্য দ্রুতগতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহকে ছদরে আজমের এমন নির্মম আদেশ সম্পর্কে সংবাদ জানাল।

সুলতান এমন সংবাদে উত্তেজিত হয়ে পড়েন। পালিয়ে আসা কয়েকজন সৈন্য সুলতানের কাছে দাবি করল, শহরজুড়ে যখন হত্যাকাণ্ড চলছে, ছদরে আজম তখন উৎফুল্লচিত্তে বলছিলেন, 'কনস্টান্টিনোপলে আমরা পরাজিত হয়েছিলাম, আজ এর কিছুটা হলেও প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ পেলাম।'

সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহ তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। তিনি নিশ্চিত হলেন, যাঁকে তিনি সাম্রাজ্যের ছদরে আজম হিসেবে মনোনীত করেছেন, তিনি ছদ্মবেশী একজন খ্রিষ্টান। আজ সুযোগ পেয়ে নির্বিচারে নিরপরাধ মুসলমানদের হত্যা করে এবং মসজিদ পুড়িয়ে দিয়ে তিনি মনের ভেতর পুষে রাখা ক্ষোভের প্রতিশোধ নিচ্ছেন।

সেদিনই সুলতান মুহাম্মদ অভিযুক্ত ছদরে আজমকে বরখাস্ত করেন। তাঁর নির্দেশে ছদরে আজমকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং কৃত অপরাধের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

উসমানি সাম্রাজ্যে শায়খুল ইসলাম

উসমানি সাম্রাজ্যের ইতিহাসে বারবার আলোচিত হয়েছে শায়খুল ইসলাম পদটি। সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামোতে কবে থেকে শায়খুল ইসলাম পদ যুক্ত হয়েছে, এর নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ধারণা করা হয়, সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের শাসনামলে প্রথমবারের মতো শায়খুল ইসলাম পদবি সৃষ্টি করা হয়। সে সময় সর্বপ্রথম এ পদে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন মোল্লা ফিনারি।

শায়খুল ইসলাম পদ উসমানি সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ ধর্মীয় এবং আইনি পদ হিসেবে স্বীকৃত ছিল। আজকের আধুনিক যুগে বিভিন্ন দেশে যে সাংবিধানিক পরিষদ রয়েছে, উসমানি সাম্রাজ্যে শায়খুল ইসলামের পদ ও প্রভাবের সঙ্গে এর তুলনা চলে।

উসমানি সাম্রাজ্যে যাঁরা বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং ধাপে ধাপে পদোন্নতি পেয়ে যাঁরা সর্বোচ্চ পদে পৌঁছেছেন, তাঁদের এ পদের

Scanned with CamScanner

জন্য যোগ্য ভাবা হতো। ফলে আঞ্চলিক বিচারপতি থেকে পদোন্নতি পেয়ে প্রাদেশিক বিচারপতির পদ প্রাপ্তির পর যাঁরা ইস্তাম্বুলে সামরিক বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পেতেন, তাঁদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তিকে পুরো উসমানি সাম্রাজ্যের শায়খুল ইসলাম হিসেবে মনোনীত করতেন সুলতান।

তবে সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদের শাসনামলে শায়খুল ইসলাম হিসেবে মনোনীত হওয়ার শর্তাবলি থেকে সামরিক বিচারপতি হওয়ার বিষয়টি বাদ দেওয়া হয়। এর ফলে অন্যান্য আদালতে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালনকারীদের মধ্য থেকেও শায়খুল ইসলাম হিসেবে কাউকে বেছে নেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়।

সাধারণত কাউকে শায়খুল ইসলাম পদে দায়িত্ব দেওয়া হলে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত ওই পদে বহাল থাকতেন। তবে এর ব্যতিক্রম ঘটে সুলতান সুলায়মানের শাসনামলে। তাঁর শাসনামলে তিনি তৎকালীন শায়খুল ইসলাম জোয়াইজাদা মুহাম্মদ আফেন্দিকে বরখাস্ত করেন। এর ফলে শায়খুল ইসলাম হিসেবে কাউকে নিয়োদ দেওয়া অথবা এ পদ থেকে বরখাস্ত করা–দুটোই সুলতানের হাতে ফিরে আসে।

উসমানি সাম্রাজ্যে সর্বোচ্চ বেতন পেতেন শায়খুল ইসলাম। তাঁদের এ পদের সম্মান ও গুরুত্ব বিবেচনায় এমন মোটা অঙ্কের বেতন-ভাতা দেওয়া হতো। প্রতি মাসে তৎকালীন ৬০০ উসমানি মুদ্রা পেতেন শায়খুল ইসলাম পদে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি। ভালো মানের একটি খাসি কেনার জন্য তখন ব্যয় করতে হতো মাত্র ১২ উসমানি মুদ্রা।

সাধারণত শায়খুল ইসলাম হিসেবে মনোনীত ব্যক্তি নিজের ঘরে বসে এ দায়িত্ব পালন করতেন। তবে সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদের শাসনামলে তাঁদের জন্য বিশেষ কর্মস্থল বরাদ্দ দেওয়া হয়। পাশাপাশি তাঁর দাপ্তরিক কাজে সহযোগিতার জন্য কয়েকজন কর্মচারীও নিয়োগ দেওয়া হতো। ফলে শায়খুল ইসলাম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন বিষয়ে আইনি ও ধর্মীয় বৈধতা দিয়ে যেসব ফতোয়া ইস্যু করতেন, তাতে আগের চেয়ে গতি আসে।

১৮৩৯ সালে যখন উসমানি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন বিষয়ে সংস্কার শুরু হয়, তখন শায়খুল ইসলামের দায়িত্বে বেশ কিছু পরিবর্তন আসে। ব্যক্তি উপাধির পরিবর্তে শায়খুল ইসলাম পদটি তখন দাপ্তরিক কাজকর্মে রূপ পায়। ১৯২৩ সালে উসমানি সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি পর্যন্ত এ পদবি বহাল ছিল।

উসমানি সাম্রাজ্যে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ শায়খুল ইসলাম হিসেবে যাঁরা ইতিহাসে আলোচিত হয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন শায়খুল

Scanned with CamScanner

ইসলাম আবু সউদ আফেন্দি। শৈশব ও কৈশোরে তিনি গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তুর্কি ভাষার পাশাপাশি তিনি আরবি ও ফারসি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন।

তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুলসহ বেশ কয়েকটি শহরে মাদ্রাসায় পড়ানো ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন আবু সউদ। দীর্ঘদিন শিক্ষকতার কাজে নিবেদিতপ্রাণ থাকার পর তিনি বোর্সা শহরে বিচারক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।

বোর্সা শহর থেকে বিচারপতি হিসেবে তাঁকে ইস্তাম্বুল শহরে স্থানান্তর করা হয়। এরপর কিছুকাল তিনি সামরিক বাহিনীতে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সর্বশেষ ১৫৪৫ সালে তিনি উসমানি সাম্রাজ্যের শায়খুল ইসলাম হিসেবে মনোনীত হন। দীর্ঘ ৩০ বছর তিনি এ পদে দায়িত্ব পালন করেন।

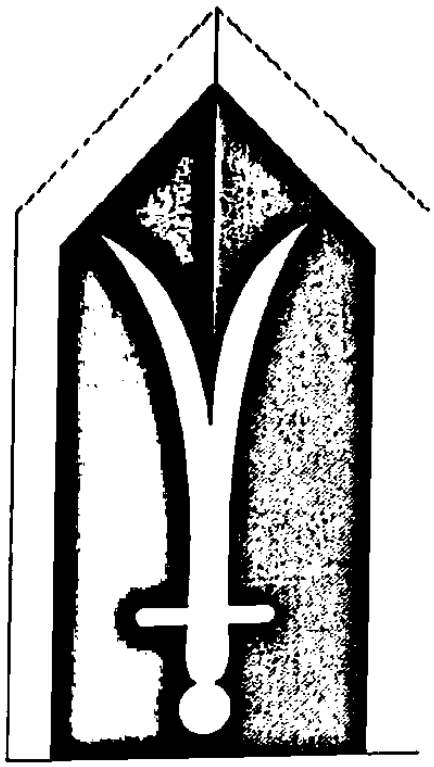
সুলতান সুলায়মান শায়খুল ইসলাম আবু সউদকে অত্যন্ত সমীহ করতেন। সাম্রাজ্য পরিচালনায় প্রশাসনিক নানা বিষয়ে তিনি আবু সউদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন এবং তাঁর মতামত নিতেন।

শায়খুল ইসলাম আবু সউদ আফেন্দি সাধারণ মানুষের জীবনযাপন-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত ফতোয়া দিতেন। পাশাপাশি সুলতানের সাম্রাজ্য পরিচালনার বিভিন্ন প্রসঙ্গেও তিনি শরয়ী সমাধান দিতেন। শায়খ আবু সউদ আফেন্দির কিছু ফতোয়া আজও রহস্যময় হয়ে আছে। তিনি যেসব ফতোয়া দিয়েছিলেন, এর মধ্যে আলোচিত-সমালোচিত কয়েকটি ফতোয়া হলো :

- ১৫৫৩ সালে সুলতান সুলায়মান যখন স্বার্থপর কিছু লোকের কথায় প্ররোচিত হয়ে অন্যায়ভাবে নিরপরাধ পুত্র শাহজাদা মুস্তফাকে হত্যা করতে মনস্থির করেন, তখন এই হত্যার বৈধতায় আনুষ্ঠানিকভাবে ফতোয়া দেন শায়খুল ইসলাম আবু সউদ।
- একইভাবে তিনি সুলতান দ্বিতীয় সেলিমকে আপন ভাই হত্যা বৈধ বলে ফতোয়া দেন। এ ফতোয়ার পর সুলতান দ্বিতীয় সেলিম তাঁর ভাই শাহজাদা বায়েজিদকে হত্যা করেন।

১৫৭৪ সালে ইস্তাম্বুলে মৃত্যুবরণ করেন শায়খুল ইসলাম আবু সউদ।

Scanned with CamScanner



উসমানি সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনী

উসমানি সেনাবাহিনী মোট তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল। ঘোড়সওয়ারদের দল, ইঙ্কেশারি (নবিন সেনাদল) ও নৌবাহিনী। এ তিন বাহিনীর মধ্যে ঘোড়সওয়াররা ছিল সামরিক শক্তিতে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী। তবে সাম্রাজ্যের আনুষ্ঠানিক বাহিনী বা সেনাদল হিসেবে পরিচিত ছিল ইঙ্কেশারি বাহিনী। এরপর ছিল নৌবাহিনী। উসমানি সাম্রাজ্যের সমুদ্রপথ পাহারা ও নৌপথে সামরিক অভিযানে এই বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

উসমানি শাসনামলে ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণোজ্জ্বল ও সুদীর্ঘ এক অধ্যায় যোগ হয়। পারস্য উপসাগর থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল, সমগ্র মিসর, ইউরোপের কৃষ্ণসাগরের পশ্চিম তীর থেকে শুরু করে আদ্রিয়াতিক সাগরের পূর্ব তীর পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড, এশিয়া মাইনর, আনতোলিয়া এবং ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ, সমগ্র বলকান উপদ্বীপ বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া, বসনিয়াসহ বিশাল অঞ্চল উসমানী সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। আর এসব অঞ্চলে বিজয়ের নিশান উড়িয়ে উসমানি মানচিত্রে এই দেশগুলোর অন্তর্ভুক্তির মূলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল উসমানি সেনাবাহিনী।

Scanned with CamScanner

উসমানি সেনাবাহিনীর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী যে অংশটি ছিল, তুর্কি ভাষায় এদের বলা হতো ইয়েনিচেরি। সোজা বাংলায় এর অর্থ 'নবিন সেনাদল'। এর অপর নাম 'জানিসারি বাহিনী' অর্থাৎ 'প্রাণ উৎসর্গকারী দল'। আরবিতে এর নামকরণ করা হতো 'আলজায়শুল ইস্কেশারি'। উসমানি সেনাবহরে এই অংশের প্রভাব ও ভূমিকা অন্য সব শাখার চেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল। এই বইয়ে ইস্কেশারি বাহিনী বলতে সৈন্যদের এই অংশকে বোঝানো হয়েছে।

উসমানি সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় সুলতান উরখান বিন উসমান তাঁর রাজ্যের যুদ্ধ পরিচালনা ও সশস্ত্র অভিযানের লক্ষ্যে এই বিশেষ বাহিনী গঠন করেন। বিভিন্ন অঞ্চল বিজয়ের পর উসমানিদের হাতে বন্দী খ্রিষ্টান পরিবারের শিশু-কিশোর এবং যুদ্ধক্ষেত্রে মা-বাবা হারানো এতিম ছেলেদের এই বাহিনীতে নেওয়া হতো। বিশেষ করে, এদের সংগ্রহ করা হতো বসনিয়া, হারজেগোভিনা, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া, গ্রিস, যুগোস্লাভিয়াসহ বলকান উপদ্বীপের বিভিন্ন এলাকা থেকে।

পরবর্তী সময়ে তৃতীয় সুলতান প্রথম মুরাদের শাসনামলে এই বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে স্থায়ী রূপ পায়। তিনি এই বাহিনীকে আরও সুবিন্যস্ত এবং এর সামরিক কাঠামো সম্প্রসারিত করেন।

শৈশব ও কৈশোর থেকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো এই বাহিনীর সদস্যদের। বিজিত অঞ্চল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পাওয়া শিশু ও কিশোরদের জন্য এই বাহিনীতে আলাদা ব্যবস্থা এবং সমন্বিত প্রশিক্ষণকেন্দ্র ছিল। এখানে তাদের মানসিক ও শারীরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে নিষ্ঠাবান সুদক্ষ মুসলিম সৈনিক হিসেবে গড়ে তোলা হতো। ফলে বড় হতে হতে ইসলাম, জিহাদ ও সুলতানের আনুগত্য ছাড়া অন্য সবকিছু ভুলে যেত ভিন্ন ধর্ম ও অঞ্চল থেকে আসা এসব শিশু-কিশোর। কোনো গোত্র, বংশ অথবা অঞ্চলের প্রতি এদের টান বা আকর্ষণ, কিংবা কোনো আনুগত্য ও মায়া থাকত না।

Scanned with CamScanner



সুলতান তাদের একমাত্র পিতা ও নেতা, এটাই ছিল এই বাহিনীর সদস্যদের প্রথম ও শেষ কথা। যুদ্ধই তাদের একমাত্র কাজ ও পেশা। সুলতান ছাড়া অন্য কারও আদেশে তারা যুদ্ধে অংশ নিত না। বরং কোনো অভিযানে সুলতান নেতৃত্ব দিলে তবেই তারা তাতে অংশগ্রহণ করত। যদিও পরবর্তী সময়ে সুলতান সুলায়মান আলকানুনি এ প্রথা ভেঙে অন্য সামরিক নেতার তত্ত্বাবধানে এই বাহিনীকে রণাঙ্গনে পাঠান।

সুলতানের নির্দেশে যেকোনো কঠিন পরিস্থিতিতে যুদ্ধক্ষেত্রে জীবনবাজি রেখে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার বেলায় এই বাহিনীর মতো সাহসী, শক্তিশালী ও সুসংগঠিত শক্তি সেকালে অন্য কোনো অঞ্চলের ছিল না।

আবাসিক ক্যাম্প এবং যুদ্ধক্ষেত্রে এই বাহিনীর অবস্থান বোঝাতে অন্যদের চেয়ে আলাদা প্রতীক ব্যবহার করা হতো। এদের পদমর্যাদার স্তরবিন্যাস এবং সামরিক প্রতীকও ছিল অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনীর চেয়ে ভিন্ন। সাম্রাজ্যের কোথাও ব্যবসা-বাণিজ্যে বা শিল্প-সম্পর্কিত কোনো কাজে জড়িত হওয়ার সুযোগ ছিল না ইঙ্কেশারি বাহিনীর সদস্যদের।

Scanned with CamScanner

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকেরা লিখেছেন, উসমানি বাহিনী ইউরোপে যেসব খ্রিষ্টান অঞ্চল জয় করত, সেখানে বসবাসরত খ্রিষ্টান ও অন্য ধর্মীয় পরিবারগুলোর ওপর একধরনের মানবকর আরোপ করা হতো। ফলে যেসব পরিবারে পাঁচ বা পাঁচের বেশি সন্তান রয়েছে, তাদের মধ্য থেকে একজনকে উসমানি বাহিনীতে সদস্য হিসেবে নেওয়া হতো। এভাবে বিভিন্ন পরিবার থেকে কিশোর সংগ্রহ করার রেওয়াজ ছিল এই বাহিনীর জন্য। তবে তুর্কি ও আরব ঐতিহাসিকেরা এ তথ্যকে অসত্য বলে দাবি করেছেন।

কিছু তুর্কি ইতিহাসবিদ দাবি করেন, মানবকর ধার্য করে নয়, বরং বিজিত অঞ্চলগুলোতে অসহায় হয়ে পড়া এতিম ও শরণার্থী শিশু-কিশোরদের এ বাহিনীতে সদস্য হিসেবে ভর্তি করানো হতো। পাশাপাশি স্বেচ্ছায় কিছু মুসলিম পরিবারও তাদের সন্তানদের এই বাহিনীতে সৈনিক হতে পাঠাত। বিভিন্ন অঞ্চল ও পরিবার থেকে আনা এই শিশু-কিশোরদের জাগতিক ও ধর্মীয় বিষয়ে উন্নত শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে সুলতানদের বিশেষ আগ্রহে তাদের জন্য আলাদা বরাদ্দ থাকত। পাশাপাশি শারীরিক যোগ্যতা এবং সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে এদের দক্ষ যোদ্ধা সৈনিক হিসেবে গড়ে তুলতে সব ধরনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হতো সুলতানের পক্ষ থেকে।

উসমানি সাম্রাজ্যের বিস্তার পর্বে বিভিন্ন অঞ্চলে উসমানি সেনাবাহিনীর বিজয় ও বিস্ময়কর সামরিক সাফল্যের মূলে ইঙ্কেশারি বাহিনীর ভূমিকা ছিল অবিচ্ছেদ্য অংশ। বলা যায়, এই বাহিনীর কৌশল ও কর্মকাণ্ডে তুরস্কের বাইরে তিন মহাদেশজুড়ে বিস্তৃত হয় উসমানি সাম্রাজ্যের মানচিত্র।

কিন্তু ইতিহাসের আবর্তনে যখন উসমানি সাম্রাজ্যে স্থবিরতা দেখা দেয়, তখন কমে আসে যুদ্ধ-জিহাদের ধারাবাহিক সামরিক অভিযান। বরং অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ মেটাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন সুলতানরা। এর ফলে ধীরে ধীরে ইঙ্কেশারি বাহিনীর নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও নেতৃত্বে যোগ্য লোকের অভাব তৈরি হয়। দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা ভুলে গিয়ে ক্ষমতার মোহ তৈরি হয় ইঙ্কেশারির সামরিক নেতাদের মধ্যে। প্রশিক্ষণ ও যুদ্ধে অংশগ্রহণের পরিবর্তে সম্পদ উপার্জন এবং প্রশাসনে প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে এই বাহিনীর কিছু সদস্য। সময়ের পরিক্রমায় উসমানি দরবার ও সাম্রাজ্য পরিচালনার বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় বিষয়ে ইঙ্কেশারি বাহিনীর প্রভাব ও হস্তক্ষেপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আমির ও উজির তো বটেই, একসময় স্বয়ং সুলতানের ওপর ছড়ি ঘোরাতে শুরু করে এই বাহিনীর বেপরোয়া সদস্যরা। নিজেদের পছন্দ না

Scanned with CamScanner

হলে সুলতানকে ক্ষমতার আসন থেকে সরিয়ে দেওয়ার শক্তি সঞ্চয় হয় তাদের। দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠা ও সাহসিকতার পরিবর্তে এই বাহিনীর নেতা ও সদস্যদের আচার-আচরণে অনৈতিকতা ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। নিজেদের স্বার্থে যেকোনো অপকর্ম ও অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ে এককালের সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী ইঙ্কেশারি বাহিনীর সদস্যরা।

ইঙ্কেশারি বাহিনীর বিভিন্ন অন্যায্য দাবি না মানায় তাদের হাতে ক্ষমতাচ্যুত হন বেশ কয়েকজন উসমানি সুলতান। এদের দাপটে অসহায় হয়ে পড়েন দরবারের ছদরে আজম, আমির, উজির ও সাধারণ মানুষ। এই বাহিনীর সদস্যদের হাতে পদচ্যুত হন সুলতান প্রথম মুস্তফা, সুলতান দ্বিতীয় উসমান, সুলতান প্রথম ইবরাহিম, সুলতান চতুর্থ মুহাম্মদ, সুলতান দ্বিতীয় মুস্তফা ও সুলতান তৃতীয় আহমদ।

কেবল সুলতানদের সরিয়ে দেওয়া নয়, বরং সেকালের আলেমসমাজের প্রধান বা শায়খুল ইসলামের ফতোয়া তৈরিতেও প্রভাব ছিল তাদের। সুলতান প্রথম আহমদের শাসনামলে যখন আলেমসমাজের পক্ষ থেকে তামাক সেবন হারাম মর্মে ফতোয়া দেওয়া হলো, তখন ইঙ্কেশারি বাহিনীর সদস্যরা ক্ষুব্ধ হয়। কারণ, এতে তাদের ধূমপান ও তামাক সেবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই ফতোয়ার প্রতিবাদে দরবারের আশপাশে ব্যাপক হইচই ও বিশৃঙ্খলা তৈরি করে একদল উচ্ছৃঙ্খল সৈন্য। একপর্যায়ে এই ফতোয়া প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা হয় সুলতান ও শায়খুল ইসলামকে।

একইভাবে সুলতান তৃতীয় মুরাদ যখন মদ্যপান নিষিদ্ধ করে ফরমান জারি করেন উসমানি সাম্রাজ্যে, তখন সুলতানের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে জোর করে এই আদেশ প্রত্যাহারে বাধ্য করে ইঙ্কেশারির বিপথগামী সদস্যরা।

উসমানি সুলতানদের মধ্যে বেশ কয়েকজন এই বিশৃঙ্খল বাহিনীতে সংস্কার ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এসব চেষ্টা সফল হয়নি বরং উল্টো তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ক্ষমতার আসন থেকে। অধঃপতন ও অবনতির এই পর্যায়ে এসে ইঙ্কেশারি বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে কেবলই পরাজিত হতে থাকে এবং তাদের সব যোগ্যতা ও রণকৌশল দুর্বল হয়ে পড়ে। সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং সাম্রাজ্যজুড়ে বিশৃঙ্খলা করাই যেন হয়ে ওঠে ইঙ্কেশারি বাহিনীর অন্যতম কর্তব্য।

সামরিক বাহিনীতে সবচেয়ে শক্তিধর অংশের এই বিপর্যয় দেখে সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ উচ্ছৃঙ্খল সদস্যদের দমন করে এটি বিলুপ্ত করার উদ্যোগ নেন। তিনি জানতেন, হুট করে কোনো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে গেলে আরও

Scanned with CamScanner

বড় হাঙ্গামা তৈরি হবে। কাজেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের আগে ১৭ বছর ধরে তিনি এই বাহিনীর সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। এরপর যখন এদের অবস্থার পরিবর্তন ও সংশোধনের আর কোনো আশা বাকি থাকল না, তখন সুলতান মাহমুদ এই বাহিনী থেকে নিষ্ঠাবান ও যোগ্য সদস্যদের বাছাই করে আলাদা করেন। এরপর এটি বিলুপ্ত করার ব্যাপারে ফতোয়া চান সাম্রাজ্যের শায়খুল ইসলাম তাহের আফেন্দির কাছে।

উসমানি সেনাবাহিনীর অন্যান্য শাখা-প্রশাখার সদস্যদের প্রস্তুত করা হয় ইঙ্কেশারি বাহিনী দমন অভিযানে অংশ নিতে। আসন্ন বিপৎসংকুল পরিবেশে সর্বাত্মক সামরিক শুদ্ধি অভিযানের প্রস্তুতি হিসেবে সুলতান মাহমুদ এক বৈঠকে ডেকে পাঠান দরবারের গুরুত্বপূর্ণ আমির ও উজির এবং ইঙ্কেশারি বাহিনীর পদস্থ সামরিক কর্তাদের। ওই বৈঠকে ছদরে আজম সেলিম পাশা সবার সামনে কয়েক বছর ধরে ইঙ্কেশারি বাহিনীর সদস্যদের বিশৃঙ্খল কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন। উপস্থিত আমির ও উজিররা এই বাহিনী বিলুপ্তির ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করে যেকোনো পরিস্থিতিতে সুলতানের পাশে থাকার শপথ নেন।

১৮২৫ সালের মে মাসে যখন সুলতানের অনুগত সেনারা একটি আলাদা শিবিরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করে, তখন পুরোনো সদস্যরা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু তত দিনে পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে আসে। বাহিনীর প্রধান জালালুদ্দীন এবং অন্য উচ্চপদস্থ সামরিক নেতাদের অনেকেই সুলতানের সংস্কারমূলক পদক্ষেপকে স্বাগত জানান।

সামরিক নেতা এবং দেশের আলেমসমাজ ও বিশিষ্টজনদের সমর্থন না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ইঙ্কেশারি বাহিনীর বিদ্রোহী সদস্যরা। ১৮২৬ সালের ১৪ জুন সন্ধ্যায় একটি সংগঠিত দল আক্রমণ করে জালালুদ্দীনের ওপর। কিন্তু বিস্ময়করভাবে তিনি প্রাণে বেঁচে যান। খুব দ্রুত বিদ্রোহী ইঙ্কেশারি বাহিনীর অন্য সদস্যরা আকসারায় ময়দানে জড়ো হতে থাকে চূড়ান্ত প্রতিশোধের নেশায়।

এ খবর পেয়ে সুলতান ইস্তাম্বুলের 'সুলতান আহমদ' ময়দানে একটি পতাকা স্থাপন করেন এবং দেশের আলেমসমাজ, বিশিষ্ট নাগরিক এবং জনসাধারণকে তাঁর পক্ষে নেমে আসার আহ্বান জানান। ছদরে আজম সেলিম পাশা সেনাবাহিনীর সব শাখার সামরিক নেতাদের কাছে সুলতানের পক্ষে এই ময়দানে এসে অবস্থান নেওয়ার আদেশ পাঠান। একপর্যায়ে উসমানি সেনাবাহিনীর ৬০ হাজার সদস্য, আলেমসমাজ, বিচারক ও গুণী সমাজ,

Scanned with CamScanner

আমির ও উজির, দরবারের সভাসদসহ সবাই এসে সুলতানের পাশে অবস্থান নেন। একা এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ইঙ্কেশারি বাহিনীর সদস্যরা।

সুলতান মাহমুদ সমবেত সবাইকে নিয়ে রওনা হন বিদ্রোহীদের অবস্থানস্থল আকসারায় ময়দানের উদ্দেশে। আগে থেকে প্রস্তুত অসংখ্য কামান থেকে গোলাবর্ষণের হুকুম দেন তিনি। শুরু হয় দুই পক্ষের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ ও রক্তপাত। সেদিন ওই ময়দানেই নিহত হন হাজার হাজার বিদ্রোহী ইঙ্কেশারি সদস্য। কেউ সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারেনি। পরদিন সুলতান এক ফরমান জারি করে আনুষ্ঠানিকভাবে এই বাহিনীর বিলুপ্তি ঘোষণা করেন। এর মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয় উসমানি সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা, বিদ্রোহ ও অস্থিরতার এক রক্তাক্ত অধ্যায়।

ইঙ্কেশারি বাহিনীকে সমূলে উৎপাটন করে এর যাবতীয় পদ ও পদবি এবং সব ঐতিহ্য ও রসম-রেওয়াজ নিষিদ্ধ করা হয় উসমানি সাম্রাজ্যে। এর পরিবর্তে সদ্য গঠিত নতুন সামরিক বাহিনীর নামকরণ করা হয় মুহাম্মদি মানসুর বাহিনী। এর প্রধানকে 'সরআসকার' উপাধি দেওয়া হয়। সাম্রাজ্যজুড়ে আবারও ফিরে আসে শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার হারানো অতীত।

Scanned with CamScanner

উসমানি সুলতানদের স্বভাব-চরিত্র

সাম্রাজ্য শাসন ও নানা ধরনের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার পাশাপাশি বিদ্রোহ দমন এবং নতুন নতুন রাজ্য জয়ে সামরিক নেতৃত্ব দিতেন উসমানি সুলতানরা। ফলে দিনরাত তাঁদের সময় কাটত ভীষণ ব্যস্ততায়। রাজা, মহারাজা ও সুলতানদের জীবনে এটাই স্বাভাবিক নিয়ম।

তবু মানুষ হিসেবে প্রত্যেকের ভালো লাগা থাকে। উসমানি সুলতানদেরও কিছু ব্যক্তিগত শখ-আহ্লাদ ছিল, যা সাধারণ প্রজাদের চেয়ে খানিক ভিন্ন। সুলতানদের ব্যক্তিগত রুচি, পছন্দ এবং দৈনন্দিন অভ্যাসে তাঁদের প্রিয় বিষয়গুলো সাধারণ প্রজাদের কাছে কৌতূহলের বিষয় ছিল। উসমানি সাম্রাজ্যের প্রসিদ্ধ কয়েকজন সুলতানের কিছু শখ ও ব্যতিক্রমী চরিত্র নিয়ে এই অধ্যায়।

সুলতান উসমান গাজি

যাঁর হাতে উসমানি সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন ও প্রতিষ্ঠা, তিনি সুলতান উসমান গাজি। শারীরিক গঠনে তিনি ছিলেন অন্য স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে দীর্ঘ আকৃতির। তাঁর দুই হাত ছিল বেশ লম্বা। ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, তিনি যখন দাঁড়িয়ে থাকতেন, তখন তাঁর দুই হাত প্রায় হাঁটু পর্যন্ত ছুঁয়ে থাকত।

সুলতান উসমান গাজি এক পোশাক কখনো এক দিনের বেশি ব্যবহার করতেন না। দিন শেষে পরিধেয় পোশাকটি তিনি গরিবদের জন্য দান করে দিতেন।

প্রতিবেলায় খাবার গ্রহণের আগে সংগীত শোনা ছিল তাঁর দৈনন্দিন অভ্যাস।

শখের বশে অবসরে মাঝেমধ্যে মঙ্গোলিয়ান কুস্তি চর্চা করতেন সুলতান উসমান।

Scanned with CamScanner

সেকালে উসমানি রাজ্যে বসবাসকারী সাধারণ মানুষ বছরভর অপেক্ষায় থাকত একটি নির্দিষ্ট দিনের। কারণ, বছরের ওই দিনে সুলতান উসমান গাজি তাঁর প্রাসাদ সর্বসাধারণের জন্য খুলে দিতেন। সেদিন সবাই তাঁর রাজপ্রাসাদে ঢুকে যার যা খুশি নিয়ে যেত নিজেদের বাড়িতে।

সুলতান উরখান গাজি

দেশে-বিদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসতেন সুলতান উরখান। তবে কোথাও এক দিনের বেশি অবস্থান করতেন না তিনি।

সাম্রাজ্যের পরিধি বাড়াতে যুদ্ধ পরিচালনা ও নতুন রাজ্য জয়ে সাহসী ভূমিকা ছিল তাঁর। সামরিক যোগ্যতা ও প্রতিভায় তিনি প্রবাদতুল্য পুরুষ ছিলেন।

দরবারে প্রশাসনিক কাজ পরিচালনার পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন ধর্মানুরাগী সুলতান। প্রতি সপ্তাহের মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার তিনি রোজা রাখতেন।

রাজ্যের আলেম-ওলামা ও ইসলামি পণ্ডিতদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ ছিল। দরবারে কোনো আলেম এলে তাঁদের সম্মানে নিজেই উঠে দাঁড়াতেন এই সুলতান।

সুলতান প্রথম মুরাদ

উসমানি ইতিহাসে সুলতানদের মধ্যে সুলতান প্রথম মুরাদ বিভিন্ন কারণে ব্যতিক্রম এবং অন্যদের চেয়ে আলাদা ছিলেন। সাধারণ প্রজাদের কাছে তিনি তাঁর সততা ও নিষ্ঠার জন্য ছিলেন জনপ্রিয় সুলতান। এমনকি তাঁকে ঘিরে বেশ কিছু প্রবাদবাক্য মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল।

বই পড়ার প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল সুলতান মুরাদের। সাম্রাজ্য পরিচালনার অবসরে তিনি প্রচুর বই পড়তেন। এমনকি সুলতান হিসেবে তিনি নিজের পাঠের জন্য একটি ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার তৈরি করেছিলেন।

জাগতিক ও অপার্থিব জ্ঞানে যাঁরা বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ, তাঁদের প্রতি তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

উসমানি সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তারে বিভিন্ন অঞ্চল জয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করতে ভালোবাসতেন সুলতান মুরাদ। তিনিই একমাত্র উসমানি সুলতান, রণাঙ্গনে যাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

Scanned with CamScanner

সুলতান বায়েজিদ

সুলতান বায়েজিদ কেবল সাম্রাজ্যের শাসক নন, বরং তিনি ছিলেন একজন কবিও। দরবারে প্রশাসনিক কাজকর্মের অবসরে তিনি কবিতা লিখতেন। তাঁর মতো কাব্যপ্রীতি ও কবিপ্রতিভা অন্য উসমানি সুলতানদের মধ্যে বিরল।

সুলতান কবি বায়েজিদের ভোগ-বিলাসে অলংকারের প্রতি আকর্ষণ ছিল। গোসল করার জন্য রুপার চৌবাচ্চা তৈরি করিয়েছিলেন তিনি।

মঙ্গোলিয়ান কুস্তিতে আগ্রহী ছিলেন সুলতান বায়েজিদ। মাঝেমধ্যে এর চর্চা করতেন তিনি।

পাশাপাশি তির ছোড়া ও পশুপাখি শিকারের শখ ছিল সুলতান মুরাদের। এমন ব্যতিক্রমী গুণ ও প্রতিভায় মুগ্ধ হতেন তাঁর সহচর, দরবারের পরিষদ এবং প্রজারা।

সুলতান মুহাম্মদ

তৈমুর লঙের আক্রমণে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত উসমানি সাম্রাজ্য যাঁর হাতে আবারও ফিরে পায় শান্তি, শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা, তিনি সুলতান মুহাম্মদ। ঐতিহাসিকেরা তাঁকে উসমানি সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন।

সূচিকর্মে সুলতান মুহাম্মদের নিপুণ দক্ষতা ছিল। সুই-সুতার সেলাইয়ে এমন প্রতিভার গুণে সুলতান মুহাম্মদের উপাধি ছিল 'সুদক্ষ সেলাইকারক'।

ধর্মানুরাগ ছিল তাঁর অন্যতম একটি স্বভাবজাত গুণ। রাজ্য পরিচালনার নানা ব্যস্ততায় নিজে হজে যাওয়ার সুযোগ পেতেন না তিনি। কিন্তু প্রতিবছর মক্কা ও মদিনার জন্য বিশেষ উপহার ও মূল্যবান উপঢৌকনসহ অর্থ বরাদ্দ পাঠাতেন। তাঁর প্রবর্তিত এই রীতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত সব উসমানি সুলতানের আমলে চালু ছিল।

শুক্রবার ছিল সুলতানের জন্য বিশেষ একটি দিন। এদিন তিনি নিজ হাতে নানা পদের খাবার রান্না করতে ভালোবাসতেন। তারপর নিজে সেগুলো সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করতেন।

পিতা সুলতান বায়েজিদের মতো সুলতান মুহাম্মদও শিকারে দক্ষ ছিলেন। অবসরে শিকারে গিয়ে নিজের শখ পূরণ করতেন তিনি।

Scanned with CamScanner

সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ

উসমানি সুলতানদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও ইতিহাসখ্যাত ইস্তাম্বুল বিজেতা সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহের পিতা সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ। পুত্রকে শৈশবকাল থেকে সুযোগ্য ও দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন সুলতান মুরাদ। পুত্রের ১২ বছর বয়সে তাঁর হাতে শাসনের ভার ছেড়ে তখন থেকে সাম্রাজ্য পরিচালনার নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হাতে-কলমে সবক দিয়েছেন তিনি।

সংগীত এবং কবিতার প্রতি আসক্তি ছিল সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের। নিজ দরবারে সেকালের কবি ও সংগীতশিল্পীদের সমাদর করতেন তিনি।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগী ছিলেন তিনি। দার্শনিকদের কথা এবং তাঁদের সাহচর্য ভালোবাসতেন।

সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহ

ইস্তাম্বুল বিজয়ের মহানায়ক সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহের প্রকৃতিপ্রেম তাঁকে অন্য সুলতানদের চেয়ে আলাদা পরিচয় দিয়েছে। উসমানি প্রাসাদের চারপাশজুড়ে নিজের বাগানে ফুল-ফলের নানা গাছের চারা রোপণ করতে ভালোবাসতেন তিনি।

তোপকাপি প্রাসাদের চারপাশ ঘিরে সাজানো সুশোভিত সবুজ উদ্যানে কাটত তাঁর অবসর সময়। বিভিন্ন জাতের গাছের সেবায় তিনি মানসিক আনন্দ খুঁজে পেতেন। পাশাপাশি সেকালের গাছ বিশেষজ্ঞদের সমাদর করতেন এবং তাঁদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতেন।

সুলতান সেলিম

মূল্যবান ধাতু দিয়ে বানানো নানা ধরনের দামি জিনিসপত্রের প্রতি গভীর আকর্ষণ ছিল সুলতান সেলিমের স্বভাবজাত বিষয়। বিভিন্ন জায়গা থেকে এসব মূল্যবান জিনিস সংগ্রহ করতেন এবং একেক উপলক্ষে ঘনিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের তা উপহার দিতেন।

কবিতা ও বইপাঠে তাঁর আগ্রহ ছিল প্রশংসনীয়। উসমানি সুলতানদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম চশমা ব্যবহার করেছেন। অতিরিক্ত বই পড়ার কারণে তাঁর দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, এই দাবি ঐতিহাসিকদের।

Scanned with CamScanner

সুলতান প্রথম মাহমুদ

সুবিশাল উসমানি সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েও নিজ হাতে বিভিন্ন জিনিসপত্র তৈরি করতে ভালোবাসতেন সুলতান প্রথম মাহমুদ। তারপর সেগুলো বিক্রি করতেন বাজারে। মন্ত্রিপরিষদ ও দরবারের কর্তাদের উদ্দেশে তিনি বলতেন, 'নিজের হাতে উপার্জনের যে আনন্দ, তা বলে বোঝানো যায় না।'

সুলতান প্রথম আহমদ

শৌখিন শাসক হিসেবে সুলতান প্রথম আহমদ ছিলেন একটু অন্য রকম। তিনি নিজ হাতে আংটি বানাতেন এবং বাঁশের লাঠি তৈরি করতেন। বিদেশি অতিথি, দরবারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ নেতাদের বাঁশের লাঠি উপহার দিতেন তিনি। হস্তশিল্পের প্রতি এমন আকর্ষণ অন্য সুলতানদের জীবনে বিরল বলা চলে।

সুলতান দ্বিতীয় উসমান

উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতান তিনি, অথচ ঘোড়ায় চড়ার জন্য ব্যবহৃত জিন তৈরি করতে পছন্দ করতেন সুলতান দ্বিতীয় উসমান। নিজের বানানো ঘোড়ার জিন ব্যবহার করে আনন্দ পেতেন তিনি।

তাঁকে যখন ক্ষমতাচ্যুত করা হয়, তখন ইঙ্কেশারি বাহিনীর লোকেরা তাঁকে ধরে জিন ছাড়া ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে হাট-বাজারে ঘুরিয়েছিল। তাঁকে অপমান করতেই এমন দুর্ব্যবহার করেছিল দুর্বৃত্তকারীরা।

Scanned with CamScanner

উসমানি সুলতানদের বৈচিত্র্যময় অধ্যায়

১১৫ সন্তানের জনক সুলতান

নারীর প্রতি মোহ ও আসক্তিতে সুলতান তৃতীয় মুরাদ উসমানি সুলতানদের মধ্যে আলোচিত চরিত্র। সুন্দরী ও রূপবতী কুমারীদের প্রতি তাঁর আসক্তি কখনো কখনো স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে যেত। সুলতান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পরও দিনভর নারীদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে মগ্ন হয়ে থাকতেন তিনি। সাম্রাজ্য পরিচালনার শত ব্যস্ততা এই তরুণ সুলতানকে তাঁর অস্বাভাবিক যৌনলীলা থেকে দূরে রাখতে পারত না।

চার স্ত্রী তো ছিলেনই, এর বাইরে অসংখ্য দাসীর সঙ্গে রাত কাটাতেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর মোট সন্তানসন্ততির সংখ্যা ছিল ১১৫।

সুলতান তৃতীয় মুরাদ মাত্র ২৯ বছর বয়সে সুলতান উপাধি ধারণ করে সাম্রাজ্য পরিচালনার ভার নেন। ধারণা করা হয়, অতিরিক্ত যৌন কর্মকাণ্ডের ফলে শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন তিনি। এতে তাঁর মৃত্যু হয়।

১৪ বছর বয়সে ১৪তম সুলতান

উসমানি সুলতানদের মধ্যে ১৪তম/// সুলতান হিসেবে সুলতান প্রথম আহমদ যখন সাম্রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৪ বছর। তাঁর জন্ম ১৫৯০ সালে। আর তিনি যখন সুলতান হিসেবে সিংহাসনে, সময়ের খাতায় তখন ১৬০৩ সাল।

সুলতান আহমদের শাসনামল ছিল উসমানি সাম্রাজ্যের জন্য ঘোর অন্ধকার সময়। চারদিকে যুদ্ধবিগ্রহ এবং আঞ্চলিক বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে সে সময়। এমন উত্তাল পরিস্থিতিতে সিংহাসনে শিশু সুলতানকে বসিয়ে পূর্বসূরিদের রেখে যাওয়া উসমানি সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন উসমানি পরিবারের সদস্য ও দরবারের সভাসদেরা।

Scanned with CamScanner

এসব সংগ্রামে কেটে যায় ১৪ বছর। মাত্র ২৮ বছর বয়সে প্রবল জ্বরে অসুস্থ হয়ে পড়েন তরুণ সুলতান প্রথম আহমদ। তিনি বুঝতে পারেন, আর বেশি দিন বাঁচার আশা নেই তাঁর। মৃত্যুশয্যায় তিনি তাঁর ভাই মুস্তফাকে পরবর্তী উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেন।

১৬১৭ সালে তাঁর মৃত্যুর পর উসমানি সাম্রাজ্যের নতুন সুলতান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন সুলতান মুস্তফা। অত্যন্ত দুর্বল ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতার অধিকারী এই সুলতানকে কেউ মেনে নিতে পারেননি। তিনি নিজেও কখনো সুলতান হতে আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু সুলতান আহমদের প্রবর্তিত প্রথা অনুযায়ী তাঁর মৃত্যুর পর উসমানি পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য হিসেবে তাঁর কাঁধে অর্পিত হয় উসমানি সাম্রাজ্য শাসনের ভার।

তিন মাস পর সুলতান মুস্তফাকে পদচ্যুত করে বন্দী রাখা হয়। এরপর সুলতান আহমদের পুত্র দ্বিতীয় উসমান ১৫তম/// নতুন সুলতান হিসেবে সিংহাসনে বসেন। এর কিছুকাল পর দুঃখজনকভাবে হত্যা করা হয় সুলতান দ্বিতীয় উসমানকে।

১৬২২ সালের মে মাসে আবারও ক্ষমতায় বসানো হয় সুলতান মুস্ত ফাকে। এবার তাঁর স্থায়িত্ব ছিল দেড় বছর। ১৬২৩ সালে আবারও তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয় সিংহাসন থেকে।

১৩ বছর বয়সী সুলতান

সুলতান দ্বিতীয় উসমান যখন উসমানি সাম্রাজ্যের অধিপতি হন, তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৩ বছর। ১৬০৪ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৬১৮ সালে তাঁকে উসমানি সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসানো হয়।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এই শিশু সুলতানকে বসিয়ে উসমানি সাম্রাজ্যের সময় ভালো যায়নি। বরং ইস্তাম্বুলসহ বিভিন্ন শহরে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে সে সময়।

সুলতান দ্বিতীয় উসমান শৈশব থেকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছিলেন। তুর্কি ভাষার পাশাপাশি তিনি আরবি, ফারসি, ল্যাটিন, গ্রিক ও ইতালির ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। সাহিত্য ও কবিতার প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল। ছোটবেলা থেকে তাঁর ব্যক্তিত্বে নেতাসুলভ আচরণ ফুটে উঠত। সে কারণেই তাঁকে ভয় পেতেন অন্তঃপুরের নারী কোসম সুলতান এবং দরবারের অন্য স্বার্থবাদী চক্রগুলো।

Scanned with CamScanner

হজ আদায়ে তাঁর প্রবল আগ্রহের কারণে দরবারের সভাসদ ও সেনাবাহিনীর হাতে পদচ্যুত হন ১৮ বছর বয়সী কিশোর সুলতান উসমান। সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে তাঁকে আটক করে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে রশিতে বেঁধে শহরজুড়ে ঘোরানো হয়।

কোসম সুলতানের চক্রান্তে সেকালের ছদরে আজম দাউদ পাশার নির্দেশে তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করে বিদ্রোহীরা। পরবর্তী সময়ে সুলতান উসমানের হত্যাকারী দাউদ পাশাসহ অন্যদেরও হত্যা করা হয়। সে এক রক্তাক্ত ইতিহাস।

প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের বলি হওয়ায় নানা ঘাত-প্রতিঘাত সইতে হয়েছে কিশোর সুলতান উসমানকে। পাঁচ বছরের সংক্ষিপ্ত সুলতানি শাসন তাঁর জীবনপ্রদীপ নিভিয়ে দেয়।

১১ বছর বয়সী সুলতান

১৬২৩ সালে উসমানি সাম্রাজ্যের নতুন অধিপতি হিসেবে যখন সুলতান চতুর্থ মুরাদের নাম ঘোষণা করা হয়, তখন তাঁর বয়স মাত্র ১১ বছর ১ মাস ১৫ দিন। ১৬১২ সালে ইস্তাম্বুলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। উসমানি সাম্রাজ্যের ১৭তম সুলতান হিসেবে সিংহাসনে বসানো হয় সুলতান মুরাদকে।

কিশোর হলেও তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভা ছিল সুলতানি মেজাজসুলভ। বাগদাদ বিজয়সহ অনেকগুলো যুদ্ধ তাঁর শাসনকালকে আলোচিত করে রেখেছে আজ অবধি। এত যুদ্ধবিগ্রহ আর সাম্রাজ্য পরিচালনার গুরুদায়িত্ব অল্প বয়সেই অসুস্থ করে দেয় সুলতান মুরাদকে।

ফলে ১৬ বছরের শাসন শেষে মাত্র ২৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন সুলতান মুরাদ। তাঁর শাসনামলের প্রথম নয় বছর কার্যত তাঁর কোনো প্রভাব বা ক্ষমতা ছিল না। এ সময়ে তাঁর মা কোসম সুলতান সাম্রাজ্য পরিচালনায় সরাসরি হস্তক্ষেপ করতেন। এ নয় বছর উসমানি সাম্রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। তবে পরবর্তী আট বছর তিনি নিজে সাম্রাজ্য পরিচালনার সব কাজ সামাল দিতেন।

কৈশোর ও তারুণ্যে ঘোড়ার প্রতি প্রবল আসক্তি ছিল সুলতান মুরাদের। ঘোড়দৌড়সহ এ-সম্পর্কিত নানা দক্ষতায় তিনি ছিলেন অসাধারণ। কেবল তাঁর আরোহণের জন্য ছিল ৮০০টি তেজি ঘোড়া। কোথাও যাত্রাকালে তাঁর মালপত্র বহনের জন্য ছিল আরও ৫০০ ঘোড়া। এ ছাড়া তাঁর ভান্ডার ও

Scanned with CamScanner

খাজানা বহনের জন্য ছিল আলাদা ৬০০ ঘোড়া। কোথাও যাত্রাকালে তাঁর এবং সঙ্গীদের তাঁবু খাটানোর প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম বহন করা হতো মোট ৮৮০টি ঘোড়ার পিঠে।

অবাক ব্যাপার হলো, এই সুলতান মৃত্যুকালে তাঁর কোনো উত্তরাধিকার রেখে যাননি। তাঁর কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। ফলে তাঁর মৃত্যুর পর উসমানি পরিবারে তার ভাই আহমদ ছাড়া অন্য কোনো পুরুষ উত্তরাধিকারী জীবিত ছিলেন না। এর পেছনে জড়িয়ে আছে পারিবারিক হত্যা ও অনাস্থার রক্তাক্ত ইতিহাস।

Scanned with CamScanner

উসমানি সাম্রাজ্যে সামাজিক শিষ্টাচার

শুক্রবারের আনন্দময় দুপুর

উসমানি সাম্রাজ্যের রাজধানী ইস্তাম্বুলে প্রতি শুক্রবার ঈদের আবহ বিরাজ করত। শহরের ধনী ও গরিব এবং দেশ-বিদেশ থেকে আসা পর্যটকেরা এ দিনটি উপভোগ করতেন উৎসবমুখর পরিবেশে।

দুপুরে জুমার নামাজের আগে শহরজুড়ে বড় বড় মসজিদগুলোর সামনে তাঁবু ও শামিয়ানা টানানো হতো। জুমার নামাজ শেষে এসব তাঁবুতে স্থানীয় নাগরিক ও ভিনদেশি পর্যটক-নির্বিশেষে সবার জন্য বিশেষ খাবারের আয়োজন থাকত।

শহরবাসী তো বটেই, বিদেশি পর্যটকেরাও এদিন সবার সঙ্গে মিলেমিশে এসব তাঁবুতে দুপুরের ভোজে অংশ নিতেন। পরিচয়পর্ব ও কুশল বিনিময়ের মধ্য দিয়ে শহরবাসী আপন করে নিতেন সবাইকে। মধ্যদুপুরের ওই সময়ে ইস্তাম্বুল শহরে খাবারের সুঘ্রাণ ও আতিথেয়তার মুগ্ধকর পরিবেশ উসমানি সাম্রাজ্যে সামাজিক শিষ্টাচারের অন্যতম উদাহরণ ছিল।

ইস্তাম্বুলের দালানকোঠা

ইস্তাম্বুলে কোনো বিদেশি পর্যটক এলে শহরের ভবনগুলোর নান্দনিকতা তাঁদের মুগ্ধ করত। প্রাচ্য ও আরবীয় এবং পাশ্চাত্য ও বলকানের স্থাপত্যশৈলীর সমন্বয়ে বানানো এসব দালান-ইমারত পুরো ইস্তাম্বুল শহরকে ছবির মতো সুন্দর করে সাজিয়েছিল।

উসমানি সাম্রাজ্যে সেকালের স্থপতি ও প্রকৌশলীরা তাঁদের মেধা ও সৃজনশীলতার সমন্বয়ে এই রাজধানী গড়ে তুলেছিলেন দৃষ্টিনন্দন সৌন্দর্যের অপরূপ আবহে। বিশেষ করে, উসমানি সুলতানদের আবাসস্থল তোপকাপি প্রাসাদের নির্মাণশৈলী অন্য সব ইমারতের চেয়ে উচ্চতা ও আকারে যেমন বিশাল ছিল, তেমনি এর সাজসজ্জা ছিল রূপকথার নগরীর মতো।

Scanned with CamScanner

বাকির খাতা পরিশোধ

উসমানি সুলতানদের সুদীর্ঘ শাসনামলে সাধারণ মানুষের মধ্যে আর্থিক সচ্ছলতা ছিল। বড় বড় শহরে ধনী ও বিত্তবান মানুষের সংখ্যা ছিল অনেক। সমাজের উচ্চবিত্তের লোকেরা সাধ্যমতো গরিব ও অসহায় শ্রেণির মানুষের পাশে দাঁড়াতেন।

অনেক বিত্তবান ব্যক্তি গোপনে বিভিন্ন এলাকায় মুদি দোকানগুলোতে গিয়ে সেখানকার স্থানীয় গরিব মানুষের নামে রাখা বাকি হিসাবের খাতা চাইতেন। তারপর যেসব গরিব মানুষ ওইসব দোকান থেকে বাকিতে পণ্য নিত, তাদের সব ঋণ পরিশোধ করে দিতেন তাঁরা। এই পুণ্যময় কাজে সব সময় নিজের নাম গোপন রাখতেন দানশীল ব্যক্তি।

ফলে মাস শেষে দরিদ্র লোকেরা যখন মূল্য পরিশোধের সময় দোকানে আসত, দোকানদার হাসিমুখে তাদের জানিয়ে দিত, অজ্ঞাত একজন হৃদয়বান ব্যক্তি এসে আপনাদের সবার হিসাব মিটিয়ে গেছেন।

উসমানি শাসনামলে বিত্তবান সমাজে এ মহতী প্রথা খুব স্বাভাবিক হিসেবে প্রচলিত ছিল।

স্বামী-স্ত্রীর মানবিক সম্পর্ক

উসমানি যুগে যে সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন শহরে, এর সামাজিক সৌন্দর্য আজকের আধুনিক সভ্য সমাজে বিরল বলা চলে। সেকালের পরিবারগুলোতে স্বামী ও স্ত্রীর আচরণে পারস্পরিক সম্মান ও ভালোবাসা ফুটে উঠত। তাঁদের মধ্যে একটি বিষয় খুবই সাধারণ হিসেবে প্রচলিত ছিল, এতে ওই সময়ের সাধারণ মানুষের মানবিক উদারতা ও নারীর প্রতি তাঁদের সম্মানের মাত্রা বোঝা যায়।

ইস্তাম্বুল এবং অন্যান্য শহরে দেখা যেত, সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার সময় স্ত্রী আগে উঠতেন এবং তাঁর পেছনে স্বামী থাকতেন। কারণ, সিঁড়িতে পা পিছলে বা হোঁচট খেয়ে স্ত্রী পড়ে গেলে স্বামী যেন তাঁকে রক্ষা করতে পারেন। কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় স্ত্রী পেছনের সিঁড়িতে এবং স্বামী সামনের সিঁড়িতে থাকতেন, যাতে স্ত্রী পড়ে গেলে স্বামী ঢাল হিসেবে তাঁর সামনে থাকেন।

Scanned with CamScanner

অনন্য আতিথেয়তা

উসমানি সাম্রাজ্যের রাজধানী ইস্তাম্বুলসহ দূর-দূরান্তের শহর ও নগরে অতিথির আচরণ দেখে গৃহকর্তা বুঝতে পারতেন, আগত অতিথি ক্ষুধার্ত নাকি এইমাত্র খেয়ে এসেছেন।

কারণ, কোনো বাড়িতে অতিথি এলে গৃহকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর সামনে গরম কফি ও ঠান্ডা পানি–দুটোই পরিবেশন করা হতো। আগত অতিথি যদি প্রথমে ঠান্ডা পানি পান করেন তবে গৃহকর্তা বুঝতেন, আগন্তুক ব্যক্তি ক্ষুধার্ত। আর যদি অতিথি প্রথমে গরম কফির পেয়ালায় চুমুক দেন, তবে গৃহকর্তা নিশ্চিন্ত হতেন, অতিথি এই মুহূর্তে ক্ষুধার্ত নন।

বড়দের সম্মান

উসমানি সুলতানদের আমলে জনসাধারণের সমাজে বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করা ছিল অতি আবশ্যক সামাজিক বিষয়। এমনকি বয়সে বড় কেউ রাস্তায় হাঁটার সময় ছোটরা তাঁকে অতিক্রম করত না। কারও তাড়াহুড়ো থাকলে প্রয়োজনে সে অন্য পথে চলে যেত, কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠ কাউকে অতিক্রম করে যাওয়ার মতো অশোভন কাজ ছোটদের আচরণে প্রকাশ পেত না।

লাল গোলাপ-হলুদ গোলাপ

উসমানি শাসনামলে কোনো সাধারণ মানুষের বাড়ির সামনে হলুদ রঙের গোলাপ ফুল রাখা থাকলে বোঝা যেত, ওই বাড়িতে অসুস্থ মানুষ রয়েছে। ফলে ওই বাড়ির সামনে দিয়ে যাতায়াতকালে পথচারীরা নীরব থাকত বা নিচু স্বরে কথা বলত, যাতে অসুস্থ ব্যক্তির কষ্ট না হয়।

আর যেসব বাড়ির সামনে লাল গোলাপের ডালি রাখা থাকত, ওই বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় লোকেরা বুঝে নিত, এই বাড়িতে বিয়ের উপযুক্ত কন্যা রয়েছে। ফলে বিবাহযোগ্য পাত্রের অভিভাবকেরা ওই বাড়িতে প্রস্তাব পাঠাতেন। পাশাপাশি স্থানীয় তরুণেরা ওই বাড়ির আশপাশে আড্ডা দেওয়া অথবা অশালীন কথা বলা থেকে বিরত থাকত।

Scanned with CamScanner

পাত্রের কপালে এবং হাঁটুতে

উসমানি সাম্রাজ্যের সর্বত্র ইসলামি সংস্কৃতির চর্চা ছিল। ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামের আদর্শ সবার প্রথম পছন্দ ছিল।

ফলে পাত্র নির্বাচনকালে পাত্রীপক্ষের অভিভাবকেরা ছেলের কপাল এবং হাঁটু পরখ করে দেখতেন। কারণ, পাত্র যদি নিয়মিত নামাজি হয়ে থাকে, তবে অবশ্যই তার কপাল এবং হাঁটুতে এর নিদর্শন হিসেবে দাগ থাকবে।

খ্রিষ্টান-মুসলিমের পারস্পরিক সম্পর্ক

উসমানিদের শাসনামলে সাধারণ মানুষের সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল। খ্রিষ্টানরা যেমন মুসলমানদের পারিবারিক উৎসবে যোগ দিত, তেমনি মুসলিমরাও তাদের প্রতিবেশী খ্রিষ্টানদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিত।

সেকালে দুই ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে উদারতা ও সৌহার্দ্যমূলক পরিবেশ বিরাজ করত। পবিত্র রমজান মাস এলে খ্রিষ্টানরা তাদের সন্তানদের বারণ করত তারা যেন দিনের বেলায় প্রকাশ্যে কোথাও কোনো ধরনের খাবার গ্রহণ না করে।

পাগড়ির মর্যাদা

উসমানি শাসনামলে সুলতান থেকে শুরু করে সাধারণ সমাজে বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষ মাথায় পাগড়ি ব্যবহার করত। প্রত্যেকের পেশা ও মর্যাদা অনুযায়ী তাদের পাগড়ির আকৃতি ও ধরন ছিল ভিন্ন ভিন্ন। এই পাগড়ি দেখে যে কারও পেশা এবং মর্যাদা বোঝা যেত।

জহরতি মিনারা

সুলতান সুলায়মান যখন ইস্তাম্বুলের বিখ্যাত মসজিদ জামে ইস্তাম্বুল নির্মাণের কাজ শুরু করেন, তখন তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন ও সম্প্রীতি বাড়াতে পারস্য সাম্রাজ্যের রাজা ইসমাইল এক বাক্সভর্তি হীরা-জহরত পাঠিয়েছিলেন। রাজা ইসমাইল আরজি জানিয়েছিলেন, এই এক বাক্স মণি-মুক্তা বিক্রি করে এর অর্থমূল্য যেন জামে ইস্তাম্বুল নির্মাণে ব্যয় করা হয়।

Scanned with CamScanner

সুলতান সুলায়মান এই উপহার গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এসব মণি-মুক্তা বিক্রি করে পাওয়া অর্থে জামে ইস্তাম্বুলের সুউচ্চ মিনার তৈরি করেছিলেন। এই সুরম্য মিনারের নামকরণ করা হয় 'জহরতি মিনারা'।

প্যারিসের গাছপালা

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের প্রধান প্রধান সড়কের দুই পাশজুড়ে যে সবুজ গাছগাছালি আজও পুরো শহরকে সবুজ সৌন্দর্যে সাজিয়ে রেখেছে, এসব গাছপালা ১৬১৫ সালে উসমানি সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে প্যারিস নগরীকে সাজানোর জন্য উপহার হিসেবে পাঠানো হয়েছিল।

Scanned with CamScanner

উসমানি সাম্রাজ্যে যা কিছু প্রথম

- উসমানি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর প্রথম যুদ্ধ হয় ১২৮৪ সালে। আর্মেনীয়দের বিপক্ষে প্রথম সামরিক যুদ্ধে অংশ নেয় সেকালের উসমানি সেনারা।
- সুদীর্ঘ শাসনামলে উসমানি সুলতান হিসেবে প্রথমবারের মতো ব্রিটেনের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিলেন সুলতান আব্দুল মজিদ। হারবুল কারম নামের প্রসিদ্ধ এক যুদ্ধ চলাকালে সুলতান এই ঋণ নেন।
- উসমানি সালতানাতের মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রথম দ্বীপের নাম ইমরালি। ১৩০৮ সালে মারমারা সাগরের এই দ্বীপ দখল করে নেয় উসমানি সেনাবাহিনী।
- প্রথম উসমানি সুলতান হিসেবে ইউরোপ সফরে যান সুলতান আব্দুল আজিজ। ১৮৬৭ সালে তিনি ৪৪ দিনব্যাপী দীর্ঘ সফরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে উসমানি সালতানাত প্রথমবারের মতো যুদ্ধবিমান ব্যবহার করে।
- প্রথম যে ভূখণ্ড উসমানি সাম্রাজ্যের মানচিত্র থেকে অন্যের দখলে চলে যায়, সেটি আলজেরিয়া।
- ১৩২৭ সালে উসমানিদের শাসনামলে প্রথমবারের মতো ছাপাখানা স্থাপিত হয়। সে সময় উসমানি সাম্রাজ্যের শাসক ছিলেন সুলতান তৃতীয় আহমদ।
- উসমানি সুলতানদের মধ্যে প্রথম কবি হিসেবে পরিচিতি পান সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ।
- যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত প্রথম সুলতানের নাম সুলতান প্রথম মুরাদ। কসোভোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলাকালে ১৩৮৯ সালে তিনি শহীদ হন।
- ফসফরাস প্রণালির ওপর প্রথমবারের মতো সেতু নির্মাণ করা হয় সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের আমলে।

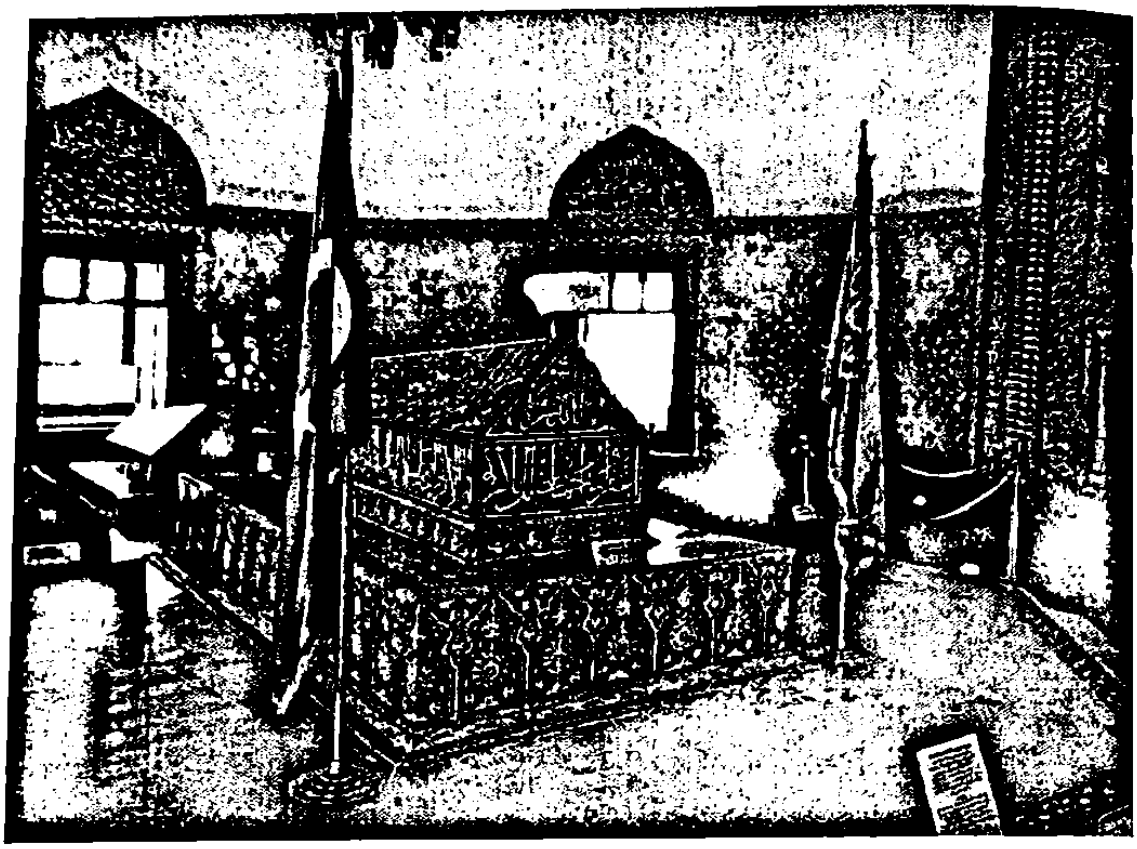
Scanned with CamScanner

- সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহ প্রথম সুলতান, যাঁকে ইস্তাম্বুলে দাফন করা হয়।
- ইস্তাম্বুলে নিহত হওয়া প্রথম সুলতানের নাম সুলতান দ্বিতীয় উসমান।
- প্রথমবারের মতো শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় সুলতান উরখান গাজির আমলে। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সঙ্গে ১৩৩০ সালে তিনি ওই শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।
- প্রথম উসমানি বিদ্যাপীঠ তৈরি করা হয় সুলতান উরখান গাজির আমলে আনাতোলিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের শহর এজনিকে।
- উসমানি সাম্রাজ্যের প্রথম উজিরের নাম আলাউদ্দিন পাশা।
- উসমানি সুলতানদের মধ্যে সর্বপ্রথম স্বেচ্ছায় ক্ষমতা থেকে পদত্যাগ করেন সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ।
- সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে উসমানি সাম্রাজ্য শাসন করেন সুলতান সুলায়মান আলকানুনি। তাঁর পুরো শাসনামলের মেয়াদ ছিল ৪৬ বছর।
- উসমানি সুলতানদের মধ্যে প্রথম এবং একমাত্র সুলতান হিসেবে শখের বশে পিয়ানো বাজাতেন সুলতান পঞ্চম মুরাদ।
- প্রথম উসমানি সুলতান হিসেবে পাগড়ি ব্যবহারের প্রচলন শুরু করেন সুলতান বায়েজিদ।
- সুলতান দ্বিতীয় সেলিম প্রথম সুলতান, যিনি ইস্তাম্বুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইস্তাম্বুলেই মৃত্যুবরণ করেন।
- ফরাসি ভাষা থেকে তুর্কি ভাষায় অনুবাদের জন্য প্রথম অনুবাদকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল সুলতান তৃতীয় সেলিমের শাসনামলে।
- উসমানি সাম্রাজ্যে প্রকাশিত প্রথম পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন একজন তুর্কি নাগরিক, যিনি আফ্রিকি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর গায়ের রং কালো হওয়ায় আফ্রিকার মানুষের সঙ্গে সাদৃশ্য ছিল। এ জন্যই তাঁকে এই নামে চিনত শহরবাসী। সুলতান আব্দুল আজিজের শাসনামলে প্রথম পত্রিকা প্রকাশ করেন তিনি।
- সুলতান ওয়াহিদউদ্দীন প্রথম উসমানি সুলতান, যিনি সব সময় চশমা ব্যবহার করতেন।

Scanned with CamScanner

- উসমানি সাম্রাজ্যে শিশুদের জন্য বিশেষায়িত হাসপাতাল তৈরি করেন সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ। ১৮৯৯ সালের ৫ জুন ইস্তাম্বুলের শিশলিতে এ হাসপাতাল উদ্বোধন করা হয়।
- সুলতান সুলায়মানের ছদরে আজম ছমির পাশা এত মোটা ছিলেন যে তাঁর আরোহণের জন্য সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে দুটি ঘোড়া বন্দোবস্ত করতে হতো।
- ৬২৪ বছরের বেশি শাসনামলে মাত্র একজন মার্কিন প্রেসিডেন্ট উসমানি সাম্রাজ্য পরিদর্শনে এসেছিলেন। তাঁর নাম ইউলিসিস গ্র্যান্ট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৮তম এই প্রেসিডেন্ট সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের শাসনামলে ইস্তাম্বুলে যান। তার আগে বা পরে আর অন্য কোনো মার্কিন রাষ্ট্রনায়ক উসমানি সাম্রাজ্যে যাননি।

Scanned with CamScanner



উসমানি সুলতানদের মৃত্যু

উসমানি সাম্রাজ্যের উত্থান থেকে পতন পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়ে উসমানিদের সুবিশাল ভূখণ্ডের শাসনকর্তা ছিলেন মোট ৩৬ জন। প্রত্যেক সুলতানের জন্ম ও বেড়ে ওঠা এবং সিংহাসনে আরোহণের প্রেক্ষাপট যেমন ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি তাঁদের মৃত্যুও হয়েছে বিভিন্নভাবে।

কোনো সুলতান স্বাভাবিক অবস্থায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন, কেউ অসুস্থ হয়ে শায়িত হয়েছেন মৃত্যুশয্যায়। কেউ যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হয়েছেন তো কেউ বিদ্রোহী সেনাদের হাতে নিহত হয়েছেন।

খুব সংক্ষেপে এখানে ৩৬ জন সুলতানের মধ্যে প্রসিদ্ধ সুলতানদের মৃত্যুর কারণগুলো তুলে ধরা হলো।

সুলতান উসমান গাজি

উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান উসমান গাজির মৃত্যু হয় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে, ১৩২৬ সালে।

Scanned with CamScanner

সুলতান উরখান গাজি

সুলতান উসমান গাজির পুত্র সুলতান উরখান গাজিকে উসমানি সাম্রাজ্যের আনুষ্ঠানিক জনক হিসেবে ধরা হয়। কারণ, তিনিই সর্বপ্রথম সাম্রাজ্যের আনুষ্ঠানিক রীতিনীতি প্রবর্তন করেন। নতুন সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে বোর্সা শহর নির্ধারণ করা এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় দপ্তর ও সেনাবাহিনী গঠন করেন তিনি।

প্যারালাইসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন কীর্তিমান এই সুলতান।

সুলতান প্রথম মুরাদ

সুলতান প্রথম মুরাদ একমাত্র সুলতান, যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের হাতে শহীদ হয়েছেন। ১৩৮৯ সালে সার্বিয়া বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষে শত্রুপক্ষের এক প্রতারক সেনার আক্রমণে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি।

সুলতান প্রথম মুহাম্মদ

শিকারকালে ঘোড়া থেকে পড়ে আহত হয়ে কিছুদিন পর মৃত্যুবরণ করেন সুলতান প্রথম মুহাম্মদ। এ ঘটনা ঘটে ১৪২১ সালে।

শিকারের প্রতি প্রবল আকর্ষণে তিনি প্রায়ই বনে-জঙ্গলে শিকার করতে বের হতেন। একদিন শিকারকালে হঠাৎ ঘোড়া থেকে পড়ে যান তিনি। এ আঘাতে তাঁর শরীর অবশ হয়ে পড়ে এবং কয়েক দিন পরই পরপারে পাড়ি জমান উসমানি সাম্রাজ্যের চতুর্থ এই সুলতান।

সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহ

ইস্তাম্বুল বিজেতা সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহ, উসমানি সাম্রাজ্যের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল এবং প্রসিদ্ধ এই মহানায়ক মৃত্যুবরণ করেন মিসর জয়ের অভিযানে রওনা হওয়ার পর। যাত্রাপথে তাঁর এই মৃত্যুর কোনো কারণ আজ পর্যন্ত জানা যায়নি। এমন রহস্যজনক মৃত্যু আর কোনো সুলতানের হয়নি উসমানিদের ইতিহাসে।

Scanned with CamScanner

সুলতান বায়েজিদ

জনমনে রহস্যঘেরা মৃত্যু হয় সুলতান বায়েজিদের। কিছু ঐতিহাসিকের দাবি, তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। আবার কেউ বলছেন, তিনি তাঁর পুত্র সুলতান সেলিমের হাতে নিহত হন।

সুলতান সেলিম

সুলতান সেলিম উসমানি সাম্রাজ্যের ইতিহাসে বিশেষ কারণে প্রসিদ্ধ। কারণ, তাঁর হাতেই শাম অঞ্চল ও মিসর উসমানি মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৫২০ সালে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন এই যোদ্ধা সুলতান। এমন ক্যানসারে তাঁর আগে আর কোনো উসমানি সুলতান আক্রান্ত হননি।

সুলতান সুলায়মান

শত্রুপক্ষের আঘাতে নয়, বরং যুদ্ধযাত্রায় মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে মৃত্যু হয় প্রসিদ্ধ সুলতান সুলায়মান কানুনির। উসমানি সাম্রাজ্যে নানা কারণে জনপ্রিয় এই সুলতান মারা যান ১৫৬৬ সালে।

সুলতান দ্বিতীয় সেলিম

সুলতান সুলায়মান আলকানুনির মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন সুলতান দ্বিতীয় সেলিম। গোসলখানায় পা পিছলে পড়ে যান তিনি। এতে বুকের ভেতর রক্তক্ষরণ শুরু হয় এবং এভাবেই মৃত্যু হয় তাঁর। সময়ের খাতায় তখন ১৫৭৪ সাল।

সুলতান তৃতীয় মুহাম্মদ

সুলতান তৃতীয় মুহাম্মদ খুব বেশি দিন শাসনকাজ পরিচালনার সুযোগ পাননি। ১৬০৩ সালে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর।

Scanned with CamScanner

সুলতান মুস্তফা

সুলতান তৃতীয় মুহাম্মদের পর উসমানি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন সুলতান মুস্তফা। কিছু ইতিহাসবিদের কাছে তিনি 'মানসিক প্রতিবন্ধী সুলতান' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। মৃগী রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয় ১৬৩৯ সালে।

সুলতান দ্বিতীয় উসমান

পদমর্যাদায় সুলতানের পর যাঁর অবস্থান, তিনি 'ছদরে আজম'। এই ছদরে আজম এবং অন্য মন্ত্রীদের ষড়যন্ত্রে একদল দুর্বৃত্তের হাতে নির্দয়ভাবে নিহত হন সুলতান দ্বিতীয় উসমান। রাষ্ট্রীয় চক্রান্তকারীদের হাতে এমন নির্মম মৃত্যুর ঘটনা উসমানিদের ইতিহাসে এটাই প্রথম।

সুলতান ইবরাহিম

সুলতান দ্বিতীয় উসমানের হত্যাকাণ্ডের পর ষড়যন্ত্রের ডালপালা আবারও ছড়িয়ে পড়ে। ফলে তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী সুলতান ইবরাহিম একইভাবে ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে নিহত হন। ইতিহাসের পাতায় তখন ১৬৪৮ সাল।

সুলতান পঞ্চম মুহাম্মদ

সুলতান ইবরাহিমের পর সুবিশাল উসমানি সাম্রাজ্যের হাল ধরেন দৃঢ়চেতা ও সাহসী সুলতান পঞ্চম মুহাম্মদ। ১৬৯৪ সালে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সুলতান দ্বিতীয় সুলায়মান

সুলতান মুহাম্মদের মৃত্যুর পর উসমানি সাম্রাজ্যের অধিকর্তা হন সুলতান দ্বিতীয় সুলায়মান। শারীরিক অসুস্থতা ছাড়েনি তাঁকেও। ১৬৯৫ সালে কিডনি রোগে আক্রান্ত হন তিনি। এভাবে অসুস্থ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন এই সুলতান।

Scanned with CamScanner

সুলতান দ্বিতীয় মুস্তফা

১৭০৩ সালে বিশৃঙ্খল সেনাদের এক সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন সুলতান দ্বিতীয় মুস্তফা। ক্ষমতাচ্যুতির কিছুদিন পর ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান তিনি।

সুলতান তৃতীয় মুহাম্মদ

শুধু কিডনি বা ক্যানসার রোগ নয়, বরং ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে উসমানি সুলতানদের মধ্যে। সে রকমই একজন সুলতান তৃতীয় মুহাম্মদ। ১৭৩৬ সালে মারা যান তিনি।

সুলতান প্রথম মাহমুদ

১৭৫৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন সুলতান তৃতীয় মুহাম্মদের পর ক্ষমতা গ্রহণকারী সুলতান প্রথম মাহমুদ। হঠাৎ পড়ে গিয়ে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে মৃত্যু হয় তাঁর।

সুলতান প্রথম আব্দুল হামিদ

১৭৮৯ সালে তৎকালীন সুলতান প্রথম আব্দুল হামিদের মৃত্যুর কারণ একটু ভিন্ন। বর্তমান রাশিয়া তখন উসমানি সাম্রাজ্যের অধীন একটি অঞ্চল। সেখানকার একটি দুর্গ দখলে নেয় রাশিয়ান বাহিনী। এ খবর শুনে সহ্য করতে পারেননি সুলতান। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ শুরু হয় তাঁর। একপর্যায়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি।

সুলতান তৃতীয় সেলিম

সুলতান প্রথম আব্দুল হামিদের মৃত্যুর পর উসমানি সাম্রাজ্যের হাল ধরেন সুলতান তৃতীয় সেলিম। ১৮০৮ সালে তাঁর ভাই সুলতান চতুর্থ মুস্তফার সমর্থকদের হাতে নিহত হন তিনি।

সুলতান তৃতীয় মুহাম্মদ

১৮৩৯ সালে সুলতান তৃতীয় মুহাম্মদ মারা যান যক্ষ্মা রোগে।

Scanned with CamScanner

সুলতান আব্দুল মজিদ

সুলতান তৃতীয় মুহাম্মদের পর ক্ষমতার মসনদে বসেন তাঁর পুত্র সুলতান আব্দুল মজিদ। উসমানি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন খাতে সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের কারণে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। তবে পিতার মতো যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় তাঁরও।

সুলতান আব্দুল আজিজ

সুলতান আব্দুল মজিদের পর সুলতানের খেতাব জোটে সুলতান আব্দুল আজিজের ভাগ্যে। ১৮৭৬ সালে উচ্ছৃঙ্খল সেনাদলের এক বিদ্রোহে ক্ষমতাচ্যুত হন তিনি। এর পরই রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয় তাঁর। এই রহস্য আজও জানা যায়নি।

সুলতান পঞ্চম মুরাদ

১৯০৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন সুলতান পঞ্চম মুরাদ। ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর।

সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ

ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসে উসমানি সাম্রাজ্যের পতনকাল। চারদিকে দুঃসময়ের সংকটকালেও সাহসিকতামূলক ভূমিকার কারণে আজও মুসলমানদের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ। ১৯১৮ সালে তিনি মারা যান নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে।

সুলতান মুহাম্মদ রাশাদ

সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর কেবলই প্রথাগতভাবে ক্ষমতার আসন গ্রহণ করেন তাঁর ভাই সুলতান মুহাম্মদ রাশাদ। কিন্তু অল্প কিছুদিন পর তিনি মারা যান ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়ে।

সুলতান ওয়াহিদউদ্দীন

উসমানি সাম্রাজ্যের ইতিহাসে সুলতান বা খলিফা হিসেবে যাঁর নাম তালিকায় সবার শেষে, তিনি সুলতান ওয়াহিদউদ্দীন। ১৯২৬ সালে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন তিনি।

Scanned with CamScanner

উসমানি সুলতানদের হজ

সুদীর্ঘ ৬২৪ বছর ধরে যে ৩৬ জন সুলতানের হাতে শাসিত হয়েছে উসমানি সাম্রাজ্য, তাঁদের কেউই হজ করেননি। মুসলিম সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েও হজ আদায় করা থেকে বিরত থাকার পেছনে কিছু কারণ রয়েছে। তুর্কি ও আরব ঐতিহাসিকেরা এ প্রসঙ্গে যা লিখেছেন, এর সারমর্ম নিয়ে এই অধ্যায়।

ইসলামি শরিয়তে হজ আবশ্যক হওয়ার জন্য যেসব শর্ত রয়েছে, সেগুলো হচ্ছে হজ আদায়ে ইচ্ছুক ব্যক্তি মুসলমান, প্রাপ্তবয়স্ক এবং সঠিক বুদ্ধিজ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। পাশাপাশি হজ আদায়ে যাবতীয় ব্যয় নির্বাহে তার সক্ষমতা এবং হজ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকতে হবে। সর্বোপরি হজ আদায়ে যাওয়া-আসার পথটি নিরাপদ থাকতে হবে।

এই শেষ শর্তটি উসমানি সুলতানদের বেলায় অনুপস্থিত ছিল। কারণ, সুলতান হিসেবে তাঁদের ওপর ভিনদেশি শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা থাকায় সুদূর তুরস্ক থেকে মক্কা-মদিনার উদ্দেশে যাত্রাপথ কখনো নিরাপদ ছিল না।

এ ছাড়া ইসলামের পতাকা সমুন্নত করতে খ্রিষ্টান শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই ফরজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যদিও সাধারণ মুসলমানদের বেলায় জিহাদ ফরজে কিফায়া হওয়ায় হজের গুরুত্ব জিহাদের চেয়েও বেশি, কিন্তু শাসক ও সুলতানদের বেলায় এটি ভিন্ন হয়ে থাকে। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামি সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা এবং খ্রিষ্টান শত্রুর হাত থেকে সাধারণ মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করা না যাবে, ততক্ষণ শাসক হিসেবে তাঁদের ওপর হজের আবশ্যকতা কার্যকর ধরা হবে না। কারণ, সর্বসাধারণের জীবন ও সম্পদ রক্ষার গুরুদায়িত্ব শাসকদের বেলায় ব্যক্তিগত ইবাদতের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে।

সুলতান দ্বিতীয় সেলিম পর্যন্ত প্রায় সব সুলতানের জীবনে বেশির ভাগ সময় কেটেছে রণাঙ্গনে। সেকালের শায়খুল ইসলামরা তাই সুলতানদের বেলায় হজের চেয়ে জিহাদের গুরুত্ব বেশি বলে ফতোয়া দিতেন।

Scanned with CamScanner

সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদ শাহজাদা থাকাকালে যখন আমাসিয়া শহরের প্রাদেশিক গভর্নর ছিলেন, তখন তিনি হজে যেতে মনস্থির করলেন। এ খবর শুনে তৎকালীন শায়খুল ইসলাম তাঁকে জরুরি ভিত্তিতে রাজধানীতে ফিরে এসে সিংহাসনে বসার তাগিদ দিয়ে পত্র লেখেন, যাতে সাম্রাজ্যের অন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের স্বাক্ষর ছিল। তাতে লেখা ছিল, 'হজের বিধান আপনি আপনার পরিবার এবং সাধারণ মানুষের ওপর ছেড়ে দিন, যাদের কাঁধে সাম্রাজ্য পরিচালনার গুরুদায়িত্ব অর্পিত নেই। আপনার হজযাত্রা ভিনদেশি শত্রুদের উসকানি দেবে এবং তারা এই মুসলিম সাম্রাজ্যের ওপর চড়াও হতে উৎসাহিত হবে।'

উসমানি সুলতানদের মধ্যে হজে যেতে সবচেয়ে বেশি উদ্‌গ্রীব ও ব্যাকুল ছিলেন সুলতান দ্বিতীয় উসমান। তাঁকে হজে যেতে বারণ করে সেকালের শায়খুল ইসলাম এবং সুলতানের শ্বশুর আসাদ আফেন্দি ফতোয়া দিয়ে বলেছিলেন, 'সুলতানদের ওপর হজ ফরজ নয়। বরং এখানে অবস্থান করে ন্যায়সংগতভাবে সাম্রাজ্য পরিচালনা তাঁদের জন্য আবশ্যক কর্তব্য। নয়তো সংঘাত ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থেকে যায়।'

সুলতান দ্বিতীয় উসমানকে হত্যা ষড়যন্ত্রের সব পরিকল্পনা ছিল অন্ত ঃপুরের নারী কোসম সুলতানের। তাঁর কৌশলে সুলতানের ব্যক্তিগত শিক্ষক উমর আফেন্দি এবং অন্তঃপুরে অভ্যন্তরীণ-বিষয়ক দায়িত্বশীল সুলায়মান বারবার সুলতান দ্বিতীয় উসমানকে হজে যেতে প্ররোচিত করতেন। কিন্তু উসমানি সেনাবাহিনীর সামরিক নেতারা এবং তৎকালীন শায়খুল ইসলাম তাঁকে হজে যেতে নিষেধ করেন।

হজে যেতে সুলতান দ্বিতীয় উসমানের আগ্রহ দেখে ক্ষুব্ধ হয় একদল সৈনিক। তারা সুলতানের শিক্ষক উমর এবং অন্তঃপুরের কর্মকর্তা সুলায়মানকে হত্যা করতে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। হজকে কেন্দ্র করে এমন বিশৃঙ্খলা থামাতে মধ্যস্থতা করেন নগরীর আলেমসমাজ। কাজী আসকারের নেতৃত্বে কয়েকজন আলেম সুলতান এবং ক্ষুব্ধ সৈনিকদের বোঝাতে চেষ্টা করেন।

কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে সৈনিকেরা দরবারে ঢুকে পড়ে এবং শাহজাদা মুস্তফাকে বের করে আনে। এরপর জনসমক্ষে সুলতান দ্বিতীয় উসমানকে পদচ্যুত করে নতুন সুলতান হিসেবে শাহজাদা মুস্তফার নাম ঘোষণা করে উত্তেজিত সৈনিকেরা।

আরেকদল বেপরোয়া সৈন্য রাজপ্রাসাদে ঢুকে সুলতান দ্বিতীয় উসমানকে ধরে এনে হাজির করে ওরতা জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে। কোসম সুলতান ও

Scanned with CamScanner

দরবারের ছদরে আজম দাউদ পাশার যৌথ চক্রান্তে একেবারে অসহায় হয়ে পড়েন সুলতান দ্বিতীয় উসমান। সৈন্যরা তাঁকে মসজিদের সামনে রশি দিয়ে বেঁধে ফাঁসিতে ঝোলানোর চেষ্টা করে।

সেখানে ফাঁসিতে ঝোলাতে না পেরে তাঁকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে আসা হয় ইদিকুলা নামের আরেকটি জায়গায়। তারপর সেখানে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় এই নিরপরাধ সুলতানকে। ১৬২২ সালের মে মাসে এ নির্মম ঘটনা ঘটে।

সুলতান দ্বিতীয় উসমানের ওপর সৈনিকদের এমন উন্মত্ততার মূল কারণ ছিল তাঁর সংস্কার কর্মসূচি। তিনি ইঙ্কেশারি বাহিনীর এই শাখার সদস্যদের মধ্যে শুদ্ধি অভিযান চালাতে চেয়েছিলেন। এতে সৈন্যরা খেপে যায় এবং তারা উপযুক্ত সুযোগের সন্ধানে থাকে। রেওয়াজ ভেঙে হজে যেতে সুলতানের আগ্রহ শুনে এই অজুহাতে তাঁকে হত্যা করতে মাঠে নামে বিপথগামী সেনারা।

উসমানি সুলতানদের হজযাত্রা প্রসঙ্গে কেউ কেউ সুলতানদের তুলনা করেছেন বন্দী হিসেবে। কারণ, সাম্রাজ্যের চারপাশে দেশি ও ভিনদেশি শত্রুরা সব সময় সুযোগের অপেক্ষায় থাকত। ফলে সুলতানদের জীবন ছিল নিরাপত্তার কঠিন জালে মোড়ানো। এই অবস্থায় তাঁদের ওপর হজযাত্রা আবশ্যক হওয়ার কথা নয়।

এসব বিবেচনায় বলা চলে, উপযুক্ত নিরাপদ পরিবেশ এবং যাত্রাপথ আশঙ্কামুক্ত না থাকায় হজে যাওয়ার সুযোগ পাননি উসমানি সুলতানরা। তবে প্রতিবছরই তাঁদের পক্ষ থেকে দেশের গুণী ব্যক্তি ও আলেমরা হজে যেতেন।

বলা হয়ে থাকে, সুলতান আব্দুল আজিজ ছদ্মবেশ ধারণ করে হজ আদায় করেছিলেন। তবে এর পক্ষে সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ আমি পাইনি।

Scanned with CamScanner

উসমানি সুলতানদের পারিবারিক হত্যাপ্রথা

ক্ষমতার পথ শত্রুমুক্ত রাখতে আপন বা সৎভাইকে হত্যা করা উসমানি পরিবারে রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল। কেবল ভাই অথবা অন্য নিকটাত্মীয় নয়, বরং নিজের পুত্রকেও নিঃসংকোচে হত্যার আদেশ দিয়েছেন সুলতানরা। এসব হত্যাকাণ্ডের বৈধতায় বিচারপতির আদেশ এবং শায়খুল ইসলামের ফতোয়া জারি করা হতো। ফলে ভাই বা পুত্রহত্যার বিষয়টি কেবল বৈধ নয়, বরং সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হতো।

ইতিহাসে দেখা যায়, ক্ষমতার লোভে হিংসার বশবর্তী হয়ে কোনো কোনো সুলতানের আপন ভাই অথবা সৎভাই বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। কখনো কখনো তাঁরা বিদেশি শত্রুর প্ররোচনায় বিদ্রোহ করার পরিকল্পনায় গোপনে সৈন্য সংগ্রহ করতে গিয়ে ধরা পড়েছেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এসব কর্মকাণ্ড সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে চক্রান্ত হিসেবে অপরাধ বিবেচিত হতো এবং এর পরিণতিতে তাঁদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো।

তবে ষড়যন্ত্রের প্রমাণিত অভিযোগ ছাড়া কেবল সন্দেহের বশবর্তী হয়ে নিরপরাধ পুত্র ও ভাইকে হত্যার মতো অমানবিক এবং নিষ্ঠুর কাজও করেছেন বেশ কয়েকজন সুলতান। তুর্কি ও আরব ঐতিহাসিকদের মধ্যে যাঁরা বিভিন্ন যুক্তিতে উসমানি সুলতানদের কর্মকাণ্ডগুলোকে বৈধ হিসেবে প্রমাণ করতে সব সময় চেষ্টা করে থাকেন, তাঁরাও এই প্রসঙ্গে স্বীকার করেছেন, নিরপরাধ ভাই বা পুত্রসন্তান হত্যার এ নির্মম প্রথা আগাগোড়া অবৈধ ও অগ্রহণযোগ্য।

উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা উসমান বেগের পুত্র উরখান খানের শাসনামল থেকে শুরু হয় এই নিষ্ঠুর হত্যাপ্রথা। সুলতান উরখানের আপন দুই ভাইকে বিদ্রোহের অভিযোগে হত্যা করা হয়। তাঁরা দুজন হলেন খলিল ও ইবরাহিম। সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে বিচারিক প্রক্রিয়ায় তাঁদের হত্যার আদেশ জারি করা হয়।

Scanned with CamScanner

একই অভিযোগে সুলতান উরখান হত্যা করেন তাঁর পুত্র সাওজি বেগকে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, তিনি তাঁর পিতাকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করছেন এবং সৈন্য সংগ্রহ করছেন। এমনকি সেকালের বাইজেন্টাইন সম্রাটের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রক্ষা করছেন মর্মে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

এরপর সুলতান বায়েজিদের আমলে রাজনৈতিক হত্যা আরও বেড়ে যায়। ঘনিষ্ঠ দরবারি লোকদের প্ররোচনায় আপন ভাই ইয়াকুবকে হত্যার আদেশ দেন সুলতান বায়েজিদ। অথচ তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অপরাধ বা ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। বরং ভবিষ্যতে যেন তাঁর কোনো তৎপরতা সুলতান বায়েজিদের ক্ষতির কারণ না হয়, সেই আশঙ্কা থেকে তাঁকে হত্যা করা হয়। এটি উসমানি সুলতানদের ইতিহাসে প্রথম রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড।

উসমানি সাম্রাজ্যের দুর্যোগপূর্ণ সময়ে সুলতান মুহাম্মদ তাঁর ভাইদের সঙ্গে সাম্রাজ্যের শাসন নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। বিদ্রোহের অভিযোগে তিনি হত্যা করেন তাঁর দুই ভাই ইসা ও মুসাকে। এর কদিন পর একই অভিযোগে আরেক ভাই মুস্তফাকেও হত্যা করা হয় তাঁর আদেশে।

ইস্তাম্বুল বিজেতা সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহের বাবা সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদ তাঁর শাসনামলে দীর্ঘকাল আপন চাচা মুস্তফার সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, তিনি বাইজেন্টাইন সম্রাট ম্যানুইলের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্র করে উসমানি সাম্রাজ্যকে বিভক্ত করার পরিকল্পনা করছেন। এই অভিযোগে চাচাকে গ্রেপ্তার করে মৃত্যুদণ্ড দেন সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদ।

এমনই বিদ্রোহের অভিযোগে সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ তাঁর ছোট ভাইকে হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল, কারামান ও কারমিয়ান গোষ্ঠীর প্ররোচনায় তিনি বোর্সা অভিমুখে সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাত্রা শুরু করেছেন।

সুলতান সেলিম তাঁর শাসনামলে নিজের দুই ভাইকে হত্যার আদেশ দেন। তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ইসলামি বিধান অনুযায়ী বিদ্রোহের শাস্তি হিসেবে তাঁদের মৃত্যুদণ্ড দেন তিনি। এর মধ্যে একজন কুরকুত সৈন্য সংগ্রহ করে সুলতান সেলিমকে উৎখাতের পরিকল্পনা করছেন বলে অভিযোগ আনা হয়। আরেক ভাই আহমদ বিদেশি

Scanned with CamScanner

শত্রুর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করছেন মর্মে দোষী সাব্যস্ত হন। পরে তাঁদের দুজনকে গ্রেপ্তার করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

প্রবল প্রতাপশালী সুলতান সুলায়মানের ভাইদের মধ্যে কেউ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনি ঘনিষ্ঠ দরবারি লোকদের কথায় প্ররোচিত হন এবং নিরপরাধ ছেলে মুস্তফাকে হত্যা করেন। অন্তঃপুরের কয়েকজন নারী ও দরবারের সুবিধাবাদীরা তাঁকে বারবার বোঝাতে চেষ্টা করে, শাহজাদা মুস্তফা সুলতানকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে নিজেই ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র করছেন। একসময় সুলতান সুলায়মান এসব কথায় বিশ্বাস করেন এবং ছেলে মুস্তফাকে হত্যা করেন। এর কিছুকাল পর প্রমাণিত হয়, শাহজাদা মুস্তফা ছিলেন পুরোপুরি নিরপরাধ এবং অন্দরমহলের গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার।

সুলতান সুলায়মানের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র বায়েজিদ ও সেলিমের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে প্রবল দ্বন্দ্ব ও বিবাদের সূত্রপাত হয়। বায়েজিদ কিছু সৈন্য সংগ্রহ করে আপন ভাই সেলিমকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। সুলতান সেলিম এই ষড়যন্ত্রের সংবাদে ক্ষুব্ধ হন এবং বায়েজিদকে গ্রেপ্তারের আদেশ করেন। বায়েজিদ পালিয়ে ইরানে আশ্রয় নিলেও ইরানের শাসক তাঁকে তুলে দেন সুলতান সেলিমের হাতে। পরে বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তাঁকে হত্যা করা হয়।

অন্যায়ভাবে পারিবারিক স্বজনদের হত্যায় সুলতান তৃতীয় মুহাম্মদের তুলনা অন্য কারও সঙ্গে হয় না। নিজের ভাই বা পুত্রদের হত্যায় তিনি ধর্ম, সমাজ ও নৈতিকতার সব সীমানা লঙ্ঘন করেছেন। বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের ন্যূনতম সন্দেহ বা আশঙ্কা ছাড়াই তিনি একে একে আপন ১৯ ভাইকে হত্যা করেন। এমনকি নিজের পুত্র মাহমুদকে মিথ্যা ও অমূলক সন্দেহের বশে হত্যা করেন এই সুলতান।

ভাই ও পুত্রকে হত্যার এই নির্মম প্রথায় পরিবর্তন আনেন সুলতান প্রথম আহমদ। তিনি নিয়ম করেন, সুলতানের মৃত্যুর পর উসমানি পরিবারের সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য হবেন পরবর্তী উত্তরাধিকারী।

এ নতুন সিদ্ধান্তের ফলে সুলতান প্রথম আহমদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রের পরিবর্তে উসমানি সিংহাসনে আরোহণ করেন সুলতান মুস্তফা। কারণ, তিনিই তখন উসমানি পরিবারের সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য।

এর মাধ্যমে বন্ধ হয় পারিবারিক হত্যাকাণ্ডের এক নিষ্ঠুর রেওয়াজ, যা কেড়ে নিয়েছে অনেক নিরপরাধ ও নির্দোষ মানুষের প্রাণ।

Scanned with CamScanner

উসমানি সুলতানদের মায়েরা

উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতানদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বময়। ৬২৪ বছর ধরে বিশ্ব রাজনীতিতে উসমানি সুলতানরা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে ছিলেন। সুলতানদের ব্যক্তিগত চরিত্র এবং তাঁদের জীবনযাপন ছিল সবার কৌতূহলের বিষয়। বিশেষ করে, অন্তঃপুর বা হারেম নিয়ে সাধারণ প্রজা এবং বিদেশি অঞ্চলে রূপকথার মতো নানা গল্প-কাহিনি প্রচলিত ছিল।

তবে উসমানি সুলতানদের জন্মদান থেকে শুরু করে তাঁদের ব্যক্তিচরিত্র গঠন এবং যোগ্য শাসক হিসেবে গড়ে তুলতে তাঁদের মায়েরা অসীম অবদান রেখেছিলেন। পিতার উত্তরাধিকার হিসেবে পুত্র যেন দক্ষ হাতে পুরো সাম্রাজ্যের হাল ধরতে পারেন, সে জন্য অন্তঃপুরে থেকে মায়েদের ভূমিকাও ইতিহাসের অংশ। কোনো কোনো উসমানি সুলতানের মা পর্দার আড়াল থেকে পুত্রকে সাম্রাজ্য পরিচালনায় সহযোগিতা করেছেন, আবার কেউ কেউ এ সুযোগে পুত্রের কাজে সরাসরি হস্তক্ষেপও করেছেন সময়ে-অসময়ে।

উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা যাঁর হাতে, তাঁর স্ত্রীর নাম মালহুন খাতুন। উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতান উরখান গাজির গর্ভধারিণী মা তিনি। তাঁর স্বামী যে রাজ্যের গোড়াপত্তন করেছিলেন, সেই রাজ্যের নেতৃত্বে পুত্র উরখান যেন কোনো অবহেলা না করেন, সেভাবেই তাঁকে গড়ে তুলেছিলেন মালহুন খাতুন। বোর্সা শহরে অবস্থিত সুলতানি কবরস্থানে তাঁর কবর রয়েছে।

উসমানি সুলতানদের অন্তঃপুরে প্রথম বিদেশি নারী হিসেবে সুলতানের স্ত্রী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন নিলুফার খাতুন। গ্রিক জাতীয়তার এই নারী সুলতান উরখান গাজির স্ত্রী এবং সুলতান প্রথম মুরাদের মা। তাঁর আসল নাম ছিল হোরোফেরা। বোর্সায় সুলতান উরখান গাজির কবরের পাশে তাঁর কবর রয়েছে।

উসমানি সুলতান বায়েজিদের মায়ের নাম গুলজেজিক। বুলগেরিয়ার বংশোদ্ভূত এই নারীর আসল নাম ছিল মারিয়া। স্বামী সুলতান প্রথম মুরাদের কবরের পাশে তাঁর কবর রয়েছে।

Scanned with CamScanner

সুলতান প্রথম মুহাম্মদের মায়ের নাম ছিল দৌলত খাতুন। কিরমানের শাসক সুলায়মান শাহ উসমানি সুলতান বায়েজিদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে উপহার হিসেবে দৌলত খাতুনকে পাঠিয়েছিলেন। পরে সুলতান বায়েজিদ তাঁকে বিয়ে করেন এবং তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন পরবর্তী সুলতান প্রথম মুহাম্মদ। উসমানি সুলতানের কাছে পাঠানোর সময় দৌলত খাতুনের বাবা সুলায়মান শাহ কন্যাকে কঠিনভাবে নিষেধ করেছিলেন, সে যেন দরবারের কাজে কোনো হস্তক্ষেপ না করে। আমৃত্যু দৌলত খাতুন বাবার আদেশ মেনে চলেছিলেন। বোর্সায় সুলতানি কবরস্থানে তাঁর কবর রয়েছে।

সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের মায়ের নাম আমেনা খাতুন। উসমানি সুলতান প্রথম মুহাম্মদ আনাতোলিয়ার গোত্র দোলকাদের থেকে এই তরুণীকে বিয়ে করেছিলেন। তৈমুর লঙের আক্রমণে উসমানি সাম্রাজ্য যখন লন্ডভন্ড, তখন স্বামীকে মানসিকভাবে শক্তি জুগিয়ে তা উদ্ধারে সাহস দিতেন আমেনা খাতুন। তিনি তাঁর গোত্র এবং আনাতোলিয়ার অন্যান্য গোত্রকে ঐক্যবদ্ধভাবে উসমানি সুলতানের পাশে দাঁড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁর আহ্বান ও প্রচেষ্টায় আনাতোলিয়ার স্থানীয় গোত্রগুলো একসঙ্গে উসমানি সুলতানের নেতৃত্বে তাতারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। মৃত্যুর পর বোর্সা শহরে সুলতানি কবরস্থানে আমেনা খাতুনকে সমাহিত করা হয়।

ইস্তাম্বুল বিজেতা প্রসিদ্ধ সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহের মায়ের নাম হেমা খাতুন। জাতে তিনি তুর্কি ছিলেন না। কিন্তু তাঁর গর্ভে জন্ম নেন প্রতাপশালী সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহ। ঐতিহাসিকদের কাছে তাঁর সম্পর্কে বিশদ কোনো তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

উসমানি ইতিহাসে সাম্রাজ্য পরিচালনা ও প্রশাসনে সবচেয়ে বেশি হস্তক্ষেপ করেছেন যে নারী, তাঁর নাম খুররম সুলতান। তিনি সুলতান সুলায়মানের স্ত্রী এবং সুলতান দ্বিতীয় সেলিমের মা। উসমানি প্রশাসন পরিচালনায় এই নারীর হস্তক্ষেপ সব সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁর প্ররোচনায় সুলতান সুলায়মান নিজের সন্তান শাহজাদা মুস্তফাকে হত্যা করেন। সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের পদচ্যুতি ও হত্যায় খুররম সুলতানের হাত ছিল।

বিদেশি মায়ের সন্তান যেসব সুলতান

উসমানি সাম্রাজ্যের শাসনকর্তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন সুলতান বিদেশি রমণীদের বিয়ে করেছেন। সুলতানদের বিদেশি রমণীদের গর্ভে জন্ম নেওয়া সন্তানদের কেউ কেউ উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতান হয়েছিলেন।

Scanned with CamScanner

উসমানি সাম্রাজ্যের চতুর্থ সুলতান প্রথম বায়েজিদের মা মারিয়া বুলগেরিয়ার বংশোদ্ভূত ছিলেন। সুলতান প্রথম মুরাদ এই নারীকে বিয়ে করেন এবং তাঁর গর্ভে শাহজাদা বায়েজিদের জন্ম হয়।

উসমানি সাম্রাজ্যের সপ্তম সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহের মা হেমা খাতুন সার্বিয়ার নাগরিক ছিলেন। সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ তাঁকে বিয়ে করেন এবং তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ইস্তাম্বুল বিজয়ের এই মহানায়ক।

উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতাপশালী সুলতান সুলায়মানের মা ছিলেন পোল্যান্ডের ইহুদি বংশোদ্ভূত। সুলতান সুলায়মানের বাবা সুলতান প্রথম সেলিম তাঁকে বিয়ে করেন। পরে তাঁর প্রথম নাম হালজা পরিবর্তন করে হাফসা রাখা হয়।

সুলতান সুলায়মানের স্ত্রীদের মধ্যে একজন ছিলেন ইউক্রেনের ইহুদি বংশোদ্ভূত। তাঁর নাম খুররম। এই নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন উসমানি সাম্রাজ্যের ১১তম অধিপতি সুলতান দ্বিতীয় সেলিম।

উসমানি সাম্রাজ্যের ২৭তম শাসক সুলতান প্রথম আব্দুল হামিদ। তাঁর মা সারমি ছিলেন ফরাসি বংশোদ্ভূত। সুলতান তৃতীয় আহমদ তাঁকে বিয়ে করেন।

উসমানি সাম্রাজ্যের ২৮তম উত্তরাধিকারী সুলতান তৃতীয় সেলিমের মা মেহের ছিলেন পারস্য দেশীয় নাগরিক। সুলতান তৃতীয় মুস্তফা এই নারীকে বিয়ে করেন।

সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদের স্ত্রীদের মধ্যে একজন ছিলেন আর্মেনীয় বংশোদ্ভূত। তাঁর নাম ছিল পের্টেভনিয়াল। এই বিদেশি নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন উসমানি সাম্রাজ্যের ৩২তম অধিপতি সুলতান আব্দুল আজিজ।

উসমানি সাম্রাজ্যের ৩১তম সুলতান প্রথম আব্দুল মজিদের মায়ের নাম বেজমিয়ালেম। তিনি ছিলেন জর্জিয়ার ইহুদি বংশোদ্ভূত।

উসমানি সাম্রাজ্যের ৩০তম সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদের মা ফরাসি নাগরিক ছিলেন। তাঁর নাম রিফিরায়।

৩৪তম সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের মা ছিলেন আর্মেনীয় বংশোদ্ভূত। তাঁর নাম ফের্জিন।

৩৬তম সুলতান ওয়াহিদুদ্দীনের মায়ের নাম গুলিস্তান। তিনি শার্কসি বংশোদ্ভূত ছিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : উপরে উল্লেখিত নামগুলোর বানান ও উচ্চারণে তারতম্য হতে পারে।

Scanned with CamScanner

উসমানি সাম্রাজ্যে জীবের প্রতি দয়া

উসমানি সুলতানদের চরিত্রের অন্যতম একটি দিক ছিল পশুপাখির প্রতি দয়া প্রদর্শন। সাম্রাজ্যের সর্বত্র পশুপাখির প্রতি সদাচরণের আদেশ ছিল সুলতানদের। কেবল আদেশ নয়, বরং সব ধরনের পশুপাখির দেখাশোনার জন্য আলাদা কর্মচারী নিয়োগ করা হতো উসমানি সাম্রাজ্যে।

উসমানি সাম্রাজ্যে শীতকালে শৈত্যপ্রবাহ থেকে পশুপাখিকে বাঁচাতে বিশেষ আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করা হতো বিভিন্ন শহরে। এ ছাড়া প্রধান সড়ক ও অলিগলিতে কুকুর, বিড়ালসহ অন্যান্য পশুর জন্য ছোট আকৃতির ঘর বানানো থাকত। নগরবাসী সেসব ঘরে নিজেদের সাধ্যমতো পানি, রুটি ও মাংস রেখে আসত।

উসমানি সাম্রাজ্যের প্রথম রাজধানী বোর্সা শহরে পাখির জন্য বিশেষ হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছিল। এই হাসপাতালের নাম 'গুরবাহানা লাকলাকান'। অসুস্থ বা আহত হয়ে যেসব পাখি উড়তে অক্ষম হয়ে পড়ত, সেসব পাখিকে তুলে এনে এই সেবাকেন্দ্রে চিকিৎসা করানো হতো।

ইস্তাম্বুল বিজেতা সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহ তাঁর শাসনামলে শহর ও নগরে পাখিদের সুরক্ষায় এক সুলতানি আদেশ জারি করেছিলেন। ওই আদেশে বলা হয়, শহরে যেসব নতুন ভবন ও মসজিদ নির্মাণ করা হবে, সেগুলোর উঁচুতে পাখির জন্য আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করতে হবে। এ আদেশের ফলে ইস্তাম্বুল ও অন্যান্য শহরে আবাসিক ভবন নির্মাণের সময় এর চূড়ায় বিশেষ কুঠরি তৈরি করা হতো, যা পাখির জন্য আরামদায়ক আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

সুলতান আব্দুল মজিদ তাঁর শাসনকালে এক আদেশে শুক্রবার দিন সব ধরনের ঘোড়া ও গাধা ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, সপ্তাহের এক দিন যেন অন্তত এই অবলা পশুগুলো বিশ্রামের সুযোগ পায়। সুলতানি আদেশের ফলে উসমানি সাম্রাজ্যে শুক্রবার কেউ ঘোড়া বা গাধায় চড়ত না, এই দিনে এগুলোর ওপর কেউ বোঝা চাপিয়ে দিত না।

Scanned with CamScanner



উসমানি সাম্রাজ্যে নিষিদ্ধ কিছু বিষয়

১২৯৯ সাল থেকে শুরু করে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত ৬২৪ বছর ধরে উসমানি সাম্রাজ্য টিকে ছিল। এই সুদীর্ঘ সময়ের শাসক ৩৬ জন সুলতানের মধ্যে প্রত্যেকের শাসনকাল ও রীতিনীতি ভিন্ন হলেও কিছু নিয়ম সব সুলতানের শাসনামলে একই রকম ছিল। সময়ের প্রয়োজনে উসমানি সাম্রাজ্যে কিছু কাজ ও আচরণের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল, যেগুলোর মধ্যে কিছু বিষয় মোটামুটি সব সুলতানের আমলে নিষিদ্ধ হিসেবে গণ্য হতো।

উসমানি সাম্রাজ্যের সূচনাকাল থেকে দাস-দাসী কেনাবেচার প্রচলন ছিল। মুসলিম ও অমুসলিম সবাই নিজেদের সাধ্যমতো দাস-দাসী কেনার সুযোগ পেত। সেকালে বিভিন্ন শহরে খোলাবাজারে নির্দিষ্ট সময়ে দাস-দাসী বিক্রি করা হতো।

একসময় দেখা গেল, ইস্তাম্বুলে বিদেশি অমুসলিম নাগরিক বা পর্যটকেরা যেসব দাসী কেনেন, নিজের দেশে চলে যাওয়ার সময় তাঁরা দাসীদের আশ্রয়হীন অবস্থায় রেখে যান। ফলে মালিকের চলে যাওয়ার পর এই দাসীরা রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াত। কোথাও তাদের আশ্রয় জুটত না। অমুসলিমদের

Scanned with CamScanner

কেনা দাসীদের এমন দুরবস্থা থেকে উদ্ধারে ১৫৫৯ সালে উসমানি সাম্রাজ্যে এক সুলতানি ফরমান জারি করা হয়, যাতে অমুসলিম কারও কাছে দাসী বিক্রি চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ করা হয়।

উসমানি সাম্রাজ্যে সন্ধ্যার পর সাধারণ মানুষ বিভিন্ন ক্যাফেতে জড়ো হতো। বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় ও আড্ডায় সময় পার করত নগরের অভিজাত শ্রেণি-পেশার মানুষ। এসব আড্ডাখানায় কফি পানের পাশাপাশি তামাক সেবনের প্রচলন শুরু হয়। একপর্যায়ে সুলতান চতুর্থ মুরাদ এক আদেশে সাধারণ মানুষের উন্মুক্ত স্থানে এবং এসব আড্ডাখানায় তামাক সেবন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। শুধু তা-ই নয়, বরং তামাক সেবনকারীকে শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার বিধান দেন তিনি।

উসমানি সাম্রাজ্যের সূচনাকাল থেকে সব শহর ও অঞ্চলে মদপান নিষিদ্ধ ছিল। মদ বিক্রি, সেবনসহ এর সব ধরনের ব্যবহার বেআইনি হিসেবে গণ্য করা হতো। সুলতান চতুর্থ মুরাদের শাসনামলে মদপানকারীকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হতো।

উসমানি সাম্রাজ্যে বেশ কয়েকজন সুলতানের আমলে এশার আজানের পর থেকে ফজরের আজান হওয়া পর্যন্ত সড়কে অনর্থক ঘোরাঘুরি বেআইনি কাজ হিসেবে গণ্য করা হতো। নগর ও দরবারের সার্বিক নিরাপত্তা সুরক্ষায় এ আইন করা হয়েছিল। রাতে কাউকে অযথা ঘোরাঘুরি করা অবস্থায় পাওয়া গেলে এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হতো।

সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহ তাঁর শাসনামলে ছোট আকারের গাড়িতে পুরুষ ও নারীর একসঙ্গে আরোহণ ও ভ্রমণ নিষিদ্ধ করেন। সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের শাসনকাল পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা বহাল ছিল। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় সমাজে যেন কোনো বিরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়, সে জন্য এ উদ্যোগ নেন সুলতান মুহাম্মদ।

প্রায় কয়েকজন সুলতানের আমলে উসমানি সাম্রাজ্যে নারীর জন্য খোলামেলা পোশাক পরে বাইরে বের হওয়া নিষিদ্ধ ছিল। বরং এসব অশালীন পোশাক তৈরিকারক দর্জিদেরও শাস্তির আওতায় আনা হতো।

এমন কয়েকটি রীতিনীতি ছাড়া আরও বেশ কিছু বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হতো। যেমন বিদেশি পর্যটকদের ওপর উসমানি ঐতিহ্যের পোশাক ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা, যুদ্ধ চলাকালে সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যক্তিগত আলাপচারিতার ওপর নিষেধাজ্ঞা, ইস্তাম্বুল শহরের সীমানাদেয়ালের আশপাশে ভবন তৈরির ওপর নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner



উসমান বায়েজিদ উসমান অগলু

উসমানি সুলতানদের বর্তমান প্রজন্ম

এই বই যখন পাঠকের হাতে, তখন ২০১৭ সাল চলছে। আজ থেকে প্রায় ৯৫ বছর আগে ১৯২২ সালের ১ নভেম্বর বৃহস্পতিবার 'উসমানি সালতানাত' বাতিল করা হয়। এদিন আধুনিক তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক উসমানি সালতানাত ও সুলতানি প্রথার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সর্বশেষ উসমানি শাসক আব্দুল মজিদ খানকে তখন প্রতীকী অর্থে খলিফা ঘোষণা দেওয়া হয়। প্রশাসনিক সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে কেবল ধর্মীয় সম্মান হিসেবে তাঁকে এই পদে বহাল রাখেন তুরস্কের নব্য শাসকেরা।

এরপর খুব দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ব্রিটেনের পরামর্শে মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক তুরস্কজুড়ে বেশ কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কামাল আতাতুর্ক ও তাঁর সঙ্গীদের আশঙ্কা ছিল, তুরস্কের মাটিতে সদ্য বিলুপ্ত উসমানি সুলতান ও পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতি আধুনিক তুরস্কের যাত্রা বাধাগ্রস্ত করতে পারে। ফলে তুরস্ককে উসমানি পরিবারমুক্ত করতে খলিফা আব্দুল মজিদকে সপরিবারে নির্বাসনে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা।

Scanned with CamScanner

১৯২৪ সালের ৩ মার্চ সোমবার এক আদেশ জারি করে তুরস্কের সংসদ। এই আদেশে তুরস্কবাসীর চিরচেনা খেলাফত প্রথার বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়। এর পরপরই উসমানি খলিফা ও তাঁর পরিবারের সব জীবিত সদস্যকে তুরস্কের ভূমি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে নির্দেশ জারি করে তুরস্ক সরকার। পদচ্যুত খলিফা আব্দুল মজিদকে দেশত্যাগের জন্য সময় বেঁধে দেওয়া হয় মাত্র ২৪ ঘণ্টা। আর অন্য সব সদস্যকে ১৫ দিনের মধ্যে তুরস্ক ত্যাগ করতে জানিয়ে দেওয়া হয়।

সরকারি আদেশের ফলে নিরুপায় হয়ে উসমানি পরিবারের ২০০ অসহায় নারী ও পুরুষ সদস্য তুরস্ক ত্যাগ করেন। তাঁদের কেউ যেন আর তুরস্কে ফিরে আসতে না পারেন, সে জন্য তাঁদের এক বছর মেয়াদি অস্থায়ী পাসপোর্ট দিয়ে তুরস্ক থেকে বের করে দেয় কামাল আতাতুর্ক সরকার।

উসমানি সাম্রাজ্যের সর্বশেষ শাসক আব্দুল মজিদ খানের নির্বাসনের পর উসমানি পরিবারের সদস্যরা অল্প কয়েক দিনের মধ্যে তুরস্ক ছেড়ে চলে যান। এ সময় তাঁরা নিজেদের পছন্দ ও সুবিধামতো বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েন। সেদিনের পর থেকে মিসর, লেবানন, সিরিয়াসহ আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এবং ইউরোপ ও আমেরিকার নানা অঞ্চলে বাস করছেন উসমানি পরিবারের তৃতীয় প্রজন্মের সদস্যরা। আজও তাঁদের মধ্যে পরস্পর যোগাযোগ বিরাজমান।

নিজেদের ভেতর যোগাযোগ বজায় রাখতে এই প্রজন্মের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে উসমানি পরিবারের নেতা হিসেবে মনোনীত করেন। তাঁকে 'খানাহদান' উপাধি দেওয়া হয়। উসমানি পরিবারের বংশধরেরা যে যেখানেই থাকেন, সবাই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। এভাবে ৯৫ বছর ধরে পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে উসমানি পরিবারের বর্তমান প্রজন্ম, সুদীর্ঘ ৬২৪ বছরের চেয়ে বেশি সময় ধরে যাদের পূর্বপুরুষেরা শাসন করেছিলেন তিন মহাদেশজুড়ে বিস্তৃত সুবিশাল উসমানি সাম্রাজ্য।

উসমানি পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের প্রধান পুরুষ আনওয়ার আফেন্দি। সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে তিনি বাস করছেন। তিনি এই পরিবারের ৪৫তম নেতা হিসেবে উসমানি পরিবারের সদস্যদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আনওয়ার আফেন্দির আগে সর্বশেষ নেতা ছিলেন উসমান বায়েজিদ উসমান অগলু। ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসের শুরুতে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ৯৩

Scanned with CamScanner

বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। নিউইয়র্কের ফ্রাঙ্কলিফ কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

উসমান বায়েজিদ উসমানি সাম্রাজ্যের ৩১তম শাসক আব্দুল মজিদ খানের নাতি। উসমানি পরিবারের ৪৪তম নেতা হিসেবে তিনি ২০০৯ সালে মনোনীত হন। উসমানি সাম্রাজ্যের পতনের বছর ১৯২৪ সালের ২৩ জুন তিনি ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করেন। উসমানি পরিবারের বেশ কিছুসংখ্যক সদস্য তখন ফ্রান্সে নির্বাসিত জীবন অতিবাহিত করছিলেন।



উসমান বায়েজিদ উসমান অগলুর জানাজা

Scanned with CamScanner

উসমানি সাম্রাজ্যে প্রথম বাইসাইকেল

১৮৫৫ সালের ৩১ আগস্ট। ইস্তাম্বুলে এসে পৌঁছান একজন বিদেশি পর্যটক। তাঁর নাম টমাস। তিনি এসেছেন তিন চাকার একটি বাইসাইকেলে চড়ে। তখন সেটির নাম ছিল ভেলেস্পট।

ইস্তাম্বুল শহরবাসী সেদিন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল এই বাহনের দিকে। ঘোড়া ও গাধার পরিবর্তে মানুষের চড়ার জন্য এ কেমন বাহন! বিস্ময়ের ঘোর সবার চোখেমুখে। শহরের পত্রপত্রিকায় এ নিয়ে ফলাও করে খবর ছাপা হলো। শহরবাসী এই বাহনের নাম দিল 'শয়তানের গাড়ি'।

এর অনেক বছর পর ১৯০১ সালে *ইকদাম* পত্রিকায় লেখক আলি কামাল এর নামকরণ করেন 'দাররাজা'। তখন থেকে এই বাহনের নাম 'দাররাজা' হিসেবে প্রচলিত হয়।

ইস্তাম্বুলের পথেঘাটে সাইকেল চালানো সহজ ছিল না। কারণ, সাইকেল কেনার পর এর জন্য সরকারি দপ্তর থেকে লাইসেন্স অনুমোদন করিয়ে নিতে হতো। সেই নম্বর প্লেটে লিখিয়ে তা সাইকেলে লাগাতে হতো। এরপর ধীরে ধীরে সরকারি কর্মচারী ও অভিজাত লোকদের কাছে প্রিয় বাহন হিসেবে সাইকেলের কদর ছড়িয়ে পড়ে।

Scanned with CamScanner



দামেস্ক থেকে মদিনা পর্যন্ত রেলপথ

১৯০৮ সালের ২৮ আগস্ট। এদিন প্রথমবারের মতো সৌদি আরবের মদিনায় ট্রেন এসে পৌঁছায় সুদূর সিরিয়ার দামেস্ক থেকে। এর ফলে শাম অঞ্চল ও তুরস্কের মুসলমানরা নিরাপদে ও কম সময়ে মক্কা-মদিনা জিয়ারতের দুর্লভ সুযোগ লাভ করে।

উসমানি সাম্রাজ্যের শেষ যুগে ১৯০০ সালের ১ মার্চ সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ এ দীর্ঘ রেলপথ তৈরির আদেশ দেন। দামেস্ক থেকে তখন মদিনায় যেতে ৪০ দিন পর্যন্ত সময় লেগে যেত। সেই সঙ্গে যাত্রাপথে নানা দুর্ভোগে ভোগান্তিতে পড়তেন হজযাত্রীরা। লুটেরাদের ভয় আর আবহাওয়ার সমস্যা তো ছিলই।

১৯০৮ সালে ১ হাজার ৪০০ কিলোমিটারব্যাপী দীর্ঘ এ রেলপথ তৈরির কাজ শেষ হয়। ১৯১৬ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রায় নয় বছর এ রেলসেবার মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন হাজারো হজযাত্রী এবং অসংখ্য সাধারণ মানুষ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে উসমানিদের বিরুদ্ধে আরব দেশগুলোতে যে বিদ্রোহ ও গোলযোগ শুরু হয়, তখন অনেক জায়গায় এ রেলপথ উপড়ে ফেলা হয়।

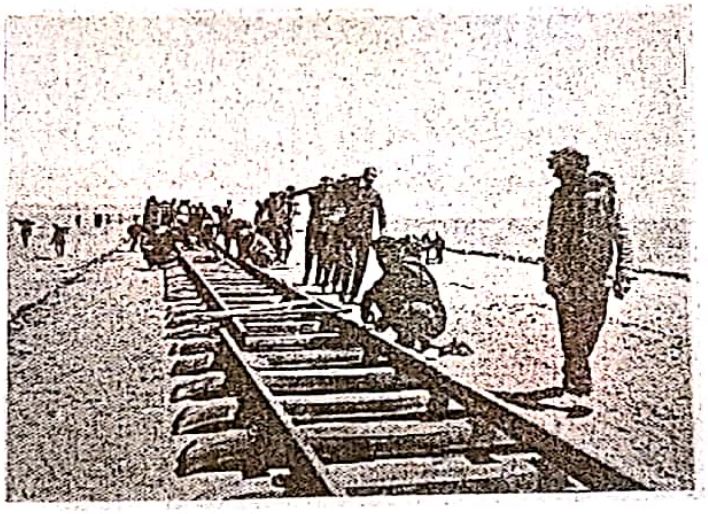
Scanned with CamScanner

দামেস্ক থেকে বিভিন্ন দেশ হয়ে মদিনাগামী এ রেলপথ নির্মাণ প্রকল্পে সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ কোনো বিদেশি বিধর্মী গোষ্ঠীর কাছ থেকে সাহায্য নেননি। বরং মুসলমানদের অর্থে ও শ্রমে এই রেলপথ তৈরি হবে, এটাই ছিল তাঁর ইচ্ছা।

সে সময় সুলতানের এমন উদ্যোগে ইউরোপজুড়ে বিস্ময় ছড়িয়ে পড়ে। কারণ, একদিকে উসমানি সাম্রাজ্য তখন আর্থিকভাবে প্রায় দেউলিয়া হওয়ার পথে, অন্যদিকে মরুভূমিতে উঁচু-নিচু ভূমিতে প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথ তৈরি মোটেও সহজসাধ্য ছিল না।

ইউরোপে তখন এটিকে সুলতানের বিলাসী কল্পনা হিসেবে তুলে ধরা হয়। এই প্রকল্প নিয়ে সেখানকার পত্রপত্রিকায় বিদ্রূপাত্মক খবর ও ছবি প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের দৃঢ় মনোবল ও অটল সিদ্ধান্তে ধীরে ধীরে এগোতে থাকে এ রেললাইন নির্মাণের কাজ।

উসমানি সাম্রাজ্যে তৎকালীন প্রসিদ্ধ প্রকৌশলী মোখতার বেহ এ রেলপথের নকশা ও রূপরেখা তৈরি করেন। তিনি দামেস্ক থেকে মদিনা পর্যন্ত বিভিন্ন পথ সম্পর্কে গবেষণা শেষে প্রাচীনকালে যে পথে উটের কাফেলা যেত, সেই রুট বেছে নেন।



উসমানি সাম্রাজ্যের বার্ষিক বাজেটের ১৮ শতাংশ অর্থ এ রেলপথ তৈরির জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়। সুলতান তাঁর নিজস্ব তহবিল থেকে ৩ লাখ ২০ হাজার মুদ্রা দান করেন এ প্রকল্পে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাধারণ মুসলমানরা এ রেলপথ তৈরির জন্য বিপুল অঙ্কের আর্থিক সহায়তা পাঠায়।

পাঁচ হাজারের বেশি কর্মী এ রেলপথ তৈরির কাজে দিনরাত শ্রম ব্যয় করেন। তাঁদের অধিকাংশই উসমানি সেনাবাহিনীর সদস্য ছিলেন। এই রেলপথের নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ঠিক রাখতে ইস্তাম্বুলে রেল প্রকৌশল সম্পর্কে পড়াশোনা ও গবেষণার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান খোলা হয়।

Scanned with CamScanner

রেলপথ নির্মাণের সময় রেললাইনকে এগিয়ে নিতে দুই হাজার সেতু তৈরি করা হয় বিভিন্ন জায়গায়। প্রতি ২০ কিলোমিটার পরপর রেলস্টেশন তৈরি করা হয়। এসব স্টেশনে যাত্রীছাউনির পাশাপাশি পানি মজুত রাখার জন্য ট্যাংক তৈরি করা হয়।

মরুভূমিতে এ রেলপথ নির্মাণের কাজে অংশ নিতে উসমানি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়াও অন্যান্য মুসলিম দেশ থেকে অনেক মুসলমান এতে অংশ নেয়। তপ্ত বালুতে মরুভূমির বুকে এ রেললাইন স্থাপনের সময় শ্রমিকদের বেশ কষ্ট সহ্য করতে হয়। কিন্তু মদিনার ভালোবাসায় উজ্জীবিত শ্রমিকেরা এ রেললাইন নির্মাণের কাজ থেকে পিছু হটেননি। অনেক শ্রমিক নির্মাণকাজ চলাকালে মৃত্যুবরণ করেন এবং রেললাইনের পাশে তাঁদের দাফন করা হয়।

সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের উদ্যোগে এ রেলপথ তৈরির ফলে হাজিদের জন্য সহজ ও নিরাপদে মক্কা-মদিনায় যাওয়ার সুযোগ উন্মুক্ত হয়। পাশাপাশি হেজাজ ও আরব অঞ্চলে উসমানি শাসন বজায় রাখতে সৈন্যদের যাতায়াতও আগের চেয়ে সহজ হয়।

যাঁর স্বপ্ন, সাহস, শ্রম ও উদ্যোগের ফলে এমন অসাধ্য সাধিত হলো, সেই সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ সুযোগ পাননি তাঁর তৈরি রেললাইনে চলমান ট্রেনে চড়ার। ১৯০৯ সালে তাঁকে পদচ্যুত করা হয় এবং নির্বাসনে পাঠানো হয়।

Scanned with CamScanner


تصویر افکار

১২৭৮

27 Haziran 1862'de Şinâsi tarafından yayınlanan Tasvîr-i Efkâr'ın birinci sayısı

উসমানি সাম্রাজ্যে সংবাদপত্র প্রকাশনা

সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ প্রথম উসমানি সুলতান, যাঁর হাত ধরে আনুষ্ঠানিকভাবে উসমানি ভাষায় সংবাদপত্রের যাত্রা শুরু হয়। তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত পত্রিকার নাম ছিল *তাকওমিল ওয়াকিয়া*। ১৮৩১ সালের ১ নভেম্বর তারিখে এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এতে উসমানি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ খবর ও বহির্বিশ্বের খবর ছাপা হতো। রাজপ্রাসাদের তত্ত্বাবধানে এটি প্রকাশিত হতো। প্রকাশনার প্রথম দিকে এটি সাপ্তাহিক হিসেবে যাত্রা শুরু করে।

এরপর আরও বেশ কিছু সাপ্তাহিক ও মাসিক প্রকাশনা যাত্রা শুরু করে উসমানি সাম্রাজ্যে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্রের নাম *তাছউইরুল আফকার*। ১৮৬২ সালের ২৮ জুলাই এর প্রথম সংখ্যা বাজারে

Scanned with CamScanner

আসে। এতে উসমানি সাম্রাজ্যের সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ ও লেখকদের কলাম ছাপা হতো।

১৯১০ সালে উসমানি সুলতানের নিষেধাজ্ঞার ফলে এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। পরে নাম পরিবর্তন করে *তানউইরুল আফকার* নামে আবারও যাত্রা শুরু করে পত্রিকাটি। পরে আবারও নাম বদল করে রাখা হয় *ইনতেখাবুল আফকার*। এরপর নাম পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত থাকে। ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত এই পত্রিকা *তাছউইর* নামে প্রকাশিত হতো।

১৮৬০ সালের ২২ অক্টোবর উসমানি সাম্রাজ্যের পাঠকদের জন্য নতুন আরেকটি পত্রিকা বাজারে আসে। এর নাম *তরজুমানুল আহওয়াল*। প্রথম দিকে প্রতি সপ্তাহের রোববার এটি প্রকাশিত হতো। ১৮৬১ সালের ২২ এপ্রিলের পর থেকে এটি সপ্তাহে তিনবার বের হতো। একবার এই পত্রিকায় উসমানি শিক্ষাব্যবস্থার কড়া সমালোচনা করেন চিন্তাবিদ গোক তুর্ক। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে এর প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে দুই সপ্তাহ পর আবারও প্রকাশনার অনুমতি পায় *তরজুমানুল আহওয়াল* কর্তৃপক্ষ। ১৮৬৬ সালের মার্চ মাসে আর্থিক সংকটের কারণে প্রকাশক নিজেই এই পত্রিকা বন্ধ করে দেন।


اقدام

تبليغ رسمى

سাপ্তাহিক *জারিদাতুল হাওয়াদেছ* : এই পত্রিকা ১৮৪০ সালে সরকারি তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়। ১৮৬৪ সালে সম্পাদক ও প্রকাশক কর্তৃপক্ষের মধ্যকার দ্বন্দ্বে এটি বন্ধ হয়ে যায়।

উছমানলি : প্রথম সরকারবিরোধী পত্রিকা এটি। ১৮৯৭ সালে ফ্রান্সে এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তবে উসমানি শাসনব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা ছাপা হওয়ায় ১৯০৯ সালে ফ্রান্স কর্তৃপক্ষ এটি বন্ধ করে দেয়।

Scanned with CamScanner

দৈনিক *ইকদাম* : ১৮৯৪ সালের ৫ জুলাই *ইকদাম*-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ১৯১২ সালে এর নাম পরিবর্তন করে *ইকদাম* থেকে *ইকতেহাম* রাখা হয়। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসের পর এর আর কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি।

Scanned with CamScanner

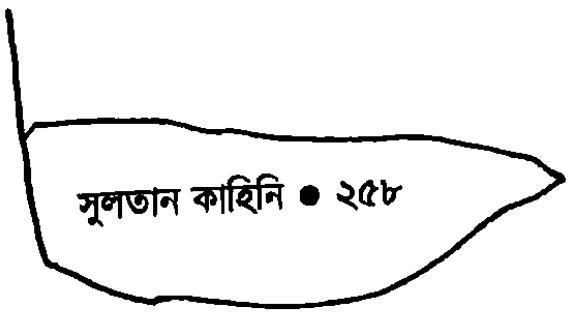
উসমানি সাম্রাজ্যে পরিবেশ সুরক্ষা

বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের হাজার বছরের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল জয় করেন উসমানি সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহ। সভ্যতায় সমৃদ্ধ এই শহরের সৌন্দর্য ও ঐতিহ্য রক্ষায় সুলতানের নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদক্ষেপ সেকালে তাঁর দূরদর্শী দৃষ্টি এবং প্রজাদের জন্য তাঁর সচেতন দরদের প্রমাণ বহন করে। পরিবেশের সুরক্ষা ও নগরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি সবাইকে যত্নবান হওয়ার তাগিদ দিয়ে সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহ ইস্তাম্বুলবাসীর প্রতি একটি ফরমান জারি করেছিলেন। এই ফরমানে তিনি বলেন :

- 'প্রিয় শহরবাসী, আপনাদের প্রতি অনুরোধ করছি, ইস্তাম্বুল শহরের পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে আপনারা যত্নবান থাকবেন। এই নগরী জয়ের জন্য আমি দীর্ঘদিন স্বপ্ন লালন করেছি। এই শহর যেন উজ্জ্বল ও ঝকঝকে থাকে, এখানে আগত সবাই যেন এর প্রতি আকর্ষণ বোধ করে, সে জন্য আমি আপনাদের সহযোগিতা চাইছি।
- ইস্তাম্বুল শহরজুড়ে যেসব সরকারি কর্মকর্তা নিযুক্ত হয়েছেন, তাঁদের বলছি, ইস্তাম্বুল নগরীর প্রতিটি সড়কে দুজন করে পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। শহরবাসীর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কর্মকর্তাদের সচেতন থাকতে হবে।
- ইস্তাম্বুল শহরবাসীর প্রতি অনুরোধ, আপনারা ইস্তাম্বুলের সার্বিক পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে সজাগ থাকবেন, যাতে আমাদের এই শহর পুরো পৃথিবীর কাছে দৃষ্টান্ত হতে পারে।
- ইস্তাম্বুলের প্রতি মহল্লায় ১০ জন করে চিকিৎসক এবং ৫৫ জন সেবক-সেবিকা নিয়োগ দেওয়া হবে। চিকিৎসকেরা যেন নিয়মিত তাঁদের নির্ধারিত এলাকার প্রতিটি ঘরে গিয়ে খোঁজখবর নেন। কোনো বাড়িতে অসুস্থ কাউকে পাওয়া গেলে জরুরি ভিত্তিতে তাকে 'দারুস শেফা'য় পাঠিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেবেন।

Scanned with CamScanner

- শহরের কিছু ঘরবাড়ি শুধু পশুপালনের জন্য নির্ধারণ করা হবে। শহরবাসীর পালিত পশু ওইসব ঘরে রাখা হবে, যাতে এসব পশুর উৎপাত থেকে শহরবাসী নিরাপদ থাকে এবং এগুলোর মাধ্যমে কোনো রোগবালাই ছড়িয়ে না পড়ে।
- শহরবাসী সবার জন্য পয়োনিষ্কাশন ও পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে আলাদা আলাদা নালা তৈরি করতে হবে। দূরবর্তী এলাকায় বসবাসরত মানুষের জন্য পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।'



Scanned with CamScanner

উসমানি সুলতানদের বিয়েশাদি

সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহ পর্যন্ত প্রায় সব উসমানি সুলতান স্বাধীন রমণীদের বিয়ে করেছেন। ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী আকদ করে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের বিয়েশাদির আয়োজন করা হতো। এ উপলক্ষে সাম্রাজ্যজুড়ে খুশি ও আনন্দের বন্যা বয়ে যেত।

সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহের পর যেসব সুলতান উসমানি সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েছেন, তাঁদের অনেকেই অন্তঃপুরের দাসীদের বিয়ে করার প্রতি ঝুঁকে পড়েন। উসমানি সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত সুলতানদের মধ্যে এ রীতি প্রচলিত ছিল। স্বাধীন ও সম্ভ্রান্ত রমণীদের চেয়ে দাসীদের রূপ ও প্রতিভায় মোহিত হয়ে তাঁদের বিয়ে করতেন সুলতানরা। কালে কালে এটাই উসমানি সুলতানদের প্রথা হয়ে দাঁড়ায়।

সুলতান যে দাসীদের তাঁর স্ত্রীর মর্যাদা দিতেন, তাদের 'কাদেন' অথবা 'ইকবাল' বা 'কোজাদা' কিংবা 'বায়ক' বলা হতো। তবে উসমানি সাম্রাজ্যের শেষকালেও হাতে গোনা কয়েকজন সুলতান দাসীদের বিয়ে করার প্রথা ভেঙে স্বাধীন নারীদের বিয়ে করেছেন, অথবা আকদ করে দাসীদের আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করেছেন।

সার্বিক বিবেচনায় উসমানি সুলতানরা যেসব নারীর সঙ্গে সময় কাটাতেন, তাঁদের মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথম শ্রেণি : আকদের মাধ্যমে সুলতান যেসব স্বাধীন রমণীকে বিয়ে করতেন, তাঁদের বলা হতো কাদেন আফেন্দি। সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহের পর যেসব সুলতান উসমানি সাম্রাজ্য শাসন করেছেন, তাঁদের জীবনে এমন স্ত্রীর সংখ্যা খুবই কম। সাধারণত আশপাশে অবস্থিত কোনো বন্ধুরাষ্ট্রের রাজা-মহারাজার সঙ্গে সুসম্পর্ক হলে তাঁর কন্যাকে বিয়ে করতেন সুলতানরা। এতে দুই পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ় হতো। এ ধরনের বিয়েশাদি জাঁকজমকপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতায় আয়োজন করা হতো। দরবার ও রাজ্যজুড়ে উৎসবের সাজ সাজ রব পড়ে যেত।

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয় শ্রেণি : সুলতান যে দাসীর সঙ্গে নিশিযাপন করেন, কিন্তু আকদ করে তাকে বিয়ে করেননি, এমন শ্রেণির দাসীকে উম্মেওয়ালাদ বলা হতো। অন্তঃপুরে তাঁদের কাদেন আফেন্দির মর্যাদা দেওয়া হতো। একজন সুলতান সর্বোচ্চ আটজন কাদেন আফেন্দির সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক রাখতেন। তবে কখনো কখনো এর চেয়ে বেশিসংখ্যক দাসীও সুলতানের নৈশসঙ্গী হওয়ার সুযোগ পেত। এ ধরনের দাসীর গর্ভে সুলতানের সন্তান জন্মগ্রহণ করলে ওই সন্তান স্বাধীন হিসেবে বেড়ে উঠত, তাকে দাস অথবা গোলামের কাতারে রাখা হতো না।

তৃতীয় শ্রেণি : যে দাসীদের সঙ্গে সুলতান রাত কাটাতেন কিন্তু তাদের গর্ভে সুলতানের কোনো সন্তানের জন্ম হতো না, তাদের তৃতীয় শ্রেণির মর্যাদা দেওয়া হতো। এদের বলা হতো ইকবাল। সুলতান দ্বিতীয় মুস্তফা থেকে এ প্রথা শুরু হয়। তবে কখনো কখনো সুলতান এদের থেকে কাউকে বেছে আকদ করে আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করতেন।

চতুর্থ শ্রেণি : উপরিউক্ত তিন শ্রেণির বাইরেও উসমানি সুলতানরা দাসীদের সঙ্গে নিশিযাপন করতেন। কখনো এ সংখ্যা চারজনে সীমাবদ্ধ থাকত। এদের বলা হতো বেক। সুলতানের সান্নিধ্য ও সুনজরের বদৌলতে ক্রমান্বয়ে এ শ্রেণির দাসীদের মর্যাদা তৃতীয় শ্রেণিতে উন্নীত হতো।

কিছু তুর্কি ঐতিহাসিক দাবি করেন, ২৪ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার সীমানাজুড়ে বিস্তৃত উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতানদের জীবনযাপন অত্যন্ত সুরক্ষিত এবং স্পর্শকাতর ছিল। হারেমের বাইরে থেকে কোনো স্বাধীন ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যাকে আকদ করে বিয়ে করলে অথবা পার্শ্ববর্তী ভিনদেশি কোনো রাজা বা শাসকের কন্যাকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দিলে সুলতানি প্রাসাদের ভেতরের তথ্য বা দরবার-সম্পর্কিত কথাবার্তা বাইরে পাচার হওয়ার আশঙ্কা থেকে যেত। মূলত এ কারণে উসমানি সুলতানরা প্রাসাদের অন্তঃপুরে লালিত-পালিত দাসীদের থেকে নিজের স্ত্রী বা নৈশসঙ্গী বেছে নিতেন।

Scanned with CamScanner

হারেম কাহিনি

পুরুষের আকৃতি ও শারীরিক শক্তি সব আছে, কেবল নেই পুরুষত্ব–ইতিহাসে এরা খোজা হিসেবে পরিচিত। কালো গাত্রবর্ণের এই খোজারা ইতিহাসের খেলাফত ও সালতানাতের যুগ-যুগান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় উসমানি সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু তোপকাপি প্রাসাদের হারেমে এবং পুরো অন্দরমহলে এদের প্রভাব ছিল। খোজাদের মূল কাজ ছিল হারেমে সুলতানের স্ত্রী ও দাসীদের খেদমত করা এবং তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

উসমানি সাম্রাজ্যের উজির জোরলুলু আলি পাশা কালো গাত্রবর্ণের খোজাদের ব্যাপারে বেশ কিছু ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি কালো বর্ণের কোনো দাসের শরীরের অঙ্গ বিকৃতি করে তার যৌনলালসা রুদ্ধ করার বিপক্ষে আদেশ জারি করেন। এ ছাড়া ১৭১৬ সালে রাজপ্রাসাদের কর্তাদের কাছে দাস বিক্রি নিষিদ্ধ করেন তিনি। আলি পাশার মৃত্যুর পর এ প্রথা আবারও চালু হয়।

উসমানি সাম্রাজ্যের সুদীর্ঘ ইতিহাসের বিভিন্ন কালে খোজারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একপর্যায়ে সুলতানের দরবারেও এদের প্রভাব বাড়তে থাকে। বরং সুলতানের বিশ্বস্ততা অর্জন করে রাষ্ট্রীয় পদে দায়িত্ব পালন করেছে বেশ কয়েকজন খোজা। সে সময় তাদের উপাধি দেওয়া হতো 'খোজাসরদার' নামে। সুলতান ও ছদরে আজমের পরই তাদের পদমর্যাদা থাকত।

দরবারের ছদরে আজম ও শায়খুল ইসলাম কখনো সুলতানের কাছে একান্ত সাক্ষাতে যেতে হলে এই খোজাসরদারের অনুমতি লাগত। কালো বর্ণের খোজার দায়িত্বে মক্কা ও মদিনার ব্যবস্থাপনাও ন্যস্ত করা হয়েছিল উসমানিদের আমলে। তবে শ্বেতাঙ্গ দাসরা এত সুবিধা পেত না। এদের সংখ্যা কালো বর্ণের দাসদের চেয়ে কম ছিল। ফলে রাজপ্রাসাদের ভেতর ফুট-ফরমাশ খাটা তাদের মূল দায়িত্ব ছিল। হারেমজুড়ে প্রায় ২০০ খোজা সার্বক্ষণিক সেবা ও পাহারায় নিয়োজিত ছিল। খোজা ও দাসরা বড় বড় কামরায় একসঙ্গে ঘুমাত।

Scanned with CamScanner

তোপকাপি রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে সুবিশাল জায়গাজুড়ে নির্মাণ করা হয়েছিল 'হারেম'। চারদিকে উঁচু দেয়ালঘেরা হারেমে অসংখ্য কামরা ছিল। এর মূল ফটক ও দেয়ালের বিভিন্ন অংশে পাহারায় নিয়োজিত থাকত খোজা প্রহরীরা। সুলতান ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের প্রবেশাধিকার ছিল না হারেমের কোথাও। হারেমের আশপাশে বা দূর থেকে উঁকি দিয়ে দেখা হত্যাযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হতো।

সুলতানের হারেম নিয়ে কৌতূহল এবং নানা ধরনের রহস্য ও গুজব প্রচলিত ছিল শহরে, নগরে এবং সাম্রাজ্যের সব জায়গায়। সুলতানের প্রকৃত স্ত্রীদের সংখ্যা, দাসী ও বাঁদীদের রূপ-সৌন্দর্য এবং তাদের নানা বিষয়ে প্রজাদের কৌতূহল ছিল বেশ। রহস্যময় হারেমের যেকোনো খবর সবার মধ্যে একধরনের উত্তেজনা ছড়িয়ে দিত।

সেকালে উসমানি সাম্রাজ্যের রাজধানী ইস্তাম্বুলে এক বিদেশি ব্যবসায়ী নিজের কৌতূহলে দূর থেকে দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করে হারেমের ভেতরজগৎ দেখার চেষ্টা করছিলেন। তখনই হাতেনাতে তিনি ধরা পড়েন সুলতানের প্রহরীদের হাতে। এর শাস্তি হিসেবে তৎকালীন সুলতান তাঁকে সেখানেই হত্যা করার আদেশ দেন।

আরেকবার ইস্তাম্বুলে নিযুক্ত ফরাসি রাষ্ট্রদূতের অনুবাদকও এমন হারেমদর্শনে ধরা পড়েন। এ সংবাদ পেয়ে সুলতান তখনই তাঁকে হত্যা করার আদেশ দেন। এমনকি হত্যার আগে সংশ্লিষ্ট দেশের রাষ্ট্রদূতকেও জানাতে দেননি তিনি।

হারেমের ভেতর অসংখ্য ঘরের পাশাপাশি সুলতানের জন্য ছিল ব্যক্তিগত শয়নকক্ষ, অভ্যর্থনা কক্ষ ও গোসলখানা (হাম্মাম)। অভ্যর্থনা কক্ষে সুলতান নিজ পরিবারের নারী সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতেন, তাঁদের ভালো-মন্দের খোঁজখবর নিতেন।

সুলতান যখন হারেমে প্রবেশ করতেন, তখন শত শত দাসী এবং সব পত্নী দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাতেন তাঁকে। সুলতানের আগমনী বার্তা যেন সবাই বুঝতে পারে, সে জন্য সুলতান এক বিশেষ ধরনের স্যান্ডেল ব্যবহার করতেন, যা পায়ে দিয়ে মার্বেলের মেঝেতে হাঁটলে একধরনের শব্দ ছড়িয়ে পড়ত হারেমজুড়ে। কোনো দাসী সুলতানের সামনে পড়ে গেলে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে হতো অবনত দৃষ্টিতে। সুলতানের সামনে দিয়ে অতিক্রম করা বা সুলতানের দিকে তাকানো হারেমের রীতিনীতির চরম বরখেলাপ হিসেবে বিবেচিত ছিল।

Scanned with CamScanner

হারেমে প্রবেশকালে সুলতানের সঙ্গে থাকতেন 'কায়া'। হারেমে বসবাসরত দাসীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ ও পুরোনো দাসীকে 'কায়া' বলা হয়। সুলতান কখন কার সঙ্গে নিশিযাপন করবেন, তা নির্ধারণের দায়িত্ব ছিল কায়ার। মেজাজ-মর্জি ভালো হলে সুলতান কখনো কখনো নিজের পছন্দে পত্নী বা দাসী বেছে নিতেন।

উসমানি সাম্রাজ্যের প্রায় সব সুলতান একাধিক বিয়ে করেছেন। স্বাধীন নারীদের মধ্য থেকে পত্নী বেছে নিতেন সুলতানরা। তবে শরিয়তে নিষিদ্ধ থাকায় একই সময়ে চারটির বেশি স্ত্রী বিবাহবন্ধনে রাখতেন না। সুলতানের সঙ্গে যাদের বিয়ে হতো, তাদের সবাইকে অবশ্যই সতী ও কুমারী হতে হবে। সুলতানের পত্নীকুলের মধ্যে মুসলিম ও খ্রিষ্টান–দুই ধর্মের অনুসারীরাই জায়গা পেত।

উসমানি সাম্রাজ্যের প্রথম সুলতান উসমান থেকে শুরু করে সুলতান মুহাম্মদ আলফাতেহ পর্যন্ত সাতজন সুলতান কখনো দাসীদের কাউকে বিয়ে করেননি। বরং সুলতান মুহাম্মদের পরবর্তী সময়ে হারেমের দাসীদের মধ্যে বেছে বেছে যোগ্য ও উপযুক্ত দাসীদের বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদায় রাখার রেওয়াজ চালু হয়।

একাধিক স্ত্রী থাকলেও সবার সঙ্গে সমান আচরণ করতেন না সুলতানরা। বরং হারেমের ভেতর যে স্ত্রী পুত্রসন্তানের জন্ম দেবেন, তাঁর মর্যাদা ও প্রভাব অন্য স্ত্রীদের চেয়ে বেড়ে যেত। আর্থিক সুবিধাও তিনি বেশি পেতেন অন্য সতিনদের চেয়ে। প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য আলাদা আলাদা দাসী, সেবক দল ও প্রহরী নির্ধারিত ছিল। খোজাদের মধ্য থেকে একজনকে এই সেবক দল ও প্রহরীদের সরদার মনোনীত করা হতো।

সুলতানকে খুশি করতে তাঁর হারেমে দাসী পাঠিয়ে সেকালের দাস-দাসী কেনাবেচার সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীরা বিপুল অর্থ উপার্জন করতেন। তাঁদের কাছে থাকা সবচেয়ে সুন্দরী, রূপবতী ও গুণী দাসীকে চড়া মূল্যে বিক্রি করতেন সুলতানের হারেমে।

সাধারণত দুটি উপায়ে ব্যবসায়ীরা এসব দাসী সংগ্রহ করতেন। কোথাও যুদ্ধ হচ্ছে শুনলেই সেখানে ছুটে যেতেন তাঁরা। নগদ অর্থে যুদ্ধবন্দীদের মধ্য থেকে কিশোরীদের কেনা হতো। তারপর রাজধানীতে ফিরে সুলতানের হারেমে বিক্রি করা হতো বিদেশি কিশোরী ও তরুণীদের। ১০-১১ বছর বয়সী কিশোরীদের চাহিদা এবং মূল্য ছিল সবচেয়ে বেশি।

Scanned with CamScanner

যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে কিশোরীদের অপহরণ করা হতো। গ্রিস, ইতালি, আলবেনিয়া, অস্ট্রিয়া, রাশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে দাস-দাসী ব্যবসায়ীদের আলাদা আলাদা চক্র ও জাল ছিল। বেশির ভাগ ব্যবসায়ী ককেশাস অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। ফলে উসমানি সুলতানের হারেম ও সাম্রাজ্যের অন্যত্র ককেশাস দাসীর সংখ্যা ছিল সেকালে অনেক বেশি।

ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কেনা ছাড়াও বিভিন্ন উসমানি রাজ্য ও অঞ্চলের শাসক এবং অন্য দেশের রাজা-বাদশাহদের কাছ থেকে নিয়মিত উপঢৌকনে দাসী পেতেন সুলতানরা। সুলতানকে খুশি করতে অপরূপা অল্পবয়স্কা কিশোরী অতীব মূল্যবান উপহার হিসেবে ধরা হতো।

উসমানি সাম্রাজ্যে দাসীদের অধিকাংশ ছিল খ্রিষ্টান। হারেমে আনার পর প্রাথমিকভাবে তাদের তালিম দেওয়া হতো সুলতানি ঐতিহ্য ও রীতিনীতি সম্পর্কে। যেসব দাসী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হতো, তাদের জন্য ছিল ইসলামবিষয়ক আলাদা তালিমের ব্যবস্থা।

এসব প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকালে যাদের মধ্যে মেধা ও বুদ্ধির প্রতিভা পাওয়া যেত, তাদের আরও বেশি ভাষা ও জ্ঞান শেখানো হতো। তুর্কি ভাষার পাশাপাশি ফারসি, আরবি, ইংরেজি, ইতিহাস ও ভূগোলের তালিম দেওয়া হতো প্রতিভাবান দাসীদের। এ ছাড়া যোগ্যতা অনুযায়ী সংগীত, গান, নৃত্য এবং অন্যান্য হস্তশিল্পেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। ১০ জন করে দলবদ্ধ হয়ে হারেমের ভেতর বাস করত দাসীরা।

দাসীর বয়স ২৫ হয়ে গেলে সুলতান তাকে মুক্ত করে দিতেন। স্বাধীন হয়ে প্রাসাদের বাইরে যেকোনো পুরুষকে পছন্দ করে বিয়ের সুযোগ পেত দাসীরা। কখনো সুলতান স্বয়ং উপযুক্ত পাত্র পেলে দাসীদের বিয়ে করিয়ে দিতেন।

কোনো দাসীর রূপ-সৌন্দর্য এবং বুদ্ধি-যোগ্যতা পছন্দ হলে তাকে শয্যাসঙ্গী করতেন সুলতান। ভাগ্যবতী হলে তার গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করত সুলতানের পুত্র-কন্যা। বিনিময়ে তার মর্যাদা অন্য দাসীদের তুলনায় তখন বহুগুণে বেড়ে যেত। যাদের গর্ভে সুলতানের ঔরসজাত সন্তানের জন্ম হতো, তাদের উপাধি হতো 'কাদিন'। স্বাধীন পত্নীদের কাছাকাছি সম্মান পেত তারা। সুলতানের সন্তান জন্ম দিয়ে কাদিন হওয়া দাসীদের মধ্যেও মর্যাদার শ্রেণিবিন্যাস থাকত।

Scanned with CamScanner

উসমানি সুলতানদের হারেম নিয়ে বাজারে নানা কেচ্ছা-কাহিনি এবং রূপকথা আজও প্রচলিত। হারেমকে কেন্দ্র করে নাটক, সিনেমা ও সাহিত্যচর্চার কমতি ছিল না সেকালে, কমেনি একালেও। তবে এসবের সবই যে সত্য বা পুরোটাই মিথ্যা, বিষয়টি তা নয়। বরং সত্য ও মিথ্যার মিশেলে হারেমের রসময় বর্ণনা আজও পাঠকদের আকৃষ্ট করে। এ বিষয়ে সবিস্তারে লেখাজোখার আগে ইতিহাস পাঠ এবং সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ে সুদীর্ঘ সময় ও অসীম ধৈর্য প্রয়োজন। অন্তত এ বই সে জন্য নয়।

Scanned with CamScanner



‘ধরো আমি খেয়েছি মসজিদ’

‘ধরো আমি খেয়েছি’। বাক্য নয়, এটি একটি মসজিদের নাম। ‘ধরো আমি খেয়েছি মসজিদ’। এমন অদ্ভুত নামের এই মসজিদ ইস্তাম্বুল শহরের ফাতেহ এলাকায় অবস্থিত। তুর্কি ভাষায় এই মসজিদের নাম ‘জামে সানকি ইয়াদিম’।

মসজিদের কেন এমন নাম? তা জানতে হলে এই মসজিদের নির্মাতার কথা জানতে হবে।

উসমানি শাসনামলে সতেরো শতকে ইস্তাম্বুল শহরের ফাতেহ এলাকায় বাস করতেন এক হতদরিদ্র মুসলমান। তাঁর নাম খায়রুদ্দিন আফেন্দি। পথেঘাটে ঘুরে বেড়াতেন তিনি। মাঝেমধ্যে বাজারের অলিগলিতে একা একা হাঁটতেন।

বাজারে রাস্তার দুই ধারে দোকানের ভেতর সাজানো হরেক রকম খাবার দেখে কখনো কখনো খায়রুদ্দিনের ক্ষুধার্ত মন অস্থির হতো। নানা স্বাদের খাবার দেখে তাঁর সাধ জাগত সেসব মুখে দেওয়ার। কিন্তু সাধ থাকলেও মনকে প্রবোধ দিতেন তিনি।

কোনো খাবারের প্রতি তাঁর লোভ হলে তিনি ওই খাবারের দাম জিজ্ঞেস করতেন। তারপর পকেট থেকে সেই পরিমাণ অর্থ বের করে সঙ্গে রাখা একটি

Scanned with CamScanner

বাক্সে ফেলতেন। মনে মনে নিজেকে প্রবোধ দিতেন, ধরো, আমি তা খেয়েছি। সানকি ইয়াদিম। তারপর অন্যদিকে চলে যেতেন। দিন শেষে ঘরে ফিরতেন এই সহজ-সরল মানুষটি।

এভাবে দিন চলে যায়। মাস পেরিয়ে বছর। খায়রুদ্দিনের এমন কাণ্ড চলতে থাকে অবিরাম। কোথাও কোনো খাবার তাঁর খেতে মন চাইলে তিনি ওই খাবারের মূল্য জানতে চাইতেন। তারপর সেই পরিমাণ অর্থ তাঁর বাক্সে ভরতেন। নিজের মনকে প্রবোধ দিয়ে বলতেন, ধরো আমি সেটা খেয়েছি।

ধীরে ধীরে ওই বাক্সে জমানো অর্থ বাড়তে থাকে। বেশ কয়েক বছর পর একদিন তিনি বাক্সটি ভেঙে ফেলেন। সব অর্থ বের করে গুনতে শুরু করলেন তিনি। দেখা গেল, যা জমেছে, তা দিয়ে ছোট একটি মসজিদ নির্মাণ করা সম্ভব এই মহল্লায়।

কিছুদিন পর তিনি একাই একটি মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করেন। এত দিনের জমানো সব পয়সাকড়ি খরচ করলেন মসজিদ তৈরির কাজে।

ভালো খাবারের লোভ সামলে সেই অর্থ বাক্সে জমিয়ে রাখার যে অভ্যাস ছিল খায়রুদ্দিনের, তা জানা ছিল এলাকাবাসীর। তারা যখন দেখল, বেচারা খায়রুদ্দিন তাঁর জীবনের সঞ্চিত সব অর্থ দিয়ে এমন মসজিদ তৈরি করছেন, তাঁরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন, এই মসজিদের নাম হবে 'ধরো আমি খেয়েছি মসজিদ'।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে মসজিদটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় পুরো মসজিদ। দীর্ঘদিন পর ১৯৬০ সালে এলাকাবাসী মসজিদটি পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার করে। আবারও তাতে শুরু হয় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়।

আজ খায়রুদ্দিন বেঁচে নেই। কিন্তু এই মসজিদ তাঁর সততা এবং প্রবৃত্তি দমন করে আল্লাহর জন্য নিজেকে সঁপে দেওয়ার নিবেদনের প্রতীক হয়ে আছে।

আজও সেখানে পাঁচবার ধ্বনিত হয় মুয়াজ্জিনের আজান। প্রায় ২০০ নামাজি একসঙ্গে এতে নামাজ আদায় করতে পারেন। রয়েছে নারীদের জন্য আলাদা নামাজের জায়গা। আর রমজান মাসজুড়ে এই মসজিদে বিভিন্ন ইসলামি বিষয়ে আলোচনা ও দরস চলে।

জীবনভর নিজের লোভ ও ইচ্ছাকে দমন করে সব সঞ্চয় দিয়ে মসজিদ তৈরি করেছিলেন খায়রুদ্দিন। এমন কল্যাণময় কাজের বদৌলতে আজও তুরস্কের ইস্তাম্বুলের আলফাতেহ এলাকার মানুষের কাছে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

Scanned with CamScanner

উসমানি সাম্রাজ্যের ভালো-মন্দ

৬২৪ বছরের সুদীর্ঘ শাসনামলে ভালো ও মন্দ মিলিয়ে ছিল উসমানিদের শাসন। সুলতানদের ইতিবাচক ও সাহসী কর্মকাণ্ড যেমন সেকালের মুসলিম বিশ্বকে সুরক্ষিত করেছিল খ্রিষ্টানশক্তির হাত থেকে, তেমনি আবার কিছু নেতিবাচক সিদ্ধান্ত ধীরে ধীরে ভিত দুর্বল করে দেয় এই সাম্রাজ্যের।

পর্তুগিজদের ঔদ্ধত্য থেকে মক্কা ও মদিনার সুরক্ষা এবং শক্তিশালী নিরাপত্তাব্যবস্থা নিশ্চিত করতে উসমানিদের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। কেবল মক্কা বা মদিনা নয়, বরং উসমানিদের শৌর্যবীর্যে অনেক অঞ্চল দীর্ঘদিনের ভিনদেশি ও বিধর্মীদের আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়। সেকালের খ্রিষ্টান পরাশক্তি বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে উসমানিরা এক নতুন বিশ্ব উপহার দেয় জগৎবাসীকে। এককথায়, ইসলামের সূচনাযুগ থেকে যেসব অঞ্চলে মুসলমানরা প্রবেশের সুযোগ পায়নি, উসমানিরা সেসব জয় করে নিজেদের শাসনসীমানায় তা অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। ইউরোপের সুদূর ভিয়েনা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল উসমানিদের মানচিত্র।

বিশেষ করে বায়তুল মুকাদ্দাস সুরক্ষায় উসমানি সুলতানদের কর্মকাণ্ড ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। সিনাই উপত্যকা বা ফিলিস্তিনে ইহুদিদের প্রত্যাবর্তন এবং বসতি স্থাপন পরিকল্পনা নস্যাৎ করতে উসমানিদের কঠিন সিদ্ধান্তের ফলে বায়তুল মুকাদ্দাস এবং আশপাশের অঞ্চলগুলো ছিল শান্তিপূর্ণ এবং আরব মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে। উসমানি শাসনামলের পতনপর্বে সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ চারপাশের ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ষড়যন্ত্র ও প্রবল চাপের কাছেও মাথা নত করেননি।

রাজ্য জয় ও সীমানা বিস্তারের পাশাপাশি ইসলাম প্রচারে উসমানি সুলতানদের অবদান অনস্বীকার্য। ইউরোপের খ্রিষ্টান-অধ্যুষিত অঞ্চলে মুসলমানদের প্রবেশ এবং বসবাস সেখানকার অনেককে ইসলামের সৌন্দর্য ও উদারতা কাছ থেকে দেখার সুযোগ করে দেয়। সেকালে উসমানিরা ছাড়া অন্য কোনো শক্তি বা বাহিনীর সাধ্য ছিল না খ্রিষ্টানশক্তিকে প্রতিরোধ করার।

Scanned with CamScanner

আন্দালুসের মুসলমানদের সহায়তায় উত্তর ইউরোপে উসমানিদের বিজয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে সে সময়। রাশিয়ার খ্রিষ্টান বাহিনীকে প্রতিরোধেও উসমানি সেনাদের তৎপরতা ছিল উৎসাহব্যঞ্জক। একই সঙ্গে ভূমধ্যসাগরে স্পেনের রাজশক্তির প্রভাব বিস্তারে বাধা এবং পূর্ব আফ্রিকা ও আরব উপসাগরীয় অঞ্চলে পর্তুগিজদের অপতৎপরতা বন্ধে সেকালে উসমানিদের বিকল্প ছিল না।

২০ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটারব্যাপী বিস্তৃত ছিল উসমানিদের শাসনসীমানা। মরক্কো ছাড়া সব আরব দেশ এবং আফ্রিকার অন্যান্য দেশসহ ককেশাস, সাইপ্রাস ও ইউরোপের অনেক দেশ উসমানিদের হাতে বিজিত হয়। এই সুবিশাল সাম্রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল উসমানিদের রাজধানী ইস্তাম্বুল।

তবে এসবের পাশাপাশি কিছু বিষয় এমন ছিল, যেগুলো উসমানিদের দুর্বলতা হিসেবে ভাবা হয় আজও। এর মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয় তুলে ধরছি :

- উমাইয়া ও আব্বাসিদের মতো উত্তরাধিকার সূত্রে সুলতান হওয়ার প্রথা ছিল উসমানি সাম্রাজ্যেও। সুলতানের পুত্র সুলতান হবেন, এমন রেওয়াজ কোনোভাবে ইসলামে সমর্থিত বা গ্রহণযোগ্য নয়। নিজের পছন্দের পুত্রের জন্য ক্ষমতা গ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত রাখতে আপন ভাই তো বটেই, অন্য পুত্রদেরও হত্যার নির্মম ঘটনা ঘটেছে উসমানি সুলতানদের হাতে। শাসনব্যবস্থায় উত্তরাধিকার নির্বাচনের এই দৃষ্টিকোণ থেকে উসমানি শাসনব্যবস্থা যতটা নামে খেলাফত-ব্যবস্থা ছিল, বাস্তবিক অর্থে এটি ছিল রাজকীয় শাসনসুলভ পারিবারিক শাসন।
- ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল জয় করার পর সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে ইসলামের উদারতা ও সৌন্দর্য তুলে ধরার ব্যাপারে দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম ও কার্যকর পরিকল্পনার ঘাটতি ছিল উসমানি সুলতানদের। বরং অমুসলিম প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায়ে আঞ্চলিক শাসকদের ব্যস্ততা ছিল বেশি। বিজিত অঞ্চলে ইসলামের বার্তা প্রচারের চেয়ে নতুন নতুন দেশ জয় করার প্রবণতা বেশি ছিল উসমানি সুলতানদের মধ্যে। এর ফলে দীর্ঘদিন উসমানিদের শাসনে থাকার পরও সত্যিকার অর্থে মুসলিম সংস্কৃতি ও স্বভাব-চরিত্রের প্রভাব পড়েনি ইউরোপীয়দের জীবনাচারে।
- জ্ঞান ও বিজ্ঞানচর্চা এবং এর প্রসারে উসমানি সুলতানদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা দেখা যায়নি। বরং আনাতোলিয়া থেকে শুরু করে অন্যান্য অঞ্চলে

Scanned with CamScanner

তাঁদের ব্যস্ত সময় কেটেছে যুদ্ধবিগ্রহে। যদিও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কিছু শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং বিশেষ করে ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি সুলতানদের সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল কিন্তু সার্বিক অর্থে তা খুব বেশি নয়। জ্ঞান ও বিজ্ঞানচর্চায় উৎকর্ষ সাধনে উমাইয়া ও আব্বাসিদের শাসনামলে যে সোনালি সময় শুরু হয়েছিল, তা স্থবির হয়ে পড়ে উসমানিদের শাসনামলে।

- উসমানিদের শাসনসীমায় মরক্কো ছাড়া পুরো আরবদুনিয়া অন্তর্ভুক্ত থাকার পরও আরবি ভাষার গুরুত্ব ছিল একেবারে কম। বরং এর চেয়ে তুর্কি ভাষা বিস্তারে উসমানি সুলতানদের আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল বেশি। যদিও আরবি ভাষায় শিক্ষা প্রসারে হাতে গোনা কয়েকজন সুলতানের আগ্রহ ছিল, কিন্তু সর্বস্তরে এর প্রভাব সর্বজনীন ছিল না। ফলে ধীরে ধীরে আরবি ভাষা, যা কোরআন ও হাদিস এবং ইসলামি শরিয়ত জানা ও বোঝার প্রথম উপায়, তা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। এতে একদিকে যেমন আরব অঞ্চলের জ্ঞানী ও গুণী সমাজের সঙ্গে উসমানিদের সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ে, তেমনিভাবে তা উসমানি সাম্রাজ্যজুড়ে বিরূপ প্রভাব ফেলে।

- উসমানি সুলতানদের কাছে নির্দিষ্ট কিছু ইবাদত এবং রসম রেওয়াজ ছাড়া ইসলামের মূল মর্মবাণীর চর্চা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ফলে সুফিবাদের প্রভাবে ইসলামের অন্য অনেক বিষয় মানুষের চিন্তাভাবনার জগৎ থেকে হারিয়ে যেতে থাকে।

- উসমানি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক বিদ্রোহ ও অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র উসমানি সাম্রাজ্যের ভিত ধীরে ধীরে দুর্বল করে দেয়। বিভিন্ন অঞ্চল ও প্রদেশে ঘন ঘন পরিবর্তন করা হতো আঞ্চলিক গভর্নরদের। এ নিয়েও অস্বস্তি ও অস্থিরতা তৈরি হতো রাজ্যগুলোতে। আস্থার অভাবে এসব অদূরদর্শী সিদ্ধান্তে ধীরে ধীরে অস্থিরতার মেঘ জমতে থাকে উসমানিদের সুবিশাল আকাশে।

- একটি মুসলিম সাম্রাজ্যের উত্থান ও গৌরবময় অগ্রযাত্রা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি ইউরোপের পরাজিত খ্রিষ্টানশক্তি। ফলে ইস্তাম্বুলে নিজেদের দূত মারফত নানা চক্রান্তের বীজ বোনায় খ্রিষ্টানদের অব্যাহত তৎপরতা ধীরে ধীরে বিপর্যয় ডেকে আনে উসমানিদের। পাশাপাশি উসমানিদের নিযুক্ত বিভিন্ন আঞ্চলিক শাসকদের বিদ্রোহ ও দ্বন্দ্ব উসমানিদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। বিশেষ করে, মিসরের শাসক মুহাম্মদ আলি পাশার কর্মকাণ্ড

Scanned with CamScanner

উসমানি সাম্রাজ্যের ব্যাপক ক্ষতি করেছে বলে ঐতিহাসিকেরা দাবি করেন।

- উসমানি সাম্রাজ্যে ইউরোপীয় খ্রিষ্টানদের শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির সূচনা হয় তাদের জন্য ঘোষিত কিছু বিশেষ মর্যাদার মধ্য দিয়ে। অপ্রয়োজনীয় ও অযাচিতভাবে কোনো কোনো সুলতান ইউরোপীয় দূতদের জন্য তাদের প্রাপ্যের চেয়ে বেশি সম্মান ও মর্যাদা নির্ধারণ করেছিলেন। এতে ধীরে ধীরে প্রশাসনিক নানা ব্যবস্থায় খ্রিষ্টান ও বিদেশি শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। ইস্তাম্বুল ও অন্যান্য শহরে খ্রিষ্টান প্রজাদের নিরাপত্তা এবং তাদের অধিকার দেখাশোনা করার নামে ইউরোপীয়রা বিভিন্ন কৌশলে নিজেদের অবস্থান পোক্ত করে নেয়।

- উসমানি সেনাবাহিনী–যাদের বলা হতো ইঙ্কেশারি, এই সেনাদলের মাধ্যমে অবিশ্বাস্য বিজয় ও সাফল্য যোগ হয় উসমানিদের ইতিহাসে। কিন্তু কালের বিবর্তনে ইঙ্কেশারি সেনারা নানা রকমের অনুচিত কাজে জড়িয়ে যায়। সুলতানের দরবার ও দেওয়ানে প্রভাব বিস্তার করার পাশাপাশি এদের আত্মম্ভরিতা ও স্বেচ্ছাচারিতা বিপর্যয় ডেকে আনে উসমানি সাম্রাজ্যের। ইঙ্কেশারি বাহিনীর সামরিক নেতারা একপর্যায়ে কেবল সুলতানের ওপর প্রভাব বিস্তারই নয়, বরং এদের হাতে সুলতানের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটেছে। এভাবেই একটি সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী পরিণত হয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী বিভক্ত দলে।

  ইঙ্কেশারি বাহিনীর হাতে পদচ্যুত হয়েছেন একে একে সুলতান দ্বিতীয় মুস্তফা, সুলতান তৃতীয় আহমদ, সুলতান চতুর্থ মুস্তফা। সবশেষে সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ ক্ষমতা গ্রহণের পর ইঙ্কেশারি বাহিনীর লাগাম টেনে ধরেন এবং সমূলে এর সদস্যদের উৎপাটন করেন। এর মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয় ইঙ্কেশারি বাহিনীর তাণ্ডবলীলা এবং বিশৃঙ্খলার রক্তাক্ত অধ্যায়।

- উসমানি সুলতানদের মধ্যে বিদেশি ও বিধর্মী নারীদের বিয়ে করার প্রবণতা ছিল। ভিনদেশি স্ত্রীদের অনেকেই সুলতানদের শাসনকাজ পরিচালনায় প্রভাব বিস্তার করতেন। স্ত্রীদের প্ররোচনায় বেশ কয়েকজন সুলতান তাঁদের সন্তান ও ভাইদের হত্যা করেছেন বিনা অপরাধে। প্রজাদের জন্য অমঙ্গলজনক হলেও স্ত্রী ও দাসীদের মন রক্ষার্থে রাজকীয় ফরমান জারি করতেন কোনো কোনো সুলতান। এককথায়, উসমানি সুলতানদের অন্তঃপুরে সুশৃঙ্খল পারিবারিক প্রথার চেয়ে বিদেশিনী স্ত্রী ও

Scanned with CamScanner

দাসীদের ছড়াছড়ি ছিল বেশি। সিংহাসনে বসেই নতুন সুলতান তাঁর ভাইদের বন্দী বা হত্যা করতেন, এটাই যেন একধরনের রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল।

- সুলতানের অন্তঃপুরের নারীদের অনুরোধে রাষ্ট্রীয় কাজে এবং পদমর্যাদায় অযোগ্য সেবক ও দাসদের পদোন্নতি ছিল স্বাভাবিক বিষয়। কোনো যোগ্যতা ছাড়াই অন্তঃপুরের সুপারিশে দরবারের উজির বা সামরিক বাহিনীতে উঁচু পদে দায়িত্ব পেতেন কেউ কেউ। বাগানের মালি, বাবুর্চি, সেবক, প্রহরী–সুপারিশের বদৌলতে তাঁরাই হয়ে উঠতেন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের দায়িত্বশীল। তাঁদের কাছে সুলতান ও সুলতানের পরিবারের তোষামোদই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সাম্রাজ্য পরিচালনায় তাঁদের অবহেলা ও অসচেতনতা ছিল চোখে পড়ার মতো।

- উসমানি সাম্রাজ্যে এক সুলতানের মৃত্যুর পর তাঁর যে উত্তরাধিকার নতুন সুলতান হিসেবে সিংহাসনে সমাসীন হতেন, তাঁদের কেউ কেউ ছিলেন অনভিজ্ঞ ও ভোগবিলাসে মত্ত। সুলতান হওয়ার আগ পর্যন্ত তাঁদের দিন কাটত বন্দিখানায়। সাম্রাজ্য পরিচালনার রীতিনীতি এবং যুদ্ধের কলাকৌশলে বন্দী করে রাখা শাহজাদারা এসবের কিছুই শেখার সুযোগ পেতেন না। অথচ এঁদের কাঁধেই পরবর্তী সময়ে অর্পিত হয়েছে উসমানি সাম্রাজ্যের গুরুদায়িত্ব। এমন অনভিজ্ঞ ও অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের কর্মকাণ্ডে দিন দিন উসমানি সাম্রাজ্যের অবনতি ঘনিয়ে আসে।

- সুলতানদের কেউ কেউ তাঁদের সাম্রাজ্য পরিচালনায় পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিলেন উজিরে আজম বা সেনাবাহিনীর প্রধানের ওপর। বিশেষ করে, সুলতান প্রথম সেলিমের পর দু-একজন বাদে বাকি সবাই নিজেদের মেধা ও প্রজ্ঞা থেকে কোনো সিদ্ধান্ত নিতেন না। ফলে কখনো কখনো সাম্রাজ্যের স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিগত বা গোত্রীয় স্বার্থ প্রাধান্য দিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো সুলতানের চারপাশের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হাতে।

- উসমানি সুলতানদের ইতিহাসে সাম্রাজ্য পরিচালনার ব্যয়ের চেয়ে অন্ত ঃপুরের ব্যয় মেটাতে অর্থের অপচয় করা হতো। কখনো কখনো সুলতানের পরিবার ও প্রাসাদের জন্য যা বরাদ্দ করা হতো, তাতে পুরো সাম্রাজ্যের আয়ের এক-তৃতীয়াংশের বেশি খরচ হয়ে যেত।

Scanned with CamScanner

- দরবারের বিভিন্ন কাজে এবং অন্তঃপুরের বিনোদন ও নিরাপত্তা রক্ষায় বিদেশি এবং বিধর্মীদের কর্মসংস্থান ছিল ব্যাপক। সুলতানদের প্রভাব ব্যবহার করে এদের মাধ্যমে অনেক অপকর্ম ঘটানো হতো। সুলতান আব্দুল হামিদ একবার বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'গত এক সপ্তাহে আমার কাছে তিনটি আবেদনপত্র এসেছে। ফ্রান্স, জার্মানি ও অন্য একটি দেশ থেকে অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভাষায় লেখা এসব চিঠি পাঠানো হয়েছে। আমার অবাক লাগে, এরা নিজেদের দেশ, ধর্ম ও আভিজাত্য ছেড়ে আমাদের অন্তঃপুরে কাজ করতে এত আগ্রহী কেন!'

- সুবিশাল সাম্রাজ্য এবং অসীম শক্তি ও শৌর্যবীর্য কখনো কখনো উসমানি সুলতানদের মনে অহংকার ও গর্বের জন্ম দিত। যেমন বিখ্যাত সুলতান সুলায়মান সেকালের ফ্রান্সের সম্রাটের কাছে যে পত্র পাঠিয়েছিলেন, এর ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি পড়লে পাঠকের মনে হবে যেন কোনো এক মহাজন তাঁর দাসের কাছে একটি আদেশনামা পাঠাচ্ছেন। একজন সুলতান আরেক সম্রাটের কাছে বা একটি সাম্রাজ্যের অধিপতি আরেকটি অঞ্চলের শাসকের কাছে পত্র পাঠালে তাতে যে ভাব ও ভাষার প্রয়োজন, উসমানি সুলতানদের পাঠানো চিঠিপত্রে তা ছিল না।

  বিশেষ করে, উসমানি সুলতানদের তত্ত্বাবধানে যখন কোনো অঞ্চলের সঙ্গে চুক্তিপত্র তৈরি হতো, তখন সেগুলোতে সুলতানের নামের আগে যে উপাধি ও পদবি যোগ করা হতো, কখনো কখনো তা মহান আল্লাহর নাম ও গুণের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়ে যেত। প্রবল প্রতাপ ও প্রচণ্ড প্রভাবে উসমানি সুলতানদের কেউ কেউ এমনই অহংকারী ও আত্মম্ভরী হয়ে উঠেছিলেন যে তাঁদের গুণবাচক পদবি মহান আল্লাহর সঙ্গে শিরকের পর্যায়ে চলে যেত।

- খেলাফতের রঙে সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে গিয়ে সাধারণ ব্যাপারগুলোতেও ইসলাম ও শরিয়ত এবং ফতোয়া নিয়ে বাড়াবাড়ির ঘটনা ঘটত সেকালে। সুলতানের নির্দেশে দরবারের শায়খুল ইসলামরা এ ধরনের কাজে বেশ পারদর্শী ছিলেন। জনসাধারণ এবং বিভিন্ন পেশার লোকদের পোশাকের ধরন নির্ধারণেও ফতোয়া জারি করা হতো দরবার থেকে।

  ইস্তাম্বুলের একজন ব্যবসায়ী যখন ছাপাখানা স্থাপন করতে চাইলেন, তখন শায়খুল ইসলাম ও আলেমদের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হলেন তিনি।

Scanned with CamScanner

ওই ব্যবসায়ী তখন সুলতানের ঘনিষ্ঠ কয়েকজনকে দিয়ে সুলতানকে ছাপাখানার গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য বোঝাতে সক্ষম হলেন। ফলে কিছুদিন পর সুলতান স্বয়ং শায়খুল ইসলামকে ছাপাখানা স্থাপনের পক্ষে ফতোয়া তৈরিতে আদেশ দিলেন। নির্দেশমতো শায়খুল ইসলাম ছাপাখানাকে মহান আল্লাহর নিয়ামত আখ্যা দিয়ে এটির বৈধতার পক্ষে ফতোয়া লিখে দিলেন। সঙ্গে যোগ করে দিলেন, এই ছাপাখানায় যেন কোরআন, হাদিস ও ফিকহের কোনো বই ছাপা না হয়। ফতোয়ায় বৈধতা পাওয়ার পর ১৭১২ সালে যখন ইস্তাম্বুলে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়, তত দিনে মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পর আড়াই শতাব্দী পেরিয়ে গেছে।

Scanned with CamScanner

শেষ কথা

উসমানি সাম্রাজ্যের পতন ও বিলুপ্তির মধ্য দিয়ে মুসলিম বিশ্বে খেলাফত-ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা চিরতরে শেষ হয়। ১ হাজার ৩৩১ বছর ধরে যে মুসলিম বিশ্ব খলিফার অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছিল, এর সমাপ্তি ঘটে উসমানি সুলতানদের মধ্যে খলিফা উপাধিধারীদের অধ্যায় শেষ হওয়ার মাধ্যমে।

এর মধ্য দিয়ে ১০১ জন মুসলিম খলিফার সুদীর্ঘ ও গৌরবময় এবং ঘটনাবহুল জীবন অতীত ইতিহাসের অংশ হিসেবে বইয়ের পাতায় স্থান পায়। নিচে ইসলামি খেলাফত ও মুসলিম খলিফাদের একটি সংক্ষিপ্ত হিসাব তুলে ধরা হলো :

খেলাফত	খলিফার সংখ্যা	শুরু	শেষ
খেলাফতে রাশেদা	৪	১১ হিজরি	৪০ হিজরি
উমাইয়া খেলাফত	১৩	৪১ হিজরি	১৩২ হিজরি
আব্বাসি খেলাফত (ইরাক)	৩৭	১৩২ হিজরি	৬৫৬ হিজরি
খেলাফত ব্যবস্থাবিহীন		৬৫৬ হিজরি	৬৫৯ হিজরি
আব্বাসি খেলাফত (মিসর)	১৮	৬৫৯ হিজরি	৯২৩ হিজরি
উসমানি খেলাফত	২৯	৯২৩ হিজরি	১৩৪২ হিজরি

৬৫৬ সালে বাগদাদে তাতারদের আক্রমণে আব্বাসি খেলাফতের পতনের পর তিন বছর পুরো মুসলিম বিশ্ব খলিফাবিহীন অস্থির সময় পার

Scanned with CamScanner

করে। পরবর্তী সময়ে বাগদাদ থেকে মিসরে পালিয়ে আসা আলমুসতানসির বিল্লাহর হাতে বায়াত গ্রহণের মধ্য দিয়ে আবারও পুনরুজ্জীবিত হয় আব্বাসি খলিফাদের ধারাবাহিকতা।

যত দিন মুসলিম খলিফাদের অধীনে মুসলিম বিশ্ব পরিচালিত হতো, তত দিন খলিফাই ছিলেন সব মুসলমানের প্রাণপুরুষ। তাঁর আদেশে বর্ণ, আঞ্চলিকতা ও জাতীয়তা ভুলে এক কাতারে যুদ্ধে শামিল হতেন মুসলমানরা। ফলে খেলাফত-ব্যবস্থা ভেঙে দেওয়ার জন্য ইংরেজ ও খ্রিষ্টানদের অব্যাহত ষড়যন্ত্র যুগ যুগ ধরে বিদ্যমান ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় সংকীর্ণ হয়ে আসে উসমানি সুলতানদের শাসনব্যবস্থা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে পতন ঘটে একক মুসলিম শাসনব্যবস্থার।

Scanned with CamScanner

গ্রন্থপঞ্জি

- *আদদাওলাতুল উসমানিয়া আলমাজহুলাহ*
  ড. আহমদ আক কুন্দুজ এবং ড. সাইদ ওজতুর্ক
  ইস্তাম্বুল (২০০৮)
- *তারিখু সালাতিনি বানি উসমান*
  ওজতুলু ইউসুফ বেক আসা-ফ
  হিন্দাওয়ি প্রকাশনা, মিসর (২০১৪)
- *আলখোলাফাউল উসমানিয়্যুন*
  মাহমুদ শাকের
  আলমাকতাবুল ইসলামি, লেবানন (২০০৩)
- *ওয়ালিদি আসসুলতান আব্দুল হামিদ আছ-ছানি*
  শাহজাদি আয়েশা উসমান ওগলু
  দারুল বাশির, জর্ডান (১৯৯১)
- *তারিখুদ দাওলা আলউলয়া আলউসমানিয়া*
  প্রফেসর মুহাম্মদ ফরিদ বেগ
  দারুন নাফায়েস, লেবানন (১৯৮১)
- *জাওয়ানিব মুজিআ ফি তারিখি উসমানিয়্যিন আলআতরাক*
  জিয়াদ আবু গানিমাহ
  দারুল ফোরকান, জর্ডান (১৯৮৩)
- *তারিখুদ দাওলাহ আলউসমানিয়া* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
  ইয়ালমান ওজতোনা
  আরবি অনুবাদ : আদনান মাহমুদ সালমান
  আলহিলাল পাবলিশার্স, তুরস্ক (১৯৯০)
- *তারিখুদ দাওলা আলউসমানিয়া*
  রবার্ট ম্যান্ট্র্যান (প্যারিস)
  আরবি অনুবাদ : বশির আসসিবাই
  দারুল ফিকর, মিসর (১৯৯৩)
- *মাসাজিদ লাহা হিকায়াত* (*আল-জাজিরা* ম্যাগাজিন)
  পিডিএফ সংস্করণ (জুলাই, ২০১৬)

Scanned with CamScanner

পাঠক মন্তব্য

নবপ্রকাশ

১. 'সুলতানকাহিনি' বইটি সম্পর্কে আপনি কিভাবে জেনেছেন?
:: ফেসবুক বিজ্ঞাপন/বন্ধুর কাছে/অন্য কোনো পত্রিকায় বিজ্ঞাপন/ওয়েবসাইট/ অন্য কোনোভাবে।

২. 'সুলতানকাহিনি' বইটি আপনি কিনেছেন–
:: নবপ্রকাশ থেকে/ঢাকার বাইরে থেকে/রকমারি/অন্য কোনো উপায়ে।

৩. আপনি পড়তে ভালোবাসেন–
:: গল্প/উপন্যাস/ইতিহাস/প্রবন্ধ/ভ্রমণকাহিনি/স্মৃতিকথা/জীবনী/অন্যান্য।

৪. 'সুলতানকাহিনি' বইয়ের সার্বিক মান সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন–
:: উন্নত/ভালো/সাধারণ/খারাপ/নিম্নমানের

৫. আপনার মতে বিষয়বস্তু হিসেবে 'সুলতানকাহিনি'–
:: খুব ভালো/মোটামুটি/প্রত্যাশা পূরণ হয়নি

৬. আপনি ভবিষ্যতে নবপ্রকাশ-এর বই পড়তে–
:: আগ্রহী/আগ্রহী না/মন্তব্য নেই

আপনার মন্তব্য বা পরামর্শ (যদি থাকে):

.....

.....

আপনার নাম: বয়স:

মোবাইল নম্বর:

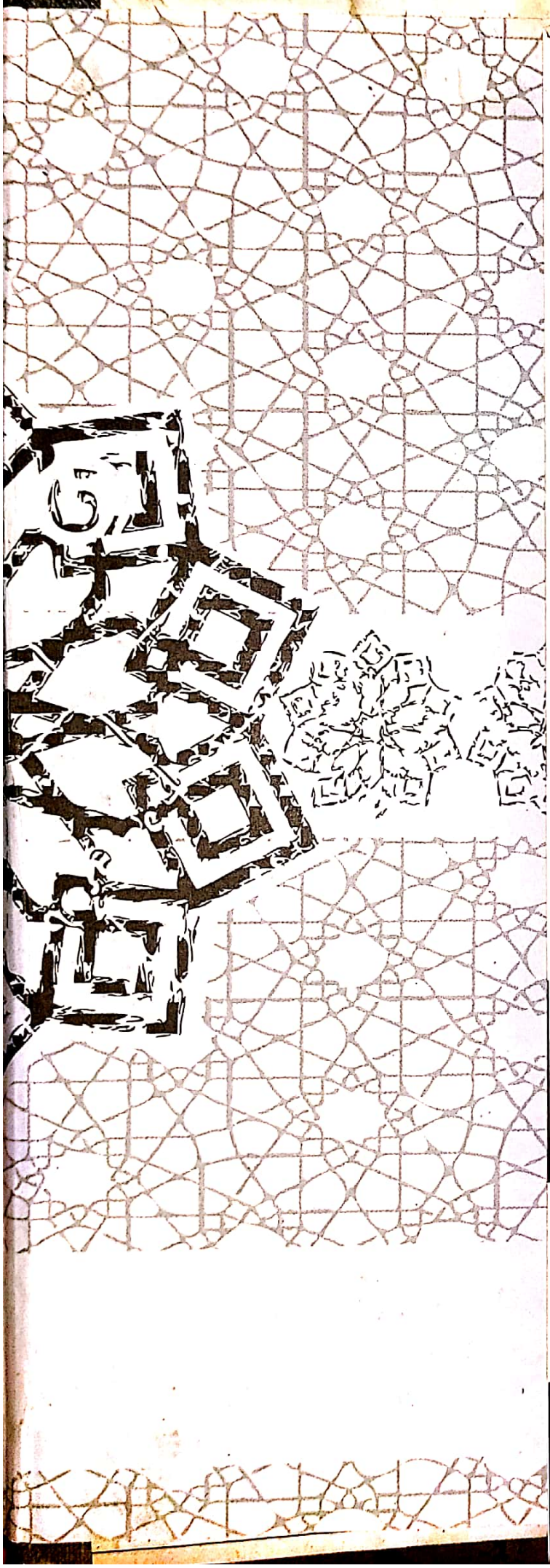
ঠিকানা:

আপনার ফেসবুক আইডি (যদি থাকে):

প্রিয় পাঠক, আপনার প্রতিটি মূল্যায়ন ও মন্তব্য নবপ্রকাশ-এর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এ ফর্মটি পূরণ করে আপনি নবপ্রকাশে পাঠালে অথবা সঙ্গে নিয়ে এলে নবপ্রকাশ থেকে সরাসরি বই কেনার ক্ষেত্রে আপনি পাবেন বাড়তি ১০% ছাড় এবং নবপ্রকাশ থেকে প্রকাশিত এক মাসের 'মাসিক নবধ্বনি' উপহার।

দোকান ২০, ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭৪ ৮৮৮৪৪১

Scanned with CamScanner



তামীম রায়হান

তামীম রায়হান একাধারে একজন লেখক, অনুবাদক এবং সাংবাদিক। মধ্যপ্রাচ্যের উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশ কাতারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বর্তমানে তিনি গণমাধ্যম গবেষক হিসেবে কর্মরত। পাশাপাশি তিনি কাতার ফাউন্ডেশনে ধর্মতত্ত্বে মাস্টার্স অধ্যয়নরত।

উপসাগরীয় অঞ্চলে প্রকাশিত বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক প্রথম আলোর সাপ্তাহিক উপসাগরীয় সংস্করণের কাতার প্রতিনিধি তামীম রায়হান। ২০১০ সালে কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারশিপে তিনি কাতারে যান এবং ২০১৫ সালে রাষ্ট্রীয় স্বর্ণপদক পেয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

তামীম রায়হানের রচনা, অনুবাদ ও সংকলনে বেশকিছু বই ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এসবের মধ্যে 'ইতিহাসের হাসি-কান্না', 'শাহজাদা', 'তবুও আমরা মুসলমান' উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে থাকাকালে ২০০৭ সাল থেকে ছোটকাগজ 'মাসিক নবধ্বনি'র সম্পাদনায় যুক্ত ছিলেন তিনি।

একাডেমিক পড়াশোনা, সাংবাদিকতা ও সরকারি চাকরির অবসরে লেখালেখি তামীম রায়হানের প্রথম পছন্দ। অর্ধযুগ ধরে কাতারে বসবাসের সুবাদে মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে তার জানাশোনার পরিধি সমকালীন অন্য তরুণ ও লেখকদের চেয়ে খানিকটা বেশিই বলা চলে।

তামীম রায়হান নিয়মিত লিখে চলেছেন অতীত ও বর্তমানের নানা বিষয়ে। তবে ইতিহাসের প্রতি তার বিশেষ আগ্রহ সবসময়ের। এই ধারাবাহিকতায় তার আরও বেশ কয়েকটি বই প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।

১৯৮৮ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণকারী এই তরুণ চার ভাই ও এক বোনের মধ্যে দ্বিতীয়। বাবা ডা. গোলাম হোসাইন পেশায় চিকিৎসক এবং মা আমেনা আফরোজ গৃহিণী।

Scanned with CamScanner

বইটি পড়ে রাজ্যদখল ও যুদ্ধবিগ্রহের রক্তাক্ত ইতিহাস এড়িয়ে উসমানি সুলতানদের জীবন ও কর্ম এবং তাঁদের বৈচিত্র্যময় চরিত্র সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও ঘটনা জানার সুযোগ পাবেন অনুসন্ধানী পাঠক। উসমানি সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ও ভৌগোলিক সীমানা-পরিধি এবং সেকালের নাগরিক ও সামাজিক জীবনের অনেক কিছুই উঠে এসেছে নির্মোহভাবে।



নবপ্রকাশ

ISBN 978-984-92655-5-9

SULTAN KAHINI By Tamim Raihan

Price: BDT 380.00 | US $ 12.00

noboprokash.com | noboprokash@gmail.com | fb/noboprokash | 01974 888441

e-store: rokomari.com/noboprokash

Scanned with CamScanner